দ্বিতীয় সংস্করণ

—সাড়ে তিন টাকা—

এই লেখকের—

নিরক্ষর
তেপান্তর
নাগরিকা
কাম-রূপ
হিন্দুর বউ
ছন্নছাড়া
সুহাস
মণ্টুর মা

প্রচ্ছদপট
শ্রী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ
প্রকাশিত এবং নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা
হইতে সুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত

'দান'-এর আজ নবতম সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো।

১৩৪০ সাল। ১৩৪০ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 'দান' মাসিক-বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়—ধারাবাহিক। পুঁথির আকারে ছাপা হয় ১৩৪১ সালে—১লা আশ্বিন। প্রকাশক হন—বরেন্দ্র লাইব্রেরী। বেশীদিন লাগেনি—অতি অল্পদিনেরই ভেতর 'দান'-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়, কিন্তু এর পরবর্ত্তী সংস্করণ আর প্রকাশিত হয়নি। ফলে, এই দীর্ঘ উনিশ-কুড়ি বৎসর 'দান' বিস্মৃতির মায়াকোটরেই আবদ্ধ আছে। আজ এ'কে বিশেষ মর্য্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন আমার 'নিরক্ষর'-এর প্রগতিশীল প্রকাশক শ্রীযুক্ত মিত্র ও ঘোষ—এঁরাই ভার নিয়েছেন 'দান'-এর নবতম সংস্করণ প্রকাশ করবার। সাগ্রহে প্রুফ দেখারও ভার নিয়েছেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু কবি কৃষ্ণদয়াল বসু মহাশয়। এঁদের সকলেরই কাছে আমি বিশেষ ঋণী।

সেদিনের লোক—তাঁরাও হয়তো ভুলে গেছেন এ'কে, এদিনের লোক—এঁরাও জানেন না এর পরিচয়। প্রার্থনা করি, যেন নূতন ক'রে উভয় দিনেরই পাঠকসমাজের শ্রীহস্ত পরিপূর্ণ করতে পারে আমার এই অযাচিত 'দান'-এর এই নবতম আত্মপ্রকাশ।

১৩ কৈলাস ব্যানার্জী লেন, হাওড়া } শ্রীচরণদাস ঘোষ

কাহারে দিব দান দিয়েছে যাহা স্বামী,

শুনিবে কে বা গান, যে-গান গাবো আমি !

যতনে রচা গান, আদরে তোলা ফুল,

নয়নে আঁখিজল, মনের যত ভুল—

তুষিব কারে দিয়া,

তৃপ্তিহীন হিয়া,

চাহিয়া আছি তাই সে-পথে দিন-যামি।

কত না কাঁটা তোলা, কত না খালি বুক,

জানি গো জানি মোর নিবেছে সব সুখ—

পারিনে তাই আর

গাঁথিতে ফুলহার,

জীবন-তরু যে গো গিয়েছে ঝড়ে ভাঙি।

'মাসিক বসুমতী'

আশ্বিন ১৩৪০

সকলে বলিল, "বাবুর জয় হোক!"

সম্প্রতি সৌরেশ তাহার এক মহলে একটি নারী-হাসপাতাল খুলিয়াছে। 'বেড' অনেক কয়টিই—তদুপযুক্ত ডাক্তার ও 'নার্স' নিযুক্ত করা হইতেছে। যিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তিনি ডাক্তার নির্ব্বাচন করিবেন, আর 'নার্স' নির্ব্বাচন করিবে—সৌরেশ নিজেই। অবশ্য, বিজ্ঞাপন ও আহ্বানপত্রে স্বাক্ষর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরই।

আজ 'নার্স' বাছিবার দিন। এদেশ-ওদেশ হইতে 'নার্স' আসিয়াছে অনেক। বিজ্ঞাপনে যোগ্যতার কথা কিছুই লেখা নাই, শুধু অপেক্ষাকৃত মোটা অক্ষরে লেখা ছিল—সুচরিত্রা হওয়া চাই।

হাসপাতালের অদূরেই কাছারী-বাড়ী। সৌরেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই মহলে আসিয়া এই কাছারী-বাড়ীতেই বাস করিয়া হাসপাতাল গঠন-কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এই বাড়ীতেই তাহার অভিরুচি অনুযায়ী 'নার্স' বাছাই হইবে।

আন্দাজ বেলা বারোটা, বাহিরের একটি বড় ঘরে রোগি-সেবিকারা আসিয়া জড় হইয়াছে। সকলেরই মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা—কখন কাহার ডাক পড়িবে, কি প্রশ্ন করিলে কি উত্তর দিবে!

যথাসময়ে ডাক পড়িল—"নার্স চারুবালা—"

দ্বাররক্ষক দ্বারের পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল ও সঙ্গে-সঙ্গে চারুবালা প্রবেশ করিয়া ভাগ্য-নিয়ন্তাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

সৌরেশ চেয়ারে বসিয়া; সম্মুখে টেবল—টেবলের উপর দরখাস্তের গোছা। ওধারে আর একখানি চেয়ার।

সৌরেশ প্রতি-নমস্কার করিয়া চারুবালাকে বসিতে বলিল। ত

উপরকার দরখাস্তখানা তুলিয়া লইয়া পড়িয়াই বলিল, "আপনাকে ডাকাই

হইলাম—মার্জ্জনা করবেন!"

চারুবালার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, "আমার দরখাস্ত

প্রত্যাখ্যান করলেন? আমার 'ডিপ্লোমা' আছে—" বলিয়াই তাড়াতাড়ি

হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলিতে গেল।

সৌরেশ বাধা দিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিল, "থাক্। 'ডিপ্লোমা'

আমরা ত চাইনি। আপনি বরং কল্‌কাতায় চেষ্টা করুন। এ আমাদের

দেশীয় হাসপাতাল। গৃহস্থ-ঘরের সাধারণ মেয়েই দরকার।"

চারুবালা একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "তা হ'লে আমাকে 'কল্' করলেন

কেন? কত দূর থেকে ট্রেণে আসতে হয়েছে—এখন ফিরে যাবার

আর ট্রেণ আছে কি না—তাও জানিনে! শীতকালের দিন!"

সৌরেশ অতিরিক্ত কুণ্ঠিত হইয়া জবাব দিল, "আপনার প্রথম

প্রশ্নের জবাব—দরখাস্তগুলো মাত্র আজ আমার সাম্‌নে এসেছে। 'কল'

করেছেন আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বড় অন্যায় হয়েছে আমার যে

আগে এগুলো আমি দেখিনি! আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন! আর

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব—যাঁর এখন ফিরে যাবার ট্রেণ নেই, কিংবা আছে

যাঁর ফিরে যাবার অসুবিধে—তিনি আজ অনুগ্রহ ক'রে এইখানে

থাকবেন! সে বন্দোবস্ত আগেই করা হয়েছে।"

চারুবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, আনাড়ি

মেয়েরা 'নার্স'গিরির কি জানে? আমরা পাশ করেছি—'ট্রেণড'!"

সৌরেশ ঈষৎ হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "ক্ষুণ্ণ হবেন না—রোগী

সেবায় বাঙ্গালী মেয়েকে পাশ করতে হয় না, ট্রেণিংও তার প্রয়োজন

হয় না। এ কায তার জন্মগত সংস্কার!"

চারুবালা খানিক কি ভাবিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার 'রোগ' নাই ত!"

"নিশ্চয়ই না। কিন্তু, আপনার ঐ সংস্কারটি নির্দোষ হয়েছে— সেরোবার! আমার মনে হয়—আনাড়ী হাতের সেবায় রোগী বেশী সুস্থ থাকে। আচ্ছা—নমস্কার।"

চারুবালা উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "কিন্তু, আজ ত আমার ফিরে যাবার সুবিধে হবে না!"

সৌরেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "থাকবেন এখানে! বাইরে আমার লোক আছে, সে নিজেই সব জিজ্ঞেস্ ক'রে বন্দোবস্ত ক'রে দেবে।"

"নমস্কার!" বলিয়া চারুবালা বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর একটি প্রৌঢ়া প্রবেশ করিল। সৌরেশ তাহার দরখাস্তখানি পড়িয়া বলিল, "আপনার বাড়ীতে ত চার-পাঁচটি ছেলে। আপনি এখানে থাকলে তাদের দেখবে কে? ধরুন, কারুর যদি অসুখবিসুখই হয়—তবে?"

স্ত্রীলোকটি তৎপর জবাব দিল, "আমার স্বামী আছেন!"

সৌরেশ সহাস্যে বলিল, "তা হয় না। ঘরের সেবায় ফাঁক পড়লে বাইরের সেবায় হানি হয়। তা ছাড়া, যা একপক্ষেরই হওয়া... খানিক রেখে এলে চলে না! এখানে এলে এদেরই মা হয়ে থাকতে হবে আর সব হারিয়ে—পারবেন?"

স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, "পারবো!"

"ক্ষমা করবেন—সত্যি কথাটা ঢাকলেন আপনি। না, আমি চাই—ঠিক এমনটি নয়!"

স্ত্রীলোকটির মুখখানা শাদা হইয়া গেল। ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার দরখাস্তটি মঞ্জুর করুন, বাবু! আমার স্বামী রুগ্ন। পাঁচ-ছেলেপিলে নিয়ে বড্ডো কষ্ট আমাদের!"

সৌরেশ স্ত্রীলোকটির দিকে একটিবার তাকাইল, তারপর মুখ নামাইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া কহিল, "আপনি ত বেশ! বাড়ীতে আপনার অতখায়, আর আপনি সেবার কাষ নিতে এসেছেন এখানে? বাড়ী যান—আমার 'স্টেট' থেকে মাসিক ত্রিশ টাকা ক'রে আপনি পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন—আপনার বাড়ী আমার এই সেবাশ্রমের একটি শাখামাত্র—সেখানে 'নার্স' আপনি!"

স্ত্রীলোকটি চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই দেখা গেল, তাহার সারা মুখটি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "গরীবের মা-বাপ আপনি—আপনি রাজা হোন্।"

সৌরেশ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "সে সখ আমার নেই। কিন্তু, আপনি কি ট্রেণে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আজ ট্রেণ পাবেন?"

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"পাবো, সময় আছে।"

সৌরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে আর দেরী করবেন না। এখানে ঠিকানা আছে—ডাকে আপনার টাকা যাবে।"

স্ত্রীলোকটি উঠিয়া পড়িল ও একটি নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার যে প্রবেশ করিল, সে বিধবা—বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ চাদরে আবৃত। ইহার দরখাস্ত পড়িয়াই সৌরেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার কেউ নেই?"

নতমুখী হইয়া স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, "না।"

সৌরেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, "কাশী যাবার স্থির করেছিলেন?"

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতার ন্যায় মুখ তুলিয়া জবাব দিল "ক'রে ত ছিলাম, কিন্তু হলো কি? হলো না!"

"কেন?"

"কোথায় থাকবো?"

"কোন আত্মীয় নেই?"

"না।"

সৌরেশ কি ভাবিয়া বলিল, "কোন গৃহস্থের বাড়ী—ঘর ভাড়া ক'রে?"

স্ত্রীলোকটি আবার একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, "এমনি? টাকা চাই ত—ঘরের ভাড়া, নিজের খাওয়া-পরা!"

সৌরেশও একমুখ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তবে চেষ্টা করেছিলেন কি?"

"এই করেছিলাম—কারুর বাড়ী বাঁধবো। তারপর ভেবে দেখলাম—পারবো না। জীবনটা না-হয় নিষ্ফলই হয়েছে, কিন্তু হীন হ'তে যাবো কেন?"—স্ত্রীলোকটির মুখখানা হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল।

সৌরেশ চমকিয়া উঠিল, যেন ও-মুখের এক প্রচ্ছন্ন তীর তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কিছু মনে করবেন না। হীন আপনাকে হ'তে হবে না—কাশীই আপনি যান। আমার 'স্টেট' থেকে আপনি টাকা পাবেন।"

নিমেষে স্ত্রীলোকটির মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু ও-টাকা আমার যে কাজেই লাগবে না! স্ত্রীলোকের অধিকার থাকে একমাত্র স্বামীর দানে—আমরা যে মেয়েমানুষ!—পড়লেন দরখাস্তটা?"

সৌরেশ স্ত্রীলোকটির দিকে একটিবার তাকাইয়া মাথা নীচু করিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "দরখাস্ত? পড়েছি।"

স্ত্রীলোকটি নিবিড় সংশয়ে সৌরেশের দিকে তাকাইতেই সৌরেশ বলিল, "মঞ্জুর করেছে। নিয়োগপত্র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দেবেন।"

"আচ্ছা, নমস্কার!" বলিয়া স্ত্রীলোকটি নতমুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তাহা হউক। তত্রাপি সৌরেশের বুঝি বা মনে হইল যে, ঐ নারী তখনও তাহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছে—থাকিবেও অনন্তকাল ধরিয়া! নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিল—নিষ্ফল জীবন এই? তখনই প্রবল উত্তর পাইল—না, না—না! বিশ্বের কাছে নয়! মানব-মানবীর জন্মে যদিই বা কোন অর্থ থাকে তাহা হইলে তাহা ইহাই যে, তাহারা মাথা উঁচু করিয়াই চলিবে, হেঁট করিয়া নয়! সুতরাং এই নারী যে জন্মের সম্মান রাখিয়াছে, সে পৃথিবীর কাছে নিষ্ফল হইবে কেমন করিয়া, কোন্ হিসাবে? অতএব, তাহার কাছে সে চিরদিনই বর্তমান—সার্থক!

এই সমস্ত নিবিড় চিন্তায় সে ভোর হইয়া রহিল। কতক্ষণ কাটিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, দ্বার-রক্ষকের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। দ্বার-রক্ষক বলিল, "হুজুর, বাইরে ওঁরা জিজ্ঞেস্ করছেন—আজ আর ডাক হবে?"

"হবে বৈ কি! ডাক্ একজনকে—" বলিয়া সৌরেশ তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইল।

অতঃপর বাকী কয়েক জনের ডাক হইল—কেহ বা বাহাল হইল, কেহ বা বাতিল পড়িল।

এইবার শেষ 'নার্সে'র' পালা। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। জানালা দিয়া যে রৌদ্র পড়িয়াছিল, তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছে, যেন এক বিরাট অন্ধকার প্রকৃতির মায়া সৌন্দর্য্যে এখনই কালি ফেলিবে!

ডাক পড়িল—"রবিতা দেবী—"

পুনশ্চ পর্দা উঠিল, এবং পুনশ্চ আর একটি 'নার্স' প্রবেশ করিল। তাহার বয়স আটাশ-উনত্রিশ—পরনে লালপেড়ে শাড়ি, সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু। পা ও মুখের দিকে চাইলে টের পাওয়া যায়—মেয়েটি শ্যামবর্ণা। টেবিলের কাছাকাছি হইতেই মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মুখখানা ছাই হইয়া গেল।

সৌরেশও চমকিয়া উঠিল, এবং যুগপৎ তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। অতঃপর টেবিলে হাতের ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, [illegible]—আর একটু ঝুঁকিয়া গিয়া মিনিটখানেক একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রবলোচ্ছ্বাসে ডাকিয়া উঠিল—"তুমি?"

মেয়েটি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, কোনক্রমে [illegible] অগ্রসর হইয়াই চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সৌরেশ আবার অস্থিরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "ম—মিনা?"

মেয়েটি অস্ফুট, নিস্তেজ, অবশ কণ্ঠে বলিল, "না। আমি সবিতা।"

: দুই :

ছেলেদের ঈষন্মাত্র জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহাদের অন্তরের অপটু বালক-বৃত্তি খুঁড়িয়া বড় হইয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। ঠিক এই সময় যাহারা আদর-শাসনের পাশাপাশি দুইটা অবলম্বন পায়, তাহারাই লতাকার উঁচু হয়; যাহারা পায় না, তাহারা অচিরাৎ ভাঙিয়া লতাইয়া যায়। কাঁচা, অপুষ্ট, সবুজ বালক-জীবনটায় সৌরেন্দ্র যখন পদার্পণ করিল, তখন সে পাশে শাসনের কোনও দণ্ড দেখিতে পাইল না। শুধুই দেখিল—পর্য্যাপ্ত আদরের এক পলকা আশ্রয় হাত-ছানি দিয়া তাহাকে মুহুর্মুহু ডাকিতেছে!

যখন শিশু, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। মা নিজেই তাহাকে 'মানুষ' করিবার ভার গ্রহণ করেন। এতদর্থে তাহাকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যে-বয়সে সাধারণত ছেলেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সে-বয়সে নয়, বেশ একটু বড়-সড় হইলে। পিত্রালয়ের তরফ হইতে স্বীয় সংসারটিকে সচ্ছল দেখিবার মত কোনও সংস্থান তাহার চোখে না পড়িলেও, অভাব-অনটন—দারিদ্র্যের রক্তচক্ষুও তাহার কচি দৃষ্টির উপর পড়িতে পায় নাই। অর্থ ই হউক, বা জিনিষপত্রই হউক, যখনই যেটির প্রয়োজন হইত, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা তাহার মাতুলালয় হইতে আসিত। মাতুলালয় মাইল পাঁচেক দূরে। নামে 'মাতুলালয়' হইলেও, সে-আলয়ে তাহার 'দাদু' ছাড়া আর কেহই ছিলেন না। মা-ই তাহার 'দাদু'র একমাত্র সন্তান। 'দাদু' সঙ্গতিশালী ছিলেন। গ্রামের অধিকাংশ জমি-জায়গা তাঁহারই, তাহা ছাড়া 'তেজারতি' কারবার

করিয়া বিস্তর নগদ টাকাও তিনি জমা করিয়াছিলেন; এবং, যদিও স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিরই মালিক তাঁহার দৌহিত্রই, তথাপি তাঁহার টাকার কিয়দংশ দিয়া সখ করিয়া 'নাতি'র নিজ নামে দুই-চারিটি দামী মহলও ক্রয় করিয়াছিলেন—সে অনেক দূরে।

দশ-বারো বছরে পা দিতেই, মা তাহার জন্য একটি চাকর রাখিয়া দিলেন। সে কচি মনিবের জুতা ঝাড়িয়া দিত, কাপড় কুঁচাইয়া দিত, তেল মাখাইয়া দিত, স্নানের সময় কাপড় লইয়া গিয়া দাঁড়াইত। জপ-আহ্নিক সারিয়া স্কুলে যাইবার সময়ের ভিতর মা সমস্ত ডাল-তরকারি রাঁধিয়া 'থালা' সাজাইয়া 'বাছা'র কোলে ভাত দিতে পারিতেন না বলিয়া একটি পাচিকাও তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাতের থালা ধরিয়া দিয়াই তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে হইত ও প্রতি ডাল-তরকারি রান্না-সম্পর্কীয় মন্তব্য তন্ন-তন্ন করিয়া ক্ষুদ্র প্রভুটির নিকট হইতে তাহাকে প্রতিদিনই গ্রহণ করিতে হইত, এবং ভৃত্যই হউক বা পাচিকাই হউক—কেহ কোনও সময়ে পুত্রের বিন্দুমাত্র অসুবিধার হেতু হইলেই মা রাগিয়া খুন হইতেন, এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতেন। পুত্র বালকসুলভ বুদ্ধি দিয়া মায়ের রোষের ধারা অনুভব করিত, অনুভব করিত—মা উঁচু, ওরা নীচু! উহাদিগকে বকিবার মায়ের অধিকার আছে, এবং তিরস্কারই উহাদের প্রাপ্য।

কিছুদিন পরে ভৃত্য-পাচিকার দোষ-ত্রুটি যখন তাহার নিজের চোখেও পড়িত, তখন তাহারও মনে এক বিষম লোভ উঠিত—উহাদিগকে বকিবার, কেন না, তাহার অধিকার আছে! প্রথম দিন পারিল না। দ্বিতীয় দিন মায়ের তিরস্কার, মায়ের গালিগালাজ অহরহ কানে গেল—কান পাতিয়া শুনিল; চোখরাঙানি তাহার চোখে পড়িল—চোখ মেলিয়া দেখিল। তৎপরদিনই মরীয়া হইয়া প্রথমত চাকরটাকে

একটি ছোট চড়া কথা বলিল। ভৃত্য প্রত্যুত্তর করিল না; দোষ স্বীকার করিয়া চাকরী বজায় করিল। এই দিন হইতেই চাকরকে তিরস্কার করিবার—তাৎসজিক অসদ্ব্যবহার করিবার ইচ্ছা তাহার বাড়িয়া গেল—মুখও খুলিয়া গেল।

এইবার পাচিকার অর্থাৎ 'স্ত্রীলোকে'র উপর রক্তচক্ষু দেখাইবার পালা। একদিন সৌরেশের মনে হইল, 'ডাল' পাতলা হইয়াছে! বারো বৎসর বয়সের প্রভু উহা দেখিয়াই, ভাতের থালা, ডালের বাটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ও পাচিকাকে কড়া-কথা শুনাইয়া দিল। পাচিকা অপ্রস্তুত হইয়া খানিক কাঁদিয়া তাহার অশেষ অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল।

ক্রমে ক্রমে সৌরেশের এই ধারণাটাই মজ্জাগত হইয়া গেল যে, গরীব হইলে পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে-ই হউক, বড়লোকের সম্পূর্ণই অধীন! বড়লোকের অধিকার আছে—উহাদিগকে তিরস্কার করিবার, হতজ্ঞান করিবার, ঘৃণা করিবার! এমন কি, উহাদের দেহ-মনেরও উপর বড়লোকের স্বত্ব আছে, যাহার বলে ঐ দুইটা পদার্থের উপর যথেচ্ছ আচরণ করা অবাধে চলে!

ঈদৃশ প্রকৃতির প্রভাবে বড় হইয়া সৌরেশ কুড়ি বছরে পা দিল—স্কুলের খাতায় তখন তাহার নাম আছে প্রথম শ্রেণীতে। গ্রীষ্মের ছুটী আসিতেই তাহার 'দাদু' তাহাকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য তাগাদা করিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন।

লোকের মুখে শুনিয়াই সৌরেশ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ, যেতে পারি, কিন্তু, সেই রাঁধুনী মাগীকে 'দাদু'কে তাড়িয়ে দিতে বোলো—মাগীর হাতের রান্না ভারি বিশ্রী। যদি ভালো রাঁধুনী আসে, তবেই যাবো, নইলে—না!"

করিত না। বাহুল্য, 'দাদু'র সংসারটা চাকর-পাচিকা লইয়াই। অতএব রাঁধিবার জন্ত তাঁহাকে পাচিকা রাখিতে হইত।

মা-ও পুত্রের কথা সমর্থন করিয়া লোকটাকে বলিলেন, "তাই বটে, বাছা! ছেলে আমার যখনই যায়, তখনই রোগা হয়ে আসে! বাবাকে বোলো—আগে ভালো রাঁধুনী ঠিক করতে, তারপর যেন নাতিকে নিতে পাল্কী পাঠায়!"

লোকটা বিদায় গ্রহণ করিল এবং বলা বাহুল্য যে, স্নেহময় 'দাদু' দৌহিত্রের হুকুম অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বেই গ্রামান্তর হইতে একটি নূতন পাচিকা যোগাড় করিয়া নাতিকে আনিয়া কৃতার্থ হইলেন।

* * *

এ-বাড়ীতে যখনই সৌরেশের পা পড়িত, তখনই তাহার জন্য সমস্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইত—স্বতন্ত্র ঘর, স্বতন্ত্র চাকর-বাকর। এবারও সে প্রথার কিঞ্চিদপি ব্যতিক্রম ঘটিল না। যে-সময়টিতে যাহা প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ তাহাই সে হুকুমের মাথায় পাইতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতর যখন সে রহিত, তখন সে উপরেই থাকিত—তাহার স্বতন্ত্র ঘরটিতে। নীচে বড়-একটা থাকিত না, বাহির হইতে বাড়ী ঢুকিয়া দাঁড়াইতও না—সে-অঞ্চলে যে চাকর-বাকর বসে, দাঁড়ায়, কাজ করে! উপরে সে ছাড়া বিনা প্রয়োজনে আর কাহারও যাইবার হুকুম ছিল না। 'দাদু' সারাদিনই বিষয়-কর্ম্মে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়া বাহিরকার 'কাছারী'-বাড়ীতে থাকিতেন। রাত্রিতে শয়নকালে একটিবারমাত্র উপরে যাইতেন—সে তাঁহার পৃথক ঘরে, এক কোণে। উপরকার সিঁড়ি দালানের এক প্রান্তে। সৌরেশ সেই প্রান্তের একটা দুয়ার দিয়া দালানে ঢুকিয়া দ্বিতলে যাতায়াত করিত।

এক দিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ অপর প্রান্তের দুয়ার দিয়া দালানে ঢুকিয়াই নব-নিযুক্তা পাচিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বামুন-মা, একটা পান দাও ত—"

সৌরেশকে দেখিয়াই একটি মেয়ে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিয়া বোধ হইল, মেয়েটির বয়স—বছর সতেরো!

বামুন-মা একপাশে বসিয়া লুচির ময়দা মাখিতেছিলেন। ব্যস্ত হইয়া মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মলিনা, তোর দাদাবাবুকে একটা পান দে ত রে!"—সৌরেশের পানে চোখ ফিরাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "ওটি বাবা, আমার মেয়ে! বড্ডো লাজুক কিনা!" ঘরের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি বাছা, দাদাবাবুর সুমুখে বেরুতে? দে পা—ন!—আমার হাতে যে এক-হাত ময়দা!"

কিন্তু, মেয়েটির সাড়া-শব্দও পাওয়া গেল না।

বামুন-মা একমুখ রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মনিববাড়ী অত করলে কি চলে?—না বাছা!" বলিয়া নিজেই উঠিয়া পড়িলেন ও তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া সৌরেশকে পান দিয়া আবার ময়দায় হাত দিলেন।

এতদিন ধরিয়া কলের মত বেতনভুক্ লোকজন, কৃপার পাত্র-পাত্রী সৌরেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিয়াছে—তাহার এতটুকু ইঙ্গিত, একফোঁটা মনের ভাব ধরিয়াই উহারা উত্তমর্ণের যথাবিহিত সম্ভ্রম কাঁটায়-কাঁটায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আর, আজ একটা বিষম করুণার পাত্রী—তাহারই পাচিকার কন্যা এমন করিয়া তাহাকে অবহেলা করিল? এই দৃশ্যটা—মেয়েটার অতিশুষ্ক এই ধৃষ্টতা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রভুত্ব-প্রয়াসী তরুণ যুবকটির বুকের সমস্ত স্থানটাই অত্যুগ্র করিয়া তুলিল এবং তৎক্ষণাৎ ঘরটার দিকে এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই সরোষে

উপরে উঠিয়া গেল, যেন বা দুর্বাসার রক্তচক্ষু এক আশ্রমবাসিনীর উপর অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়াছে !

কি জন্য, কাহার জন্য পূর্ব্ব-পাচিকাকে তাড়াইয়া নূতন পাচিকাকে রাখা হইয়াছে, তাহা বামুন-মার অবিদিত ছিল না। অতএব, সহস্র কাযে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিলেও আসল-মনিবের মুখের চেহারা ও পায়ের চলন তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। তাঁহার মনে আশঙ্কার এক রুদ্রমূর্ত্তি উঁকি মারিয়া গেল, এবং এই সমস্ত অনর্থের হেতু যে তাঁহার ওই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটা, ইহাই যেন নূতন করিয়া তাঁহার মনে পড়িতেই মলিনার কাছে রুখিয়া গিয়া গলা চাপিয়া বলিলেন, "কি কাণ্ড বাধালি, বল্ দিকিনি ? বেরিয়ে হাতে একটা পান দিলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হতো ?"

মলিনা সভয়ে মায়ের দিকে মুখ তুলিল। বামুন-মা তেমনি করিয়াই আবার বলিলেন, "দাদাবাবু কি রাগটা করেছে জানিস্— মুখচোখ রাঙা কোরে চলে গেল !"

মলিনা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সাম্‌নে বেরুতে লজ্জা করে যে !" মুখ নামাইল।

জবাবটা বামুন-মা বেশ একটু তিক্তকণ্ঠেই দিলেন—"আঃ লো ! দেখে বাঁচিনে। আইবুড়ো মেয়ের আবার লজ্জা ! আর, এতটা দেখতে তুই, বাছা, আমি বুড়ো মাগী খেটে-খেটে মরছি—এক গ্লাস জল, একটা পান দিয়েও তো আমার মাথা কিন্‌তে হয়।" বলিয়াই মুখ ভারি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে যাহার লজ্জার সৃষ্টি হইয়াছে, মায়ের কথার অর্থ সংগ্রহ করিতে তাহার দেরি হইল না। মেয়েটি বুঝিল, যাহারা নিঃস্ব, যাহারা দরিদ্র—পেটের জন্য যাহারা পরের দ্বারস্থ, সরম

তাহাদের জন্ম নহে! সত্যকথা, লজ্জাই মেয়েমানুষের ধর্ম—তার বস্তু! কিন্তু, এ-ধর্মের, এ-বস্তুর দিকে লোভ করাটা তাহাদের পাপ যাহাদের দেহ খাটাইয়া পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিতে হয়! যেমন করিয়াই হোক, মনিবের মন-যোগানোই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম! দেহ লুকাইলে এ ধর্ম্মযজ্ঞের হোমানলে পূর্ণাহুতি পড়ে না! মনের মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা তোলাপাড়া করিতে-করিতে মেয়েটির দুই চোখই জলে ভরিয়া উঠিল এবং তেম্নিই ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে ঘরে গিয়াই সৌরেশ তাহার তূণ ঢালিয়া একটি-একটি করিয়া বাছিয়া সর্ব্বসেরা বাণ খুঁজিতে লাগিল। ভাবিল, উহাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলে কি ঠিক শাস্তি হয়?—না। মাকে রাখিয়া মেয়েটাকেই শুধু তফাৎ করিয়া দিবে?—তাহাও নহে। কাহাকেও তাড়াইবার নামটি না করিয়া শুধু মেয়েটার খোরাক বন্ধ করিলে কি হয়? অন্তর হইতে তৎক্ষণাৎ নিষেধ আসিল—না, না! তবে? মনের ভিতর আরও কয়েকটা প্রশ্নোত্তর করিয়া এক মনোমত দণ্ডের সন্ধান পাইল; এবং সেই দণ্ডটার আস্তস্থ একটা মূর্ত্তি তৈরী করিবার জন্যই বুঝিবা ঘরের আলো নিবাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এক-এক করিয়া তিনটি দিন কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়েক দিনের ভিতর সৌরেশের তরফ হইতে কোনও উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেল না। চতুর্থ দিবসের মুখ খুলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাদলার সূচনা হইল। আকাশে জমা মেঘ, ঘন-বারিবর্ষণ, উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া, যুগপৎ বহির্জগতে এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল। অবিশ্রাম বৃষ্টির পর আন্দাজ দুই ঘটিকার সময় চারিদিক একটু ফর্সা হইল, বারিপাতও কমিয়া আসিল। বামুন-মাকে প্রতিদিন পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল আনিতে হইত। কিন্তু, বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ তিনি বাহির হইতে পারেন নাই, আকাশের দিকে

তাকাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। বৃষ্টির একটু উপশম হইতেই তিনি ঘড়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। মানুষের হাতছাড়া যে কয়টি শক্তি—তাহারা প্রতি চাল-চলনে মানুষকে জব্দই করে, এইজন্যই বোধ করি বা দ্বাপর-ত্রেতায় অত তপস্যার আয়োজন। কিন্তু সে কথা এখন থাক্‌। বামুন-মা বোধ করি পুকুরের ঘাটেও পৌঁছিতে পারেন নাই, এমন সময়ে চতুর্দিক অন্ধকারে কালো করিয়া দিল ও সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিল। এক-এক মিনিট করিয়া আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তত্রাপি জলধারার বিরাম নাই। সৌরেশ উপরের দালানে চলাফেরা করিতেছিল ও এক-একবার জানালা খুলিয়া বাহিরের নগ্ন প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতেছিল। হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং কি মনে করিয়া ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, দূরে দালানের দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া একজন বসিয়া। দরজা-জানালা সমস্ত অর্গলবদ্ধ, তদুপরি বহিঃপ্রকৃতির আলোকে মেঘের রঙ লাগিয়াছে! এই দুই কারণে মূর্তিটিকে দূর হইতে ঠিক চিনিবার যো ছিল না। একপা-একপা করিয়া কাছে আসিয়া দেখিল—মলিনা।

সেদিন যে এই-মেয়েটি তাহার মাতৃ-সমক্ষে এই মানুষটিকে দেখিয়াই দৌড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া দেহ গোপন করিয়াছিল, আজ তাহাকেই এত নিরালায় এম্‌নিই বিশ্রী বাদলের ঘেরার ভিতর অতি নিকটে আসিতে দেখিয়াও এতটুকু নিজেকে সরাইল না।

যেমন করিয়া মনিব চাকরের সঙ্গে কথা কয়, তেম্‌নি করিয়াই সৌরেশ প্রশ্ন করিল, "তোমার মা কোথায়? আমার চা চাই এক কাপ—"

মলিনা একান্ত অনুগতার ন্যায় তৎক্ষণাৎ কহিল, "জল আন্‌তে গেছে মা, অনেকক্ষণ! আমিই দিচ্ছি ক'রে! বসুন!" বলিয়াই উঠিয়া

আসন পাতিয়া দিল; এবং, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে চায়ের কাপ-কেৎলি বাহির করিয়া আনিয়া 'স্টোভ' জ্বালিল। মলিনার এই প্রথম কথা কওয়া।

সেদিনকার বাছা-অস্ত্রটিই বোধ করি সৌরেশ উচাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটার এই অসাধারণ পরিবর্তন দেখিয়া তাহার চমক লাগিল! কেমনতর, কি করিয়াই বা তাহার চিরটা কালের কড়া-প্রভুত্বকে সে গুছাইয়া উঁচুতে তুলিয়া ধরিবে, বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাহার পথ খুঁজিয়া পাইল না। অপিচ, মেয়েটির স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ও সময়োচিত হাতের কাজ তাহাকে প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত, বিব্রত, কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মলিনার দিকে বার কয়েক আড়চোখে চাহিয়া নিঃশব্দে যেমন সে পিছন ফিরিবে, মলিনা চমকিয়া ডাকিল—"চা!"

সৌরেশ মুখ ফিরাইল, একটু হাসিয়া বলিল, "চা খেতে আমি আসিনি!" বলিয়া আর দাঁড়াইল না।

: তিন :

সাগরে সুধা উঠিবার সময় দানবকুল সংহারমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সুধা তুলিয়াছিল, এবং সেই শ্রম ব্যর্থ করেন চতুর শ্রীকৃষ্ণ—নারীরূপ ধরিয়া। এইরূপ বলিলা তাহার নারী-প্রকৃতি দিয়া সেই যে সৌরেশের রোষ, ব্যর্থ করিয়া দিল, সেই ব্যর্থতা সেইক্ষণ হইতেই পরাজিতের বুকে এক অসহ্য শ্রী ধারণ করিয়াই রহিল।

প্রতিদিন প্রাতে সৌরেশের ভৃত্য চা দিতে আসিত, এবং মনিবের চা-পান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। চা প্রস্তুত করিবার ভার ভৃত্যেরই উপর ছিল। একদিন চায়ের কাপে একটা চুমুক মারিয়াই সৌরেশ বলিয়া উঠিল, "দুর্, চা-টা করেছিস্ কি !" বলিয়াই কাপটা নামাইয়া রাখিল।

অন্যদিন হইলে সৌরেশ কাপটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াই চাকরটাকে জবাব দিত, কিন্তু আজ মুখে ঈষৎ বিরক্তির রং দেখা দিলেও, ক্রোধের কোনও আভাস পাওয়া গেল না। তত্রাপি আতঙ্কে ভৃত্যটির মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল, "ফের তৈরী ক'রে আন্‌ছি—"

সৌরেশ নিষেধ করিল—"আর দরকার নেই। কাপটা নিয়ে যা।"

ভৃত্যটিও কথান্তর না করিয়া মনিবের আদেশ পালন করিল।

ক্ষণেক পরেই সৌরেশ নীচে নামিয়া গেল। বরাবর বামুন-মার কাছে গিয়া বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "একটু চা-ও, বামুন-মা, তোমরা আমায় খেতে দেবে না ?"

মনিবের সেদিনকার রোষের ঘটা বামুন-মা বিস্মৃত হন নাই, এবং এই কয়দিন তিনি অতি সন্তর্পণেই কাযকর্ম্ম করিতেছিলেন। আবার এই

দান

এক নূতন ত্রুটির কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, সুরেন চা ক'রে দিয়ে আসে নি?"

সৌরেশ মুখখানা ভারী করিয়া বলিয়া উঠিল, "চাকর-বাকর কি চা করতে পারে?"

কিন্তু, এই 'চাকর-বাকরে'ই এতদিন চা করিয়া আসিতেছে, এবং কোনও দিন এই অদ্ভুত অভিযোগ শ্রুত হয় নাই। বামুন-মা এই খাম-খেয়ালী মনিবটির কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ত্রস্ত-নেত্রে তাহার দিকে তাকাইলেন।

সৌরেশ তেম্‌নি করিয়াই বলিল, "এ-সব কায বাড়ীর মেয়েদের। কেন, মলিনা?"

বামুন-মার বুক হইতে এক গুরু আতঙ্ক সরিয়া গেল, এবং 'চাকর-বাকর'দের হাত হইতে তফাৎ করিয়া এই যে সৌখীন-কাযটার ভার কড়া-মনিব 'বাড়ীর-মেয়ে'র সম্মান দিয়া মলিনাকেই অর্পণ করিতে চাহে, এই অপ্রত্যাশিত-বাণী বামুন-মার পাচিকা-অন্তরে এক কঠিন পুলকের আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ হর্ষে ও কুণ্ঠায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পারে বাবা! তবে, তোমার যদি পছন্দ না হয়—"

"না, হবে না! ভারি ত কায!" বলিয়াই সৌরেশ বামুন-মার মুখের দিকে চাহিল। সে-চাহনি ইহাই ব্যক্ত করিল যে, তাহার আদেশ-মত এক কাপ চা তদণ্ডেই সে চাহে।

মলিনা কাছেই বসিয়া ছিল। সৌরেশ যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেদিনকার মত সে উঠিয়া পলায় নাই, তাহাও বামুন-মা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কন্যার প্রতি, তিনি খুসী হইলেন। একটু হাসিয়া মলিনাকে বলিলেন, "যা ত মা! 'দাদাবাবু'কে চা ক'রে দিবি এক কাপ। দুধ-চিনি সমান দিবি, আর কড়া-পাতলার দিকে নজর রাখিস্!"

মলিনা বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া গেল, ও সেদিনকার অসমাপ্ত ব্রত আজ উদ্‌যাপন করিল।

দিন দুয়েক পরেই, সৌরেশের মাথায় আর এক খেয়াল চাপিল। তাহার কাপড়-চোপড় কোঁচাইয়া, গুছাইয়া রাখিত সুরেন। একদিন স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িবে, সুরেনের হাতে কাপড়খানা দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া গেল—চমৎকার! জিজ্ঞাসা করিল, "কোঁচানো কার—তোর?"

সুরেন একটু বিব্রত হইয়া বলিল, "না—মলিনার। কাল বিকেলে ছিলাম না ত—ওকেই বলে গিয়েছিলাম!"

সৌরেশ আর দ্বিরুক্তি করিল না। নির্ব্বিবাদে কাপড় ছাড়িয়া, মাথা আঁচড়াইয়া বাহিরে আসিয়া রান্নাঘরের দিকে মুখ করিয়া যেন আপন-মনেই বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সবাই সব পারে, কিন্তু আমার কায করতে একটা—কেউ পারে না!"

বামুন-মা রান্নাঘরে ছিলেন, তাঁর বুকটা উড়িয়া গেল! তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জানিতে চাহিলেন—"কি বাবা?"

সৌরেশ কোঁচার ফুলটি দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "একদিন এমন-ধারা কোঁচাতো কাপড়!"

উত্তরেই খুঁটির মাথায় বসিয়া মলিনা কি করিতেছিল, অপরিসীম শরমে তাহার মুখটি ঝুঁকিয়া পড়িল। এই অভিযোগের উৎস কোথায়, তাহা বামুন-মার বুঝিতে দেরী হইল না। তৎক্ষণাৎ মলিনাকে কহিলেন, "সত্যিই ত, মা! দাদাবাবুর কাপড়খানি রোজ অমনি ক'রে কুঁচিয়ে রাখতে পার না? জানো ত সবই!"

অদূরে সুরেন দাঁড়াইয়া ছিল, সৌরেশ তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হুকুম দিল, "আমার কাপড়ে আর তুই হাত দিসনে! পুরুষমানুষের কায ও-সব নয়।"

সুরেনের মুখখানা ছাই হইয়া গেল! শঙ্কিত দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকাইতেই সে বলিল, "তুই অন্য কায কর্‌বি।" বলিয়াই উপরে উঠিয়া গেল।

সৌরেশের প্রকৃতি ছিল, এইরূপ যে, যে-দিকে সে একবার ঝোঁক দিত, সে দিকটার চূড়ান্ত করিয়াই ছাড়িত। বাল্যজীবনের সুরু হইতেই সে মায়ের কাছে এই শিক্ষাই পাইয়াছিল যে, প্রতি কাযে ভৃত্যের সাহায্য চাই, এবং এই চাওয়াটা স্বাভাবিক। অতঃপর ইহাও তাহার শিক্ষা হইল যে, ভৃত্যের নিকট হইতে সমস্ত কর্মাবলী, সুবিধার দিক দিয়া কড়াক্রান্তিতে হিসাব করিয়া লইতে হয়, এবং সেই হিসাবের প্রণালী যতই কুটিল, যতই অন্যায়, যেমনই অশোভন হোক্ না, তাহা রদ হইতে পারে না, কেন না, এ প্রণালী, এই প্রথা মনিব-সমাজের আইন-সঙ্গত। অতএব, এই-যে পুরুষ-চাকরের হাতের সেবা তাহার সুবিধায় হঠাৎ ঠোকা দিল, ইহা 'কিছুই না' বলিয়া উড়াইয়া দিবে সে কেমন করিয়া?

এদিকে মলিনাও 'দাদাবাবু'র অনেক কাযই খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়াছে। নারী-প্রকৃতির অর্থ ইহাই যে, উহা পুরুষের সঙ্গত সেবায় নিজেকে বিক্রু করিতে দ্বিধা বোধ করে না, করে না বলিয়াই মহিমায় উহা অত বড়, মর্য্যাদায় অত উঁচু। অতঃপর যে-সঙ্কোচ, যে-প্রশ্ন, যে-বিস্ময় একের কাছ হইতে অপরকে দূরে রাখিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

একদিন বিকালে বামুন-মা মালা জপিতে বসিয়াছেন, আর মলিনা সৌরেশকে 'খাবার' দিয়া তাহার একখানি রুমালে 'ফুল' তুলিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে ধোপা কাপড় লইয়া আসিল। মলিনা হাসিয়া আপন-মনে বলিয়া উঠিল;—'আমায় ভূতে পেয়েচে!' বলিয়াই হাতের কাযটি ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল ও কাপড়-চোপড় খাতার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া তুলিয়া রাখিল। তারপর ধোপা টাকা চাহিতেই,

সৌরেশ জামার পকেট হইতে বাক্সর চাবিটা মলিনার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এনে দাও—"

বামুন-মা তাড়াতাড়ি মালাগাছটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা। তুমি খেয়ে গিয়ে এনে দিয়ো—টাকাকড়ির বাক্স।"

সৌরেশ একটু-বেশ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "তাহলে, বামুন-মা, আজকে আমার খাওয়া চলে না!"

সুতরাং বাহাদের চলে, তৎক্ষণাৎ তার ব্যবস্থা করিয়া দিল মলিনা। সে চাবিটা উঠাইয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

কিন্তু, একটা দিক মলিনা এড়াইয়া চলিত। উপরে সৌরেশ একা থাকিলে বড়-একটা সে ত্রিতলে উঠিত না। কাযেই, উপরের যা-কিছু কায সুরেনই করিত বেশি। একদিন সন্ধ্যার পর সৌরেশ রোজকার তালিকা অনুযায়ী পড়িবার আসনে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে, সুরেন বিছানা ঝাড়িতে আসিল। সেদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল, সকাল হইতে উঠে নাই। সৌরেশ সুরেনকে দেখিয়া মৃদু-তাড়না করিয়া বলিল, "তুই উঠে এসেচিস্?"

সুরেন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তা'হোক্। এখুনি আবার যাচ্ছি।"

অতঃপর যেমন সে বিছানা ঝাড়িয়া বালিশে ওয়াড় পরাইতে যাইবে, সৌরেশ পুনশ্চ ধমক দিয়া উঠিল—"তুই কি পারিস্? রেখে যা—" তারপর 'ইতিহাসে'র কতকগুলা পাতা উল্টাইয়া একস্থানে মনটাকে যেন দৃঢ়-নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাচ্ছীল্যভাবেই কহিল, "মলিনাকে পরিয়ে দিয়ে যেতে বল্!"

তাড়না সহস্র মৃদু ও সঙ্গত হইলেও সুরেনের প্রাণটা উড়িয়া গেল। একটার পর একটা—তাহার প্রতি কাযেই ওই খেয়ালী-মনিব তাহাকে অযোগ্য করিয়া রেহাই দিতেছে, ইহার ফলাফল ভাবিতে গিয়াই,

তাহার দেহটা কাঠ হইয়া গেল। হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা!" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিয়দ্দূর গিয়াছে, সৌরেশ হাঁকিয়া ডাকিল—"বামুন-মাকে বল্‌বি —ওয়াড় পরানো ঠিক হচ্ছে না! বুঝ্‌লি?" বলিয়া পুনশ্চ পুস্তকে মনোনিবেশ করিল।

সুরেনও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মনিবের হুকুম—অবিলম্বেই মলিনা আসিয়া দুয়ার গোড়ায় দাঁড়াইল আদেশের অপেক্ষায়। পাঠ্য পুস্তকের উপর সৌরেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। মলিনার পদশব্দ সে-দৃষ্টিকে যেন জোর করিয়া তুলিয়া দুয়ারের দিকে নিক্ষেপ করিল। দেখিল—অদূরে, সম্মুখে চোখের উপর, একটি জীবন্ত পট! দেখিল—কপাটের গায়ে মুখ রাখিয়া, একটি ছিপছিপে ঈষৎ লম্বা নারীমূর্ত্তি! দেখিল—মুখের রঙ্‌টা তেমন ফর্সা নহে, অথচ —অথচ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, অনাবিল সুষমায় ছাওয়া! দেখিল—হাত-দুটির অনেকটা অনাবৃত, উহা সুগোল, সুপুষ্ট!

স্থিরদৃষ্টিতে ঐ মূর্ত্তিটির দিকে সে চাহিয়া রহিল। কেন রহিল, তাহা সে জানিল না, যেন থাকিতে হয়, তাহাই সে রহিয়াছে, যেন দেখিবার বস্তু, তাহাই চোখ পড়িয়াছে!

মিনিট পাঁচেক পরে মলিনা আস্তে-আস্তে মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমায় ডাকছিলেন? বালিশের ওয়াড় সুরেন পারলে না বুঝি পরাতে?"

সৌরেশের চমক ভাঙিল। বলিল, "ঠিক তা নয়! আচ্ছা, সেদিন—তুমি একটি কথা বল্‌বে?

মলিনা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

সৌরেশ হাতের পুস্তকখানির ভিতরে একটা আঙুল রাখিয়া চাপা দিয়া বলিল, "ভেতরে এসো—"

মলিনা মনিবের কথামত ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

সৌরেশ বইখানা খুলিয়া কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরগুলার পানে একবার তাকাইয়াই সুরু করিল, "প্রথম দিন আমাকে দেখেই ও ঘরে ছুটে ছিলে, তারপর সেই বাদলের দিন, যে দিন ঝম্‌ঝম্ ক'রে জল পড়ছিল, যে দিন চারিদিকে খুব অন্ধকার, যে দিন দালানের দুয়ার-জানালা বন্ধ ছিল, যে দিন বামুন-মা ছিল না, যে দিন—সেই গো, তুমি ছিলে একলাটি—আচ্ছা, সে দিন আর ছুট দিলে না কেন? উচিত ত ছিল—দেওয়া?"

মলিনার মুখটি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু পরে নতমুখী হইয়াই বলিল, "হয় ত ছিল না!" পরক্ষণেই কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আপনিও—" হঠাৎ থামিল, কে যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

কিন্তু, সৌরেশ ছাড়িবার পাত্র নহে, জেদ ধরিয়া বলিল, "থাম্‌লে যে?"

মলিনা বিপদে পড়িল। অপরাধিনীর ন্যায় বলিল, "ও কিছু না—আপনি মনিব!"

"মনিবেরই হুকুম—তোমায় বলতেই হবে!" বলিয়াই সৌরেশ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল।

মুখ ফস্‌কিয়া যে খোঁচটা বাহির হইয়াছে, তাহাকে চাপা দিলে অধিকতর অপরাধ হইবে ভাবিয়া মলিনা ভয়ে-ভয়ে বলিল, "আপনি—না, না, তা নয়! আপনি—আচ্ছা, গল্প শুনিছি—আপনি খুব কড়া মানুষ! পাণ থেকে চুণ খস্‌লে—না, না—!" থামিল।

সমস্তটাই শুনিবার জন্য সৌরেশের আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, অস্থির-কণ্ঠে বলিল, "ভয় খাচ্ছ কেন, আমি তোমায় ভয় করি?"

মলিনা বিব্রত হইয়া জবাব দিল, "তা কেন—আপনি মনিব!" অতঃপর একটু ইতস্তত করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "শুনিছি, সব জিনিসই আপনার ঠিকের মাথায় চাই, নইলে—"

"নইলে অনর্থ করি?" বলিয়া সৌরেশ মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

এবার মলিনা একটু সাহস পাইল। অধিকন্তু ওই মনিব-মানুষটির প্রতি যেন কিছু জোর খাটাইয়াই সহাস্যে বলিল, "নিশ্চয়ই ত!" পরমুহূর্তেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু, তেমনধারা আমি ত কিছুই দেখচিনে! সত্যি বলছি—চূণও অনেক খসেছে, আর বে-ঠিকের মাথায়ও অনেক কিছুই পৌঁছেচে, কিন্তু অনর্থের 'অ'-ও আমার চোখে ত পড়লো না!"

সৌরেশের মনের ভিতর কি প্রশ্ন উঠিয়াছিল তাহা বলা যায় না, মুখে বলিল, "চূণ খসতে, আর বে-ঠিক হ'তে কখন্ কি দেখলে, বলো ত?" মুখে হাসি ভরা।

মলিনা যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, তৎক্ষণাৎ বলিল, "হিসেব চান? শুনুন—প্রথম দিন আমার পান না দেওয়া! তারপর সুরেনের চা খাওয়া কথা, আর আজই তার এক টাটকা-ক্রটি!" বলিয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বিছানায় আসিয়া বালিশের ওয়াড় পরাইতে লাগিল।

সৌরেশ দিক্-নির্ণয় করিবার যন্ত্রের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আর, অনর্থটা কি করতাম ব'লে তোমার মনে হয়?"

"আমার বিদেয়, আর সুরেনের চাকরী-যাওয়া—এই যাঃ, কোন্ ওয়াড়টা কোন্ বালিশে পরিয়ে ফেলেছি!" জিব্ কাটিয়া মলিনা হাতের বালিশটির ওয়াড়টা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

সৌরেশ দৃষ্টি নামাইল। খানিক কি ভাবিয়া বলিল, "তোমারই আগে হয়ে যাক্! আর কিছু?"

"আর কিছু?—আর কিছু বলবো?—আমার ভাজ, সুরেনের চাকরী পাকাই হয়ে গেল—দোষ করেচি কি না!" বলিয়া মলিনা একমুখ হাসিয়া ফেলিল।

এই ঠোকা, এই হাসি—মলিনার মুখের দুটি বস্তুই সৌরেশ যেন এক নিমেষে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা চালাক তুমি, কিন্তু! দিব্যি আমাকে ভুলিয়ে দিতে চাও! আমার কথার জবাবটা—দ্বিতীয় দিনে, আর এক রকম তুমি হ'লে—কেন বলো ত?"

মলিনা স্মিতমুখে বলিল, "মানুষের মন রোজ-রোজ বদলায়, তাই আমারও মন বদ্‌লেছিল সে দিন—শুন্‌লেন ত?"

সৌরেশের চোখদুটা হঠাৎ উজ্জল হইয়া উঠিল। বলিল, "না মলিনা! শুধু শুনিনি, বুঝেচিও সেদিন যে, আমারও মতন একটা মন সত্যিই একদিন উল্‌টে যেতে পারে! আর, যে-ঝড়ে ওল্‌টায়, সে-ঝড় তাড়িয়ে আনে মেয়েমানুষ! কার মত জানো—তোমার মত, যার মুখে আর কথায় অসীম শক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই—ও কি, উঠ্‌লে?"

মলিনা খাট হইতে নামিয়া নীচে দাঁড়াইয়াছিল। সহাস্যে বলিল, "দুটো ত বালিশের ওয়াড়—একটা মাথার, একটা পাশের। সারাটা রাত লাগে?—এইবার ছুটী ত?" বলিয়া বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সৌরেশ বাধা দিয়া বলিল, "খাবারের কত দেরি?"

"হয়ে এসেছে!"

"কে জায়গা ক'রে দেবে?"

মলিনা বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া বলিল, "যে রোজ দেয়—সুরেন! কেন?"

"না, তুমি দিয়ো!" সৌরেশ এক দাবীর কটাক্ষ করিল।

মলিনা মুখ টিপিয়া হাসিল, এবং সেই হাসিরই আলো ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল—পশ্চাতের দিক্‌টায় অন্ধকার হইল কি না, কে জানে!

: চার :

বিবিধ উপাদান দিয়া তৈরী মানুষের জীবন। এতন্মধ্যে আরাম ও আত্ম-বিশ্রাম এই দুইটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল, ইহারা অপরাপর সব কয়টিকেই নিস্তেজ করিতে নিয়তই উন্মুখ। এই জন্যই পৃথিবীতে শাসনের সৃষ্টি। সৌরেশের জীবনটা সুরু হইতে মাত্র এই দুইটি উপাদানেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নরজীবন এমনই একরোখা কয়েক ভাগে বিভক্ত যে, প্রতি স্বতন্ত্র অংশ, স্বতন্ত্র বয়সের, স্বতন্ত্র প্রকারের স্বতন্ত্র আত্মীয়-আত্মীয়ার আদর বা শাসনের মুখ চাহিয়া থাকে —পুষ্ট হইবার উপাদান গ্রহণ করিতে। এইরূপ সৌরেশের জীবনটা এক পৃথক বিভাগে পড়িয়াছিল বলিয়াই সে এক নূতনতর আরাম ও আত্ম-বিশ্রামের উৎসাহ আর-একজনের নিকট পাইয়া গেল—যাহার বয়স, প্রকার, আত্মীয়তা সমস্তই স্বতন্ত্র!—সে মলিনা! এই মলিনার ভিতর-বাহিরকার 'আদর' শুষিয়া সৌরেশ যে বিলাসের উপাদান গ্রহণ করিতে লাগিল, উহা অচিরাৎ উঁচু, প্রবল, বিজয়ী হইয়াই উঠিল!

প্রথম জীবনটায় যে-রঙের আরাম ও আত্ম-বিশ্রাম শুধুই সৌরেশের পরিচিত ছিল, তার প্রতি ফোঁটা রস মুখে ঢালিবার জন্য সে চাকর-বাকরের ত্রুটির দিকে কড়া নজর রাখিত, এবং উহার এতটুকুর সন্ধান পাইলেই অনর্থের সৃষ্টি করিত। কিন্তু, এই নূতন জীবনটায় পদার্পণ করিয়া, এমন কি, বিনা ত্রুটিতেও সুরেনকে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে না ছাড়িলেও তাহার উপর রুক্ষ হইত না। স্পষ্টই টের পাওয়া যাইত যে, যে-স্থান হইতে তাহার ঐ উষ্ণ-প্রস্রবণ উত্থিত হইত, সে স্থানটাকে ঘিরিয়া এক গোলাকার জল প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—যাহার

স্নিগ্ধ বারিধারা নিরন্তর ওই অগ্নিকুণ্ডের উপর বর্ষিত হইতেছে। বুঝি বা, প্রষ্টা—মহিমা!

কিন্তু, কেন? 'দাদু'র অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী সৌরেশ, এক তুচ্ছ পাচিকা-কন্যার অতটা অনুগত হইয়া পড়িল কোন্ স্নিগ্ধতায়? মানুষমাত্রেই উপাসক—কেহ বা প্রেমের, কেহ বা সৌন্দর্য্যের। যে প্রেমের উপাসক, সে এমন-এক বস্তুকে সম্মুখে খাড়া করিয়া ধরে, যাহার মূর্ত্তি আছে এবং সে-মূর্ত্তি অচেতন হইলেও, তাহাকে সচেতন, প্রাণপ্রতিষ্ঠ করিয়া সে তুলিয়া লয়—লইতেই হয়। যে সৌন্দর্য্যের উপাসক, অথবা কাঙাল, সে মূর্ত্ত বস্তু—আকৃতির দিকে চোখ ফিরায় না, সে চায় কোনও পদার্থ, যাহার মূর্ত্তি নাই, থাকিলেও তাহা কল্পনার অতীত, দৃষ্টির বাহিরে। অথবা, কোনো দিন, কোনোও যুগে তাহার জীবন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সৌরেশ উপাসক ছিল—সৌন্দর্য্যের। ভরন্ত তরুণ জীবনটার মাথায় হঠাৎ যে-বস্তু তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার সজীব, সচল, রক্ত-মাংসের মূর্ত্তি থাকিলেও প্রেমের দিক দিয়া ভক্ত উহার উপাসনায় বসে নাই! বুঝি বা, এক সীমাহীন পরিমাণ-বিহীন অফুরন্ত সৌন্দর্য্য—এই ছিপ্‌ছিপে মেয়েটির চোখ-মুখ দিয়া প্রতি চাহনিতেই বাহির হইতে সে দেখিয়া থাকিবে, তাই বুঝিবা তাহারই বেদীমূলে নতজানু হইয়া সে বসিয়া পড়িয়াছিল! উপাসক স্তবে ভোর হইয়া থাকে—আরাম পায় বলিয়া, আত্ম-বিশ্রামের নিমিত্তই। সৌরেশও এই আরাম ও আত্ম-বিশ্রামেই মাতিয়া উঠিয়াছিল।

মাসখানেক অতিবাহিত হইয়াছে। ভাটার টানের মত সৌরেশ অনেকটাই বহিয়া আসিয়াছে—প্রতিহত করিবার কোনও বস্তু তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িতে পায় নাই। 'দাদু' সর্ব্বক্ষণ বাহিরেই থাকিতেন,

কাযেই এ-সব দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতে পাইত না। চাকর-বাকরে নজর পড়িলেও তাহারা তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইত, কেন না উহা ভৃত্যধর্ম্মবিরুদ্ধ! বামুন-মার চোখ এড়াইত না বটে, কিন্তু, তিনি মনে-মনে খুসীই হইতেন, কেননা, মেয়েটা মনিবের মন যোগাইতে পটু হইতেছে! ক্রমশ এম্‌নিই হইয়া দাঁড়াইল যে, সৌরেশের প্রতি চলাফেরার গতিটা পর্য্যন্ত মলিনাকে নির্ণয় করিয়া দিতে হইত—যেমন করিয়া অপটু পঙ্গুকে রাস্তার লোক ডোবা-খাল পার করিয়া দেয়, যেমন করিয়া সরল শিশুগুলাকে বাৎসল্যের প্রতিমা সহোদরা মুখ মুছাইয়া, কাজল পরাইয়া, কপালে টিপ দিয়া ছাড়িয়া দেয়, যেমন করিয়াই বা পূজারিণী পূজার জায়গা ধুইয়া-মুছিয়া নৈবেদ্যের ডালি রাখিয়া পশ্চাতে ফিরে; শুধু কিছুরই হয় না, হয় শুধু—একের হাসি-মুখ, অপরের বাঙা বুক!

একদিন মধ্যাহ্নে সৌরেশ আহার করিতে নীচে নামিতেই ডাক-পিয়ন তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানা পড়িয়াই সৌরেশের মুখখানা হঠাৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেল! চিঠিখানা মলিনার মায়ের নামে। নিকটে কেহই ছিল না, তত্রাপি একটিবার এদিক-ওদিক চোরা-চাহনি ফেলিয়াই চিঠিখানাকে জামার পকেটে পুরিয়া ফেলিল।

আহারে বসিবার সময় প্রতিদিনই সৌরেশ 'দাদু'র সহিত একত্রে বসিত; কিন্তু সেদিন 'দাদু' কার্য্যবিশেষে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন, কাযেই তাহাকে একাই বসিতে হইবে। অন্যদিনের ন্যায় দালানেই তাহার 'ঠাই' হইয়াছিল, কিন্তু আজ নিজেই সে আসনটা উঠাইয়া আনিয়া রান্নাঘরের এক পাশে পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

বামুন-মা ভাত বাড়িতেছিলেন ও মলিনা আঁচলে একটি বাটি মুছিয়া ঘি ঢালিতেছিল। মনিবের এই কাণ্ড দেখিয়া মলিনা অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি—কেন?"

অন্যদিন হইলে সৌরেশ প্রত্যুত্তরে একটু হাসিত অথবা অমনো ঠাট্টা করিত একটু। কিন্তু আজ সে-দিক দিয়াই সে গেল না। একান্ত সহজ গলায় বলিল, "সব স্বাভাবেই ত আছ তোমরা, মলিনা! আমার হাতে ময়লা ত ধরেনি!"

মলিনা তেমনি করিয়াই বলিল, "এ কাযগুলো কি পুরুষ-মানুষের?" বলিয়া জল-হাতে আসনের মুখের জায়গাটা মুছিয়া দিতে বসিল।

সৌরেশের মুখে এইবার একটু হাসির আভা দেখা দিল। মলিনার চলন্ত হাতটার উপর দৃষ্টি পাতিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার হয়—"

মলিনা সৌরেশের দিকে একটিবার তাকাইল—চোখে কত না বিস্ময়, কত না মিনতি। তারপর মুখ নামাইয়া নিঃশব্দে জায়গাটুকু পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া দিয়াই উঠিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ঐ ছেলেটির প্রতি এক তীব্র কটাক্ষ করিল।

এই মলিনা! যুগ নয়, বৎসর নয়—মাসখানেক আগেই এই মেয়েটি সমাজের কঠিন আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, যেন পৃথিবীর কোনো চক্ষুই তাহার নারীদেহে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারিবে না। আর আজ তাহার এই পরিণতি! যে-মানুষটির চোখের দৃষ্টি তাহার কাছে কিশোরীর মতই নিষিদ্ধ ছিল, তাহারই প্রতি [illegible] নির্ভয়ে—বেচারার চোখের সমস্ত জ্যোতি জড় করিয়া নিক্ষেপ করিতেছে।

নিরামিষ তরকারি দিয়া সৌরেশের ভাত খাওয়া হইল। অতঃপর বামুন-মা হাত ধুইয়া মাছের হেঁসেলে হাত দিতে যাইতেই মলিনা ত্বরিত-পদে তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "মাছ আমি দিচ্ছি, মা!" বলিয়াই মাছের পাত্র স্পর্শ করিল।

বামুন-মা সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "পারবি তুই মাছ দিতে? ঐ বড় মুড়োটা তোল্—"

"না, আমার জন্যে রাখবো।"—বলিয়াই মলিনা যেন একমুখ রাগ করিয়া বাটি ভরিয়া ঝাল-দেওয়া একটা প্রকাণ্ড মুড়ো ও খানকতক মাছ সৌরেশের পাতের গোড়ায় ধরিয়া দিতে গেল।

একই দৃষ্টির সীমানায় যদিও ঐ মাছ-তোলাতুলির কাণ্ডটা চলিতেছিল, তথাপি সৌরেশের সেদিকে যেন নজর পড়ে নাই, যেন সে অন্যমনস্ক হইয়াই মুখের গ্রাসগুলা তুলিতেছিল। হঠাৎ মাছের বাটিটা পাতের গোড়ায় নামিতেই সে দুই হাতে মলিনার লক্ষ্যীকৃত স্থানটা ঢাকা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, না! মাছ-টাছ দিয়ো না!"

মলিনা সৌরেশের মুখের পানে বিস্ময়ে তাকাইল। তাকাইতেই সৌরেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলাম!"

মলিনা মায়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া মুখ কাঁপাইয়া বলিল, "দেখলে মা!"

বামুন-মাও অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনিবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি, বাবা! 'মাছ খাবো না'—ও কি কথা?"

সৌরেশ মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "মাছটা, বামুন-মা, রাজসিক আহার! এটা অনর্থক খাদ্য! আর একটা কি জানেন—একের ক্ষণিকের তৃপ্তি, অপরের চিরকালের মৃত্যু।"

বামুন-মা মূঢ়ার ন্যায় বলিলেন, "কিন্তু সবাই ত খাচ্ছে, বাবা!"

সৌরেশ মুখের গোড়ায় জলের গ্লাসটা উঠাইয়াছিল, নামাইয়া বলিল, "সবারের সঙ্গে নিজের তুলনা কোন দিন করিনি, আজও করবো না। মিথ্যে, অম্বল আছে?"

"তা দিচ্ছি। কিন্তু পাতে মাছ দিতে পাবো না, কি বলছ তুমি! বাঙালীর ছেলের মাছই আহার। হাড়-শক্ত হবে কি ক'রে?"

সৌরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "দাঁড়াও, বামুন-মা! এক-একটা ক'রে জবাব দিই। বাঙালীর ছেলের আহার মাছ একেবারেই নয়! 'আমরা খাই জোর ক'রেই! এখনও আমাদের পরিচয় দিতে গেলে গোত্রের খোঁজ পড়ে—কোন্ ঋষির সন্তান! যে ঋষির ছেলে, মুনির বংশধর নয়, সে বাঙলার আসল ছেলেই নয়। কিন্তু এই পরিচয়ের সম্মান রাখতে গেলে, আমাদের আহার ঠিক করতে হয় ফল আর মূল, বড়জোর—দুটো আলোচাল!" একটু থামিয়াই আবার শুরু করিল, "আর, হাড় শক্ত হবে কি ক'রে? আচ্ছা বামুন-মা, তোমরা ভূতের মত খাটচ কি ক'রে, বলতে পার? একখানা ছুরি নিয়ে তোমার এক টুকরো, আর আমার একখানা হাড় কাটো, দুইয়ে দেখ দেখি, কার হাড় শক্ত বেশী?"

বামুন-মা হঠাৎ কোনও প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা জবাব দিতে হইবে, তাই তিনি বলিলেন, "আমাদের কথা ছেড়ে দাও, পোড়া কপাল!"

কথা কয়টি সৌরেশ যেন লুফিয়া ধরিয়া বলিল, "ভগবান যখন মেয়েমানুষ সৃষ্টি করেন, তাদের কপাল তখনই পুড়িয়ে আলাদা ক'রে পাঠান না। সৃষ্টির সময় সকলকেই এক রক্ত, একই মাংস দিয়ে তৈরী করেন। কিন্তু বিধবার দেহ এত পুষ্ট কেন? 'তারা সাত্ত্বিক আহার করে বলেই, যে-আহার নইলে সংযমের, ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতা মেয়েদের দেহে আসতেই পারে না, এ কথা দিব্যি গেলে আমি বলতে পারি!" একটা ঢোঁক গিলিয়া আবার বলিল, "সত্যি বলছি, একটু ঘি আর খানিকটে দুধ হলেই আমাদের পেট ভরবার বাকিটা এক তিলও থাকে না!"

এ-সমস্ত যুক্তিতর্ক বামুন-মায়ের মনের সঙ্গে খাপ খাইল না। বুঝি বা তাঁহার বৈধব্য-জীবনের একচোট প্রলোভন হস্তান্তরিত করিতে তাঁহার

প্রাণ চাহিল না। হাসিয়া বলিলেন, "কাঁচা বয়সে ও-সব করতে নেই, বাবা! ছেলেমানুষি ছাড়ো! দে মলিনা মাছ—"

"না, বলেছি—খাবো না! আমার রুচি হয় না, ব্যস্!" বলিয়াই সৌরেশ মুখটা কঠিন করিয়া হাত সরাইয়া লইল।

মলিনারও মুখখানা শক্ত হইয়াছিল। মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এম্‌নি ক'রে সে দিন, মা, পাঁঠা ছেড়েচেন, ডিম ছেড়েচেন! আজ আর-এক থেউ—'মাছ ছাড়বো!' বলিয়াই মুখখানা অধিকতর কঠিন করিয়া বাটি-সুদ্ধ মাছ পাতে ঢালিয়া দিল।

সৌরেশের মুখে হঠাৎ একটু হাসির আভা দেখা দিল, কিন্তু উহা অতিরিক্তই ম্লান, ক্ষীণ—যেন দিবসের শেষ রশ্মি রাত্রির কাল-ছায়ায় রূপ হারাইয়াছে! একটু পরেই মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমিও বলেছি—খাব না!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

সঙ্গে-সঙ্গে মলিনারও মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল! একটু পরেই দেখা গেল, তাহার চোখে জল আসিয়াছে! মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে আর খানিক বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আমাদের অপরাধ?"

"এই নাও না, তোমাদের চিঠি—" বলিয়া এক তীক্ষ্ণ জবাবের মতই সৌরেশ বামুন-মার চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

হঠাৎ কোথা হইতে কি আসিয়া পড়িল, তার প্রকৃত রূপ বামুন-মা ও মলিনা উভয়ের কেহই তন্দণ্ডে ধরিতে পারিল না। একবার সৌরেশের মুখের দিকে ও আর একটিবার কুঞ্চিত পত্রখানির দিকে বিহ্বলনেত্রে চাহিল। অতঃপর মলিনা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পত্রখানা কুড়াইয়া লইল এবং পড়িতে গিয়াই তাহার মুখটা বিষম ঝুঁকিয়া পড়িল।

বামুন-মা ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "কার চিঠি, মলিনা?"

"আমার। তুমি ত পড়তে জানো, মা—" কথা কয়টি কোনরূপে উচ্চারণ করিয়াই মলিনা চিঠিখানা মায়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। দেখা গেল, বাহিরের 'রকে' রাখা স্তূপীকৃত ভিজা-কাপড়গুলা নিংড়াইয়া একমনে এক-একখানা করিয়া সে আলনায় ছড়াইয়া দিতে লাগিয়াছে—যদিও এই নির্দ্দিষ্ট কাযটা বাড়ীর এক ভৃত্যেরই। আর কাযটাকে এমনিই ভাবে সে খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়াছে যে, ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে ঐ কাযটা তাহারই, এবং এই জন্যই সে এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছে, যেন মৌন অর্দ্ধরাত্রির ম্লান জ্যোৎস্নালোক [illegible] লোকালয় অস্পৃশ্য বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াও [illegible] [illegible] ঘন-ঘন মুখ আড়াইয়া একান্ত বিরহীকে নির্ব্বাক করিয়া তুলিয়াছে।

: পাঁচ :

চিঠিখানা পড়িয়া বামুন-মার মুখচোখ পুলকে দীপ্ত হইয়া উঠিল। চোখ তুলিতেই সর্ব্বাগ্রে সৌরেশের উপরই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—সে তখনও স্থির হইয়া আসনের উপর দাঁড়াইয়া। মুখের দীপ্তিকে আপাততঃ চাপা দিয়া বামুন-মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, আঁচাওনি এখনো? জল দেয়নি বুঝি মলিনা? যা হোক্ মেয়ে!" বলিয়া মুখ ভারি করিয়া নিজেই সৌরেশকে ডাকিয়া বাহিরে গিয়া তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর হাতে একখানা গামছা ফেলিয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "মলিনার লজ্জা হয়েচে! চিঠিখানা আমার ভায়ের—ওর আসচে মাসে বিয়ের দিন হয়েচে কি না!"

চিঠিখানার ভাষা, প্রত্যেক অক্ষরটি পর্য্যন্ত সৌরেশের স্মৃতিপথে ছিল, তবুও আনাড়ীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "এই মাসের পরের মাসেই? গোড়াতেই না কি?"

বামুন-মা কহিলেন, "না, শেষাশেষি!" একটু থামিয়াই আবার বলিলেন, "ভাবনা হয়েছিল, বাবা! ছেলে আগে মেয়ে পছন্দ করেনি—রঙ্‌টা একটু ময়লা বোলে! যাক্, নারায়ণ তার মতি ফিরিয়ে দিয়েছেন!"

সৌরেশ ঈষৎ হাসিল, বলিল, "আজকালকার ছেলেরা চক্‌চকে মেয়েই চায়!" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু, মলিনা কি কালো?—না, না!"

বামুন-মায়ের পক্ষে যথেষ্ট হইল! তৎক্ষণাৎ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "যে যাই বলুক, বাবা, এমন নরম, আর এমন কাজের মেয়ে কোনও ছেলে

পেলে হয়!" একটু পরেই আবার আরম্ভ করিলেন, "মেয়েটি [illegible]
যা হয় না, নইলে—মুখটি ত দেখেছ বাবা, আমার [illegible]—[illegible]
[illegible], চোখ দুটি ত জ্বলছে! আর চুলেরই বা শোভা কি—যেমনি
কুচকুচে কালো, তেমনি পায়ের গোছে লুটিয়ে পড়ছে!"

সৌরেশ কোনও জবাব দিল না, নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

বামুন-মা এক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিলেন, "যাই হোক্, বাবা, তোমাদের কল্যাণে দায় থেকে এখন রেহাই পেলেই বাঁচি!"

সৌরেশ এইবার কথা কহিল, বলিল, "ছেলেটি খুব দেখতে ভালো, বামুন-মা—খু উ-ব?"

বামুন-মা মুখ নামাইলেন। বলিলেন, "আমরা গরীব মানুষ, দেখতে-শুনতে ভালো—তেমন ছেলে কোথায় পাবো, বাবা!"

"রঙ?"

"কালো—"

"একটুই ত?"

বামুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—"না, খুব!"

"মুখ?"

বামুন-মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বেটা-ছেলের মুখ—ভালো-মন্দে এসে যায় না ত, বাবা! একটু খুঁৎ আছে মুখে—"

যেন এক হালকা কৌতুকেই সৌরেশ প্রশ্ন করিল—"কি?"

নীচেকার ঠোঁটটির খানিক নেই! ছেলেবেলায় কি হয়েছিল, ডাক্তারে বাদ দিয়েছে!"

"বয়স?"

"একটু হয়েছে, বাবা! দ্বিতীয় পক্ষের কিনা! তবে, ছেলে-পিলে নেই! তাই ত আবার সংসারী হবে!"

দায়।

সৌরেশ হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, "টাকা দিতে হবে ত ?"

বামুন-মা মুখখানা ম্লান করিয়া জবাব দিলেন, "টাকা ? কোথায় পাবো, বাবা! যুগ্যি মেয়ে ব'লে অমনি নিচ্ছে, ঘরে কেউ নেই কিনা!"

সৌরেশ তাহার স্থির চোখ দুটি ঈষৎ উঁচু করিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গহনা ?"

অতি কষ্টেও বামুন-মার মুখে হাসি আসিল। বলিলেন, "গহনার কথা বলচ ? তোমাদের কাছে যা মাইনে পাবো আর কুড়িটি টাকা আমার ভাই দেবে, এতেই শাঁখা সাড়ীটি হবে শুধু!"

ঠিক এমনি সময়ে মলিনা নিঃশব্দ শিশিরের ন্যায় আসিয়া এক রেকাবী পান সৌরেশের সুমুখে ধরিয়া দিল।

যে-মুখের, যে-চোখের বিবরণ এইমাত্র বামুন-মা দিলেন, সেই মুখ-চোখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া সৌরেশ জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"তবু ভাল!"

মুহূর্ত্তে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, মুখটি রাঙা হইয়া উঠিল! তৎক্ষণাৎ কোনও রূপে ঘাড় ফিরাইয়া, মুখ লুকাইয়া ধীর পদে তেম্‌নিই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

যেমন প্রত্যহই কাটে, তেমনি আজও দিনের বাঁকী অংশটুকু কাটিয়া গেল। সৌরেশের রাত্রের খাবার বামুন-মাকে উপরেই দিয়া আসিতে হইত। আজ হাত-যোড়া বলিয়া তিনি মলিনাকে পাঠাইয়া দিলেন।

উপরে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই মলিনা দেখিল, সৌরেশ লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিয়াছে! যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি! অমন করে ?"

"জ্বর এসেছে বড্ড!" বলিয়া সৌরেশ মলিনার দিকে একটিবার মাথা তুলিয়া তাকাইয়াই বালিসের উপর মাথা রাখিল।

মলিনার মুখের আরক্ত আভা অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল।

"জ্বর এসেছে? কখন থেকে?"

সৌরেশ নিস্তেজ গলায় জবাব দিল, "বিকেল থেকে।"

"বিকেল থেকে? কাউকে ডাকৃতে নেই?" বলিয়াই মলিনা খাবারের ডিস্‌খানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া কাছে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

সৌরেশ আসক্তিহীন কণ্ঠে বলিল, "কাকে ডাকৃবো, মলিনা? তোমায়?"

"বেশ, তাও ত পারতেন!" বলিয়া মলিনা মুখখানা ভারি করিল।

সৌরেশ প্রত্যুত্তর করিল, "বেশ হোক্, আর, না-ই হোক্—তাই-ই পারতাম! কিন্তু, আর তা হয় না, মলিনা।"

মলিনা সপ্রশ্ননেত্রে সৌরেশের দিকে চাহিল।

সৌরেশ ঈষৎ হাসিয়া ম্লানমুখে বলিল, "কেন—জানতে চাইচ? তোমার নিজের কাছ থেকেই সে জবাবটা নাও! মলিনা, আজকে ডাকৃলে তোমায় পাবো। তার—প—র?"

মলিনা খুকী নহে! এই মানুষটির মুখ দিয়া যে প্রবাহ বহিয়া গেল, তাহার উৎপত্তি কোথায়, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিল। কিন্তু অর্থহীন এ কাহিনীর সে জবাব দিবে কি? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না-হয়, সুরেনকেও—"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সৌরেশ বলিয়া উঠিল, "মলিনা, পীড়িতের সেবায় যদি আর কেউ স্থান পেতো, তা হ'লে রামচন্দ্র সোনার 'সীতা' তৈরী করতেন না!—একটু জল দিতে পারো?" বলিয়া উঠিয়া বসিল।

মলিনা তাড়াতাড়ি হেঁটমুখে এক গ্লাস জল আনিয়া দিল।

জল-গ্লাসটা সৌরেশ নিমেষেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। অতঃপর নিজেই গ্লাসটা নীচে নামাইয়া রাখিয়া এক সুদীর্ঘ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বিকেল থেকে তেষ্টা পেয়েছে!"

"তবুও কাউকে ডাকেননি!" বলিয়া মলিনা চোখ বড় করিয়া সৌরেশের পানে তাকাইল—সে চোখে শুধুই ভৎর্সনা!

সৌরেশ একটু হাসিল—সে হাসি নিষ্প্রভ, নিস্তেজ। বলিল, "তুমি পাগল, মলিনা, তুমি পাগল!" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "তুমি আর এ ঘরে থেকো না—নেমে যাও!" বলিয়াই আবার লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

মলিনা মুখ নীচু করিল, কিন্তু নড়িল না। নিঃশব্দে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া হঠাৎ মুখ তুলিল, এবং সৌরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই চোখ নামাইয়া লইল। পরক্ষণেই যেন মরীয়া হইয়া আবার চোখ উঠাইয়া বলিয়া ফেলিল, "আমার একটা কথা রাখবেন?"

সৌরেশ তাচ্ছীল্যভাবেই জবাব দিল, "শপথ করতে পারিনে। কিন্তু, বলই না?"

"বিয়ে করুন, বলুন—'করবো'!" বলিয়া মলিনা সৌরেশের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এমনি করিয়াই যে, তাহার বুকে যেন এক ঝড় উঠিয়াছে—যাহার সমস্ত গতিরই মুখ ফিরাইয়া ওই লোকটির পানে সে ধরিয়াছে!

সৌরেশ যেন এই রকম, এমনিই ধারাই এক দুর্লভ প্রশ্নের অপেক্ষা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "বিয়ে করবো, বলচো? কিন্তু, কাকে করবো, মলিনা?"

"অভাব?"

সৌরেশ ঘাড়টা উঁচু করিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া কণ্ঠ সুর করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই! অভাব—সৃষ্টিকর্তার রচনায় এ একটা অভাবই!" আবার বলিয়া উঠিল, "অমন মুখ আর-একটি কি হয়, মলিনা? তা হলে ঈশ্বরের রচনায় ছি ছি পড়বে!" পরক্ষণেই উত্তেজিত হইয়া বলিল, "মেয়েমানুষ কি করে জানো—পুরুষের বুক কেটে মুখের একটা ছাপ ফেলে, হেসে, পেছন ফিরে অদৃশ্য হয়! আর পুরুষে কি করে শুনবে, মলিনা? ভিখারী সাজে, পাগল হয়, ছাই মেখে শিবের মত শ্মশান বুকে ক'রে থাকে।" হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া আবার সুরু করিল, "আর কি হয় শুনবে—হিমালয়ের মত পাথর হয়, যার চোখ ফেটে অনন্ত-প্রবাহী অশ্রুর ধারা তুফানীর পানে ভেসে যায়!" বলিয়াই আবার শুইয়া পড়িল।

মলিনার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল!—এ কি! 'দাদাবাবু'র সুর দিয়া আজ কি বাহির হইয়া পড়িল! সে ত এক তুচ্ছ পাচিকা-কন্যা, আর সম্মুখের ঐ মানুষটি যে অসামান্য—অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী সম্রাট! যাহাকে রূপহীনা বলিয়া একজন উপেক্ষা করিয়া অবশেষে বড় করুণায় খুটিয়া লইতে চাহিয়াছে, তাহারই অতি তুচ্ছ নারীদেহে এমন কি রত্ন আছে, যাহা দেবকুমার আদর করিয়া লয়? যে একটা বালিকা-জীবন তিল তিল করিয়া নিরাশায় বাড়িয়া বড় হইয়া শুধুই একটিবার খালি-হাতে দেবালয়ে মুখ বাড়াইতে আসিয়াছে, উহারই পানে কি মন্দির-বাসী চাহিয়া সারা হইতে পারে?

মলিনার বুকের ভিতরটা আবার একবার দুলিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িল! কিয়ৎক্ষণ পরে নতমুখটি সৌরেশের পানে উঠাইতেই চোখ দুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল, ধরা-গলায় বলিল, "আমার এত খোয়ার হচ্ছে কেন, শুনি? কি করেছি আপনার—"

বিকৃত কণ্ঠস্বরে সৌরেশ চমকিয়া উঠিল। একটিবার মলিনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু ভৎসনা করিয়া বলিল, "ছুঃ! 'আপনি-আপনি' বললে মুখ ফিরিয়ে শোবো—'তুমি' বল।"

এ আবার কোন শাস্তি! মলিনা শিহরিয়া উঠিল, তাহার ছুকান দিয়া বুকে কে যেন বরফের গুঁড়া পুরিয়া নির্মম হাতছানি দিয়াছে। একটু পরে মুখ ভারি করিয়া অতিকষ্টে বলিল, "তা হলে আপনি—না, না।—আপনি—দূর ছাই—"

সৌরেশ অভিভূতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হোক্—হোক্! তুমি—তুমি—"

সম্মোহিতার ন্যায় মলিনা বলিয়া ফেলিল, "তুমি—তুমি—" তারপর কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল না—আঁচলে মুখ ঢাকিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিয়া ফেলিল।

সৌরেশ মলিনার দিকে চাহিল, এবং তন্মুহূর্তেই তাহার সর্বদেহ নূতন ধরণের এক আবেশে শিহরিয়া উঠিল! এতদিন বাড়ীর চাকরের নিকট সে যাহা পাইয়া আসিয়াছে, মলিনার নিকটও তাহাই প্রাপ্য—এইটুকুই শুধু তাহার ধারণা ছিল। কিন্তু আজ সহসা তাহার মনে হইল ঐ লজ্জানতা বিহ্বলার নিকট হইতে আরও কিছু তাহার পাওনা রহিয়াছে, যাহা এখনই—এই মুহূর্তেই পাওয়া চাই-ই! আর, এই পাওনায় তাহার অধিকার আছে, দাবী আছে, জোর-জুলুম আছে।

অতঃপর যে-দায়িত্বের অসম্মান হেতু বিশ্বামিত্রের ঋষি নামে কলঙ্ক পড়িয়াছিল, ঠিক সেই রকম এক দায়িত্বকে, সৌরেশের বুক টুকরাইয়া কে যেন ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল। চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই সে বিছানা হইতে হাওয়ার মত উড়িয়া আসিয়া মলিনার পাশে বসিল ও ছুই হাতে বেড়িয়া তাহার মুখটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তা হয় না, মলিনা! আদর করতে আমিও জানি—!"

"দোয়াত-কলমটা দাও ত, বাবা"—ঠিক এমনি সময়ে বামুন-মা অকস্মাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং সম্মুখেই ঐ কাণ্ডটা তাঁহার চোখে পড়িয়া গেল—যাহা বয়স্থা অনূঢ়া কন্যার মায়ের চোখে পড়িতে নাই—যাহার অনস্তরেও সমাজ, ধর্ম, কুল—ইহকাল-পরকালের সমস্ত শোভাই মানুষের হাহাকার, ছাই হইয়া যায়!

মলিনার মুখখানা নিমেষে শাদা, রক্তহীন হইয়া গেল। [illegible] পাতার মত থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে [illegible] ঠিকরাইয়া গিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

সৌরেশ কিন্তু এক পা-ও নড়িল না, তাহার চোখে-মুখে [illegible] চাঞ্চল্যের বর্ণ-পরিবর্তন দেখা দিল না—যেন এই গর্হিত কার্য—তাহার এই অসঙ্গত আচরণ স্বাভাবিক; যুগে-যুগে, পলে-পলে, ঘরে-ঘরে ইহার প্রচলনই হইয়া আসিতেছে। যেন বা, সমাজ ইহা অনুমোদন করে, ধর্ম ইহা চাহে—কুলের ইহাই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার! অথবা, ইহকাল-পরকালের এ ছাড়া বড় শোভা আর নাই, থাকিতে পারে না!

অত্যল্পকাল পরেই অচপলকণ্ঠে সে বলিল, "বামুন-মা! দোষ আমারও নয়, মলিনারও নয়। দোষ—তোমার! মা হয়ে মেয়েকে অনাদরে বিলিয়ে দিতে চেয়েচ, কেন বল ত? সমাজের কাছে, ধর্মের কাছে, বাহবা নিতে যাচ্ছ, কিন্তু, বলতে পারো, যার অনুগ্রহে বাহবাটা পাবে, তাকে একবার জিজ্ঞেস্ করেচ—তার মন জেনেচ?"

বামুন-মার সর্বাঙ্গ স্থির হইয়া আসিয়াছিল। সৌরেশের কথাগুলো ট্-খট্ করিয়া তাঁহার কানে যাইতেই তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইলেন।

সৌরেশ একটু হাসিল, হাসিয়াই বলিল, "ও-সব কালো-বুড়ো, ঠোট-ছেঁড়ার সঙ্গে মলিনার বিয়েটি হচ্ছে না! যে এখনই তোমাদের সমাজ-

'ধর্ম্মের 'মহাভারত' নোংরা করেচে—তারই সঙ্গে হওয়া চাই!" বলিয়াই চোখ ফিরাইয়া ঐ কোণের মানুষটির পানে কটাক্ষ করিল।

বামুন-মার দেহটা একবার টলিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে অসহ, অফুরন্ত পুলক তাঁহার চোখ ফুঁড়িয়া মুহুর্ম্মুহু নির্গত হইতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মলিনাকে নেবে?"

"কেন, আমি কালো-বুড়ো নই বোলে, না, আমার ঠোঁট-ছেঁড়া নয় বোলে, আমি পারিনে—আমার অধিকার নেই?" বলিয়া সৌরেশ মুখখানা ভারি করিল।

বামুন-মা অপরিসীম হর্ষে আত্মহারা হইয়া সৌরেশের হাতদুটা সাপটিয়া ধরিয়া প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি রাজা হও—"

সন্তান যেমন করিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে, তেমনি করিয়াই সৌরেশও ভক্তিনম্রকণ্ঠে বলিল, "আর, তুমি তার মা।" একটু থামিয়াই আবার বলিল, "আমার শীগ্‌গীর স্কুল খুল্‌বে, পরশুই বাড়ী যাব। গিয়ে মায়ের মত করাবো—করাবোই! তারপর অভ্রাণ মাসেই আমাদের লৌকিক বিয়ে!"

বামুন-মা প্রবল আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে আমার ভাইকে চিঠি লিখে দিই অমত ক'রে—"

"জবাব দিয়ে দাও। লিখে দাও—মলিনার রূও ময়লা নয়।"

সৌরেশ শয্যার দিকে পা বাড়াইল। মুহূর্ত্তেই আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া বলিল, "আর লিখে দাও—মলিনা রাস্তার ধূলো-কাদা নয় যে, যার-তার পায়ের নীচে প'ড়ে থাকবে!"

বলিয়া দৃঢ় পদে সে খাটের উপর উঠিয়া গেল।

বামুন-মার বুকে উৎসবের বাজনা উঠিয়াছিল, দারুণ উচ্ছ্বাসে মলিনাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আন্ ত মা, দোয়াত-কলমটা নিয়ে—

উঃ, কি চিঠিই না এখনই লিখতে যাচ্ছিলাম—আয় মলিনা—” অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মলিনাও উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার দাঁড়াইবার রুচি নাই, তত্রাপি পায়ে ভর দিতে হইবে। একটু ইতস্তত করিয়াই জ্যাড়পদে সোজা সৌরেশের বিছানার গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল ও মিনিটখানেক নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ সৌরেশের কপালে হাত দিয়া বলিল, “হাওয়াটি কিন্তু পথ্যুই হচ্ছে না, তোমার—ইস্!”

সৌরেশ মলিনার হাতটা সহসা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “না, গো, না। জ্বর আমার ছেড়েই গেছে—”

বয়স্থা মেয়ের হাতে এক জন অনাত্মীয়ের হাতের স্পর্শ লাগিলে মেয়েটির মুহূর্তেই যাহা করা উচিত, তাহা না করিয়া মলিনা অক্লেশেই বলিল, “তা বোলে মানুষের বাড়ী থেকে কেউ ত যায় না! পাঠিয়েও দেয় না মানুষ—”

সৌরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, “মানুষ অর্থাৎ বউ—”

“যাও—” যেন অতিরিক্ত রাগিয়া মলিনা হাতটা টানিয়া লইল ও মাতৃনির্দ্দিষ্ট জিনিষ দুইটি লইয়া বাহির হইবার মুখে জিজ্ঞাসা করিল, “কি খাবে, শুন্‌তে পাই কি?”

“যা খাই—ঐ লুচি!”

মলিনা ঘাড়-মুখ নাঁড়িয়া মস্ত-বড় এক কড়া অভিভাবিকার মত বলিল, “নইলে, আর অসুখটি পাকবে কি ক’রে!—আর কিচ্ছুটি না! এক কৌটা দুধ, আর এক ছিটে মিছরি—বুঝেছ ঠাকুর!” বলিয়াই খাবারের পাত্রটা উঠাইয়া লইয়া খরবেগে নীচে নামিয়া গেল।

ঃ ছয় ঃ

দুই-এক দিন পরেই সৌরেশ বাড়ী চলিয়া গেল।

শ্রাবণ মাস পড়িতেই বামুন-মা একদিন মলিনাকে বলিলেন, "পাঁজিখানা একবার নিয়ে আয় ত, মা!"

মলিনা সে-সময় দালানে কতকগুলি কাপড় গুছাইতেছিল, বিস্ময়ে মায়ের দিকে চাহিল।

বামুন-মা পুনশ্চ গলায় একটু জোর দিয়া বলিলেন, "তাকাচ্ছিস্ কি? ভালো একটা দিন দেখতে হবে ত—অঘ্রাণ ত এলো বোলে!"

বিস্ময়ের মুখোসটা মলিনার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল এবং নিতান্ত অকারণে একটু রক্ত-আভা তার সুস্থ মুখটায় পলকে উঠিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার কাযকর্ম্ম নেই, মা? একটু রামায়ণ পড়গে না?"

"মেয়ের মা'র কি দেবধর্ম্ম আছে রে? হোক্ পাঁচটা তোর, তখন বুঝবি তুই!"

"আমার বুঝেও কায নেই, মা! কিন্তু, পাঁজি ত কর্ত্তাবাবু বাইরে নিয়ে গেছেন সেদিন!" বলিয়াই মলিনা পুনরপি নিয়োজিত কর্ম্মে নিজের ঘাড়টা গুঁজিয়া ধরিল।

বামুন-মা অগত্যা হতাশের একটা অনর্থক নিশ্বাস ফেলিলেন ও কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া অদূরের একটা জানালার মাথা হইতে একখানা গোঁজা-চিঠি পাড়িয়া খুলিয়া মলিনার পানে যেন অনিচ্ছায় চাহিয়া বলিলেন, "তোর মামার বাগ দেখেছিস?" একটু থামিয়াই দৃষ্টি নত করিয়া আপনা আপনিই বলিতে লাগিলেন, "কেন রে, বাপু! রাগ

ছড়াছড়ির দরকার কি? আমি যদি সে-খানে বিয়ে না দিই—কেন, তোমার জাতের লোক বোলে? তার ঘর চলুলো না ত আমার কি?" ... করিলেন। পুনশ্চ মলিনার দিকে তাকাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমি আধকাঠা ধানে মাণিক কিনবো!"

বামুন-মার চোখের জ্যোতি যাহার পানে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই কিন্তু উচ্চারিত হইল না—শুধু ঈষৎ বিরক্তি ও লজ্জার বিচিত্র বর্ণরাগ মুখময় মাখামাখি হইয়া গেল। কাপড় ক'খানাকে গুছাইয়াই সে সরিয়া গেল।

এম্‌নি করিয়াই মাঝের দুর্ব্বহ দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এক চলন-সই মনকেই বামুন-মা এতদিন আশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার পর সেই যে এক বিপুল-ঐশ্বর্য্যের তরুণ-মালিক তাঁহারই খেলো মনটাকে বিষম আশ্বাসের দোলায় চড়াইয়া দিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি সম্মুখের দুঃসহ দিনগুলিকে যেন হাতে-পায়ে ঠেলিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমশ কার্ত্তিকের ভারী অথচ ভয়ঙ্কর পরিপাটী শেষ দিনটা কাটিয়া অগ্রহায়ণের প্রথম দিনটার প্রভাত হইতেই বামুন-মা পাঁজি খুলিয়া এক-এক করিয়া বিবাহের দিন সমস্ত কয়টাকেই বারবার আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তারপর এক-দিন দুই-দিন করিয়া যতই উক্ত শুভকর্ম্মের দিনগুলি একে-একে পার হইতে লাগিল, ততই তাঁহার বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। ক্রমে পাঁজিখানা বামুন-মার দৃষ্টির সম্মুখে এক কৃষ্ণনিশান তুলিয়া ইহাই ঘোষণা করিল যে, আর মাত্র একটি শুভদিন অবশিষ্ট আছে—উহাও ক্ষয় হইতে আর দিন সাতেক বাকি!

বামুন-মা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রাণের ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠিল। কাহাকে কি বলিবেন? কাহার সহিত কথা কহিয়া এই

অস্বাভাবিক, লোমহর্ষণ কাণ্ডের কারণ নির্ণয় করিবেন? যে অধিকার লইয়া তিনি এ বাড়ীতে রহিয়াছেন, তাহার জোরে তাঁহার কাহারও পানে মুখ তোলা চলে না। অবশেষে চোরের ন্যায় মলিনারই কাছে গিয়া ভয়ে-ভয়ে কহিলেন, "মলিনা, সৌরেশ এলো না ত! অসুখ-বিসুখ করলো না কি?"

কয়েক দিন ধরিয়া 'শুভকর্ম্মে'র আশু-আয়োজন-সম্পর্কীয় অনেকই আলোচনা নিছক বিনা কারণেই বামুন-মা কন্যার কাছে বসিয়া করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু মলিনা কোনও দিনই মুখ দিয়া কথাটি বাহির করে নাই। আজ আর থাকিতে পারিল না। তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা মা, পরের বাড়ীতে খাটতে এসেছি—কায করতে হবে ত?"

মায়ের প্রাণে আঘাত পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "না, না—তা নয়! তবে, কোনও চিঠিপত্র—"

"কি যে বল, মা!"

কথাটা বলিয়াই মায়ের মুখের দিকে মলিনার নজর পড়িল। একটু পরেই ধীর-গলায় বলিল, "তুমি হয় ত জানো না মা—বড়লোকের ছেলে, গরীব-দুঃখীকে হাতের লেখা চিঠিপত্র দেয় না, দিতে নেই—দিলে তাদের পাপ হয়!"

বামুন-মা শুষ্কমুখে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "না লো, না! সে আমার তেমনটি নয়! কিছু হয়েচে নিশ্চয়ই—সেই ত অসুখ নিয়েই গেছে!"

মলিনার মুখখানা [illegible] কঠিন হইয়া উঠিল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কখ্‌খনো না! বেশ ভালো[illegible] আছেন। কালই তাঁর একখানা চিঠি কর্ত্তাবাবুকে পড়তে দেখেছি।"

কথাটা শেষ হইবামাত্র বামুন-মা সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে, বলো ব'লে! মায়ের মত কন্নাতে হবে—ছেলেমানুষই ত! তা ছাড়া দুয়ের একটি ছেলে, সাধ-আহ্লাদ—ঐ না পাল্কীর শব্দ—"

উভয়ের চোখ ও কান বাহিরের দিকে প্রধাবিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ যখন শব্দটা কতকগুলি ক্রীড়ারত ছেলের যুক্ত-কণ্ঠস্বর বলিয়াই স্থির হইল, তখন বামুন-মাও যেমন সু-উচ্চ আশাস্তম্ভ হইতে মুখ থুব্ড়িয়া পড়িয়া গেলেন, তদ্রূপ মল্লিনাও অতিরিক্ত চটিয়া উঠিল, বলিল, "মা! এইবার এরা হাত ধরে বের ক'রে দেবে—তাও বলছি!" বলিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল।

দেখিতে-দেখিতে সাতটা দিন—বামুন-মার বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া গেল। কিন্তু, কৈ সৌরেশের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বামুন-মা এইবার একটু দমিয়া গেলেন। এ কয়দিন যে একটা অটল-আশাকে তিনি আঁকড়িয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহা বুক খালি করিয়া বিলীন হইল। তত্রাপি তিনি বিশ্বাস খোয়াইতে পারিলেন না। আবার জোর করিয়া লুপ্ত আশা, আশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষাকে মনের ভিতর টানিয়া পূরিয়া লইলেন। বয়স্থা অনূঢ়া কন্যার গায়ে পুরুষের ছায়া ঠেকিলেও তাহার ধর্ম্ম লোপ পায়, আর যে দৃশ্যটা তিনি স্বয়ং সেদিন দেখিয়াছেন, তাহা তিনি হিন্দু বিধবা হইয়া বিস্মৃত হইবেন কেমন করিয়া? তিনি ত মনে করিতে পারেন না যে, ছোঁড়াটা তাঁহাকে—মল্লিনাকে—এক কথায় হিন্দুর নারীত্বকে—সমগ্র হিন্দুত্বকেই ঠকাইয়া পরিহাস করিয়া অবাধে চলিয়া যাইতে পারে! কেমন করিয়াই বা তিনি মনে করিবেন যে, এক চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ-যুবক ব্রাহ্মণ-কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কেননা, সে তাহারই আশ্রিতা, সহায়হীনা—দুর্ব্বলা! এই যে মেয়েটি জাতিভ্রষ্টা, ধর্ম্মভ্রষ্টা, ও আশ্রয়ভ্রষ্টা হইল, ইহারই 'জাতি

‘ধর্ম্ম’ ও ‘আশ্রয়ে’র জন্য স্বতন্ত্র ‘পাত্রে’র সন্ধান করিতে হইবে—এ সমস্ত আলোচনা করিতেই বা তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কোন্ হিসাবে? না, না!—যে-আলোক কোনও মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আর্ত্ত পথিককে পথ দেখাইয়া বনের বাহির করিয়া দিবে বলিয়াই বারংবার শপথ করে উহাই কি আবার তাহাকে কৃষ্ণকায় ঘন-অটবীর ভিতর চোখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়া অট্ট-হাসিয়া পলায়ন করিতে পারে? —না, ত! পৃথিবীর চিরন্তন নীতি ইহা ত নহে! অতএব ইহাকেই অ[illegible] চরাচরের প্রবল সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে চলিবে কেন? কাযেই, যে-আশ্বাস বুক হইতে সরাইলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, তাহা ঠেলিয়া রাখা যায় না! তাই বুঝিবা বামুন-মা পারিলেন না। তাঁহার মনে পুনর্ব্বার এক নূতন গাছ উঠিল—যাহার লতামণ্ডপ [illegible] তাঁহার তপ্ত অন্তরকে ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলিল।

এ-কয়দিন বামুন-মা মুখ তুলিয়া মলিনার পানে চাহিতে পারেন নাই। নজর পড়িত বটে; কিন্তু, তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টি নামাইয়া লইতেন—প্রাণ তাঁহার শুকাইয়া যাইত! একদিন সন্ধ্যায় মলিনা রান্নাঘরে বসিয়া কুটনা কুটিতেছে, বামুন-মা ভাতের হাঁড়িতে চাল ঢালিতেছেন। তখন পৌষমাসের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া গিয়াছে। চাল কয়টি ঢালিয়া নিঃশেষ করিয়াই মলিনার পানে তাকাইলেন, একটু ইতস্তত করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, হয় ত কোনও ব্যাঘাতই ঘটেছিল—নিশ্চয়ই তাই! কিন্তু, এই মাঘ মাসটা পড়ুক না দেখি—আসবেই সৌরেশ!"

আবার সেই নাম! মলিনার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। মায়ের কথায় সে সায় দিল না।

মিনিট পাঁচেক পরে বামুন-মা আবার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন: "আচ্ছা, একটা লোক পাঠিয়ে দেবো?"

মলিনা এইবার একটা জবাব দিল। দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "বলতে হয় বা—কেন?"

বামুন-মা থতমত খাইয়া বলিলেন, "না, এই চুপিচুপি—"

মলিনা চমকিয়া উঠিল। মায়ের কণ্ঠস্বর ও তাঁহার এক হীন আত্ম-নিবেদন মেয়েটির এই ক্ষণপূর্ব্বেকার রুক্ষতাকে যেন এক চড় মারিয়া গেল। মানস-দৃষ্টিতে মেয়েটি অতি স্পষ্ট করিয়াই দেখিল যে, এক টুকরা পল্‌কা সাহস, এক অসহ্য ভীতির রক্তচক্ষু দেখিয়া জননীর মাতৃবক্ষে রোদন তুলিয়াছে, যাহার জন্য দায়ী মেয়েটি নিজেই।

অত্যল্পক্ষণ পরেই আনতমুখে অচপলকণ্ঠে সে বলিল, "দরকার হবে না মা! আমার জন্ম সতীর গর্ভে।"

কথাটা মেয়ের অন্তরের কোন্ স্থান হইতে বাহির হইয়া কি ঘোষণা করিল, তাহা বামুন-মার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—তাই বলিয়াই ত তোদের বুদ্ধিটা পর্য্যন্ত [illegible] তিনি [illegible] খুইয়াছেন, মুখে বলিলেন, "তুইও, মা, সতীলক্ষ্মী হবি!" একটু থামিয়া থাকিয়াই এক অবধা অভিমানের উৎস খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমারই ক'রে ত ঘরে তুলি, তারপর যা বলবার, তা মনেই আছে, আমার! কি বে-আক্কেলে ছেলে যা-হোক, বাছা! বেশ বাপু, ওখানে হলো না—নাই-বা হলো! তিন-পয়সার আমলা—পোষ্টকার্ড একখানা দিতে নেই?" হঠাৎ গলার স্বর নামাইয়া পরিপূর্ণ স্নেহে বলিয়া উঠিলেন, "তা সময় পায়নি হয়ত—স্কুলের ছেলে!"

এ-সমস্ত আলোচনা বুঝিবা মলিনার মনে বিদ্রোহের সূচনা করিতেছিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মনটাকে অনর্থক খোঁচাখুঁচি করছ কেন, মা? খুকুকে হাতে ধ'রে একটা রাজত্ব তুলে দিলেও তা

পারি।

খেয়ালের নাগাল মেয়েমানুষে পায় না!" একটু থামিয়াই আবার বলিল, "কিন্তু, লোকচক্ষুতে মেয়েমানুষ হাজার 'যা-কিছু' হলেও, যার তা হবার কথা, সে পরিষ্কারই থাকে—যদিও প্রমাণ দিয়ে নিজের সাফাই গাইতে তার প্রবৃত্তি কোনও দিনু হয় না!"

বামুন-মা তাড়াতাড়ি জিব্ কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বালাই! তোর যত সব অনাসৃষ্টি কথা! সর্ব্বনাশ শত্রুর হোক্!"

মলিনার মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিয়াই তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শুনেচি, মৃত্যুর পর ভগবানের কাছে যখন বিচার হয়, তখন সব কথাই খুলে বলতে হয়। বল্লে শাস্তিটা নাকি কমই হয়! 'তোমার' কাছে প্রতি কথারই কৈফিয়ৎ দেবার কথা আমার—বেহায়া বোলে কেউ মনে-মনে হুল তুললে, নিজেই ঠকে যায়! সত্যি বলছি, মা, তোমার পরম শত্রুই আমি, কিন্তু, সর্ব্বনাশের নামটিও হয়নি আমার। অনাচারে সৃষ্টি ভ'রে গেলেও, মা, সাবিত্রীর মেয়ে সাবিত্রীই!"

এমনিই সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই কর্ত্তাবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার হাতে একখানা সুদীর্ঘ পত্র ও চোখে-মুখে পুলকের ঝড়! বামুন-মার দিকে তাকাইয়া শশব্যস্তে বলিতে লাগিলেন, "এইবার বামুন-মা, তোমার রান্নার পরখ হবে! কাল বাড়ীতে অনেক কুটুম আসছে—এই চিঠি এলো। মাঘ মাসে সৌরেশের বিয়ে—মেয়েটিকে আমায় দেখাতে আনছে, খোদ মেয়ের মা, যিনি সৌরেশের শাশুড়ী হবেন। আমার ত আর বাড়ী ছেড়ে যাবার যোটি নেই! ওরাও আসছে সঙ্গে—আমার মেয়ে আর সৌরেশ।" একটু থামিয়াই আবার গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এক মাসের মাইনে পাবে বক্শিস, যদি যশ কিনতে পার!" মলিনার পানে দৃষ্টি

ফিরাইয়া বলিলেন, "আর তুমিও পাবে এক জোড়া কাপড়—পার যদি কুটুম্বের মন যুগিয়ে সুখ্যাতি নিতে!" বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঐ দুইটি হুকুমের বকশিসের পাত্রীর সম্মুখে থরথর করিয়া এক কৃষ্ণ-যবনিকা ঝুলিয়া পড়িল, যাহার ভিতর দিয়া ধরিত্রীর কোনও দৃশ্যই দেখা চলে না, যদিও সর্ব্বপ্রকার দৃশ্যেই আইন-সঙ্গত দাবী ও ধর্ম্মত অধিকার তাহাদেরও আছে, অথবা থাকিবার কথা।

ঃ সাত ঃ

সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে যে রহস্যই নিহিত থাক্ না কেন, এ কথা নির্ভয়েই বলা চলে যে, পৃথিবীটা অবিচারে পূর্ণ করিবার জন্যই মানুষের যৌবন-সৃষ্টি, এবং ইহাই সৃষ্টির সম্ভ্রম, মান! অতএব, সে-রাত্রে যৌবনের অকথ্য খাতিরে, সৌরেশ যে এক হিন্দু-পরিবারের উপর হঠাৎ অবিচার করিয়া বসিল, তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করা চলে কি?

বাড়ী ফিরিয়াই, সৌরেশের সমগ্র মনটাই একাগ্র হইয়া মলিনার দিকেই ঝুঁকিয়াছিল। বলিতে কি, এই একাগ্রতাকে সার্থক করিবার নিমিত্তই সে অচিরাৎ পড়াশুনায় পর্য্যন্তও ইস্তফা দিয়া বসিল।

আদরের কৌটায় ভিতর পুরিয়া রাখিলেও, পুত্রের এই আচরণটা মায়ের নিকট কেমন-কেমন ঠেকিল। তত্রাপি জোর করিয়া কোনও কৈফিয়ৎ চাহিতে তাঁহার ইচ্ছা বা সাহস হইল না—আদরে খোঁচা লাগিবে যে! বিস্ময়ে ইহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, চাকর-রাঁধুনীর উপর এই এতদিনের শিখানো প্রভুত্ব-নীতিও ছেলেটার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে! তাহারা অনেকেই মারাত্মক ত্রুটি করিয়া বসিলেও, সৌরেশের যেন সে-সমস্ত দিকে চোখ ফিরাইবার মত মন রহিত না—যেন তাহার মূর্ত্তি হইতে মনের অংশটা পৃথক্ হইয়া কোনও দুর্জ্ঞেয় দূর-কলরবের মুখে পড়িয়া আছে! কাযেই মাতৃপ্রাণ অতি শীঘ্রই টলিয়া উঠিল, এবং তাঁহার মনের ভিতর এই আলোচনাই চলিতে লাগিল যে, 'দাদু'র বাড়ীতে 'ষষ্ঠীর-বাছা' পুরাতন-প্রকৃতি ছাড়িয়া বাড়ী ঢুকিল—কেন?

একদিন তাঁহারে হাতে সৌরেশের লেখা একখানা খামের চিঠি পড়িল। চিঠিখানা সৌরেশ চাকরের হাত দিয়া ডাকবাক্সে ফেলিতে

দিয়াছিল। নাম ও ঠিকানা পড়িয়াই তাঁহার মনে এক দুর্দান্ত সন্দেহ উঁকি মারিয়া গেল, এবং একান্ত বেহায়া সাজিয়া উহা খুলিয়া ফেলিবার লোভ তিনি সামলাইতে পারিলেন না। দু'এক ছত্র পড়িতেই, তাঁহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল এবং তদ্দণ্ডেই পুত্রের এরূপ অদ্ভুত-পরিবর্তনের অকাট্য কারণ ও সঠিক ইতিহাস তিনি টের পাইলেন। কি লেখা ছিল, বলিবার প্রয়োজন নাই, এইটুকুই বলিয়া রাখি—চিঠিখানা মলিনার নামে!

পড়িয়াই তিনি চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। চাকরটাকে ধমক দিয়া বলিয়া দিলেন—সৌরেশ যেন টের না পায়। অতঃপর এ ক্ষেত্রে পুত্রের হিতার্থে যাহা করণীয়, তাহাই করিতে তিনি তৎপর হইলেন; যে-কর্মটার উপাদান—মালমশলা 'ভাবী-সম্রাটে'র জননীর বহু পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে, আর সে আপনিই!

কয়েক দিন বিনা উপদ্রবেই কাটিয়া গেল। একদিন বিকালে সৌরেশ বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেই মা তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ওরে, কলকাতা থেকে তোর প্রকাজল-মা এসেছেন—"

কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই, একটি প্রৌঢ়া বিধবা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শ্রী দেখিয়া বোঝা গেল, এককালে তাঁহার রূপের বেশ-একটা খ্যাতি ছিল, এবং ঐ খ্যাতিরই অনুরূপ তাঁহার বেশের তারতম্য এখনও এই সংযম-কঠিন অকারণ দেহটায় অতি-পরিষ্কারই পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাঁহার পরিধানে শোকবস্ত্র, অর্থাৎ থান-কাপড়, কিন্তু তাহা সুচিক্কণ, মসৃণ, মিহি। দেহ আবৃত করিয়া যে আবরণটি—তাহা শান্তিপুরী মূল্যবান্ রেশমী। চোখে একজোড়া চশমা—সোনার। এই সমস্ত ইত্যাদি-প্রভৃতি তাঁহার পুরাতন সৌখীন-সজ্জার এক দামী ইতিহাসের দ্যোতনা করিতেছে।

মায়ের একটা ইঙ্গিত পাইয়াই মাতৃতুল্যা ঐ নারীটিকে সৌরেশ মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। গঙ্গাজল-মা হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াই বলিলেন, "বাঃ, দিব্যি ছেলে! আমার পুষ্পর সঙ্গে বেশ মানাবে। আয় ত পুষ্প—"

সৌরেশের মা ও-ঘর হইতে একটি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া পুত্রের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন।

এই সেই? মায়ের মুখে ঐ মেয়েটির গল্প অনেকবারই সৌরেশ শুনিয়াছে। কিন্তু, চোখে দেখা এই প্রথম! দেখিল—মেয়েটি সাধারণ মানবী নহে, যেন কোনও আঁকা-ছবি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে!

গঙ্গাজল-মা সৌরেশের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে স্মিতমুখে বলিলেন, "পুষ্প আই-এ পড়ছে!"

সৌরেশের মা টিপ্পনী কাটিয়া কহিলেন, "মা কেমন!"

নিজেকে ঘিরিয়া যাহা-কিছু গৌরব—সমস্তকেই বোধ করি বা অপ্রকাশ রাখিবার মানসেই মুখ ভারি করিয়া গঙ্গাজল-মা বলিলেন, "তুই থাম্, লো, থাম্! আমরা কি আজ বি-এ পাশ করেছি যে, কিছু মনে আছে?" পরক্ষণেই পুষ্পকে মৃদু ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলি—প্রণাম কর্—"

পুষ্প হাতের একটা আঙুল তুলিয়া সৌরেশকে নমস্কার করিল ও মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন তাহার একটা ভুল ধরিয়াই বলিল, "এখন কি 'লো-কলুড' প্রণাম করবার 'কাস্টম্' আছে, মা?" অতঃপর হাত-ঘড়িটার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়া কি ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল। মাও তাঁহার 'গঙ্গাজল'কে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণেই রাঁধুনীকে এক কেৎলি জল গরম করিতে আদেশ দিলেন ও চাকরকে চা-চিনি বাহির করিতে হাঁকিয়া বলিলেন।

বিকাল-বেলাটায় অনেকেই অনেক কথা বলিয়া গেল, কিন্তু সৌরেশের মুখ দিয়া শব্দটি বাহির হইল না। এই সম্পূর্ণ অচেনা অতিথি দুটির আসিবার কথা পূর্ব্বাহ্ণে বিন্দুমাত্রও সে জানিত না, তাই অকস্মাৎ অদৃষ্ট-পূর্ব্বা অসামান্যা ঐ তরুণীর আবির্ভাব ও সর্ব্বাপেক্ষা 'গঙ্গাজল-মা'য়ের মুখের প্রথম কথাটা তাহাকে বিমূঢ় করিয়া দিয়াছিল। পরন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার মনের ভিতর এই ঠোক্কর পড়িতেছিল—'এই সেই?'

সন্ধ্যার পর সৌরেশ ঘরে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়-করানো আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং মাথার চুলগুলা একবার আঁচড়াইয়া লইয়া মাথায় খানিকটা এসেন্স ঢালিল। অ-সময়ে এ-সমস্তর প্রয়োজন কোনদিনই সে ইতঃপূর্ব্বে বুঝে নাই, আজ যেন হঠাৎ বুঝিল, এগুলির প্রয়োজন একান্তই, এবং ইহার সময়-অসময় নাই। তারপর বাহিরের দিকে একবার গোপনে তাকাইয়া পকেট হইতে এক বাক্স সিগারেট বাহির করিল ও আর-একবার এদিক্-ওদিক্ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। এই তাহার প্রথম নেশা।

দুই-একটা অনর্থক টান দিবার পরই বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি সিগারেট নিবাইয়া ফেলিল। অবিলম্বেই তাহার মা সেই জীবন্ত 'ছবি'টিকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "পুষ্প বেশ গান গাহিতে পারে। তোর 'অর্গ্যান'টা সে ত—"

সৌরেশের মুখে হাসি ফুটিল, এবং তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে সঙ্কেত করিয়া 'অর্গান'টার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

পুষ্প 'অর্গান' খুলিয়া বসিতেই বাহির হইতে আর-এক চাপা-কণ্ঠ বলিয়া উঠিল—"সেই গানটা—আমি হে তোমারি, কৃপার ভিখারী থাকিতে চাই হরি চিরদিন—" বলিতে-বলিতে পুষ্পর মা-ও ঘরে ঢুকিলেন।

গান শেষ করিয়া মুখ ফিরাইতেই পুষ্প দেখিল, শুধুই একজোড়া অতিস্থির-চক্ষু তাহার দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, সে যাহার 'অর্গান' তাহার! নারী-শ্রোত্রীর দুইটির কেহই নাই!

পুষ্প 'অর্গানে'র সুর বন্ধ করিয়া দিল ও উঠিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইল।

সৌরেশও সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল ও বিনীত-কণ্ঠে বলিল, "আর হবে না?"

"শ্রোতার অভাব—" বলিয়াই পুষ্প তাহার সমস্ত সম্মানকে অটুট রাখিয়াই সোজা বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু রাত্রিতে সৌরেশের ঘুম আসিল না। শুধু কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া জানালার দিকে মুখ রাখিয়া প্রতিক্ষণেই সে ভাবিতে লাগিল— সেই মুখ, সেই গান! আর সেই তরল-গলার কথাটি—'শ্রোতার অভাব!' কি মিষ্টি!

আর এক জন? তাহার মূর্ত্তিটাও সৌরেশের মনের ভিতর আসে নাই এমন নহে। তবে সে নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া প্রতিবারই ধাক্কা খাইয়া অবহেলায় বহুদূরে গড়াইয়া গেল! দুইটি মূর্ত্তিকে পাশাপাশি রাখিয়া সে দেখিল—একটি চমৎকার, অপরটি 'ছি-ছি!'

কিয়দ্দিন পরেই সৌরেশের বুক খালি করিয়া পুষ্প মাতৃসহ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। তবে, সৌরেশ এটুকু বড় বেশি করিয়াই জানিতে পারিল যে, তাহার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণাহুতি সম্মুখের ক'টা মাস বাদ দিয়া মাঘ মাসেই পড়িবে!

অতঃপর পৌষ মাসটা চলতি বছরের আসন ছাড়িয়া দিবার কিছু পূর্ব্বাহ্নেই সৌরেশের মা পুষ্পকে পুনশ্চ লইয়া আসিয়াছেন, এবং পিতাকে দেখাইবার জন্য দলবল লইয়া পিত্রালয়ে আসিতেছেন—

যেখানে পাচিকা ও তাহার অনূঢ়া কন্যাটি তাঁহাদের কৃপায় বুঝিবা 'বকশিস' পাইবে।

বুড়া মরিলে, শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে যেমন উৎসবের ঘটা পড়িয়া যায়, তদ্রূপ পুষ্পাকে কেন্দ্র করিয়া আর-সকলের আগমনে 'কর্তাবাবু'র বাড়ীতে সমারোহ পড়িয়া গেল। পাত্রী কন্যার পছন্দ হইয়াছে, নাতির মনের মত হইয়াছে, অতএব 'কর্তা-বাবু'রও পছন্দ হইতে বাকী রহিল না। সকলেরই যুক্ত ইচ্ছায় বিবাহের দিনটা মাঘ মাসের প্রথমেই স্থির হইল। ইহাও স্থির হইল যে, শুভ-কাযটা এই বাড়ীতেই সম্পন্ন হইবে।

এ দিকে যাহাদের জন্য বকশিস ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহারাও অতিথি কয়টির সকলেরই যথাযোগ্য মন যোগাইতে প্রাণ ঢালিয়া দিল। তাহাদের প্রতিটি কাযে, চলা-ফেরাটায় পর্যন্ত এমনই এক প্রাণের শিহরণ পড়িতে লাগিল যে, উহারা যেন এক অতি কঠিন শপথ পালন করিয়াই চলিয়াছে!

একদিন সন্ধ্যার পর সের কতক ময়দায় জল ঢালিয়াই মলিনা হঠাৎ তাহার মাকে প্রশ্ন করিল, "চলে গেলে হয় না, মা, এখান থেকে?"

মা তখন রান্নাঘরে বিপুল বল ধরিয়া এক প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ি নামাইতেছিলেন। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া খানিকটা গরম ফেন চল্‌কিয়া তাঁহার রোগা হাতটায় পড়িয়া গেল। যন্ত্রণায় হাতটাকে কাঁপাইতে-কাঁপাইতে মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোন্ চুলোয় যাবে, তাই শুনি? দু'বেলা দু'পাথর যোগাবে কোন্ যম!"

এই কয়েক দিন হইতেই মলিনা যেন মায়ের বিষ হইয়া উঠিয়াছে! ভাল-মন্দ মলিনার প্রত্যেক কথাতেই তিনি চটিয়া উঠিতেছেন। একজন অবহেলা করিয়াছে—তাই বলিয়াই? কিন্তু—সেই মা!

মলিনার বুকে যেন হাতুড়ির এক ঘা পড়িল। পরক্ষণেই বুঝিল—ব্যথার সমাদর করিতে তাহার জন্ম হয় নাই। মায়ের যন্ত্রনার অনুভূতিকেই আপাতত খুঁটিয়া বুকে রাখিয়া বলিল, "আলু ছেঁচে দোব্বো, মা? জ্বলছে খুব?"

বামুন-মা জবাব দিলেন না। আবার নূতন উদ্যমে হাড়িটা কাৎ করিয়া উল্টাইয়া দিলেন। অতঃপর মুখ ফিরাইয়া মারমুখী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ময়দাগুলো নিয়ে ব'সে রয়েচ ধাড়ি, এখ্খুনি এসে যে চুলের মুঠি ধরবে!"

জড়সড় হইয়া মলিনা ময়দার প্রকাণ্ড পাত্রটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভয়ে-ভয়ে বলিল, "এই যে মা, মাখচি ময়দা!" একটু ইতস্তত করিয়াই আবার বলিল, "সত্যিই কি কোথাও যাব বলচি—আজকাল দেখতে পায় না, কেন মা?" সহসা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

উনুনের আগুন নিবিয়া গিয়াছিল বলিয়া বামুন-মা উনুনের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফুঁ দিতেছিলেন, এবং চোখে ধোঁয়া লাগিয়া তাঁহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। চট্ করিয়া মুখ তুলিয়া শ্লেষ-কণ্ঠে বলিলেন, "মর্, মর্! ঢলানির কান্না দেখ!" পরক্ষণেই দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাপটাকে নিয়ে ম'লাম!—ময়দায় চোখের জল পড়চে, হুঁশ নেই?

মলিনা এতটুকু হইয়া গেল। মুখ গুঁজিয়া ময়দায় হাত দিতেই তাহার মুখটা হঠাৎ শুকাইয়া গেল। আড়ষ্ট হইয়া মায়ের দিকে একবার চাহিল,—চাহিয়াই মুখ নত করিল। ময়দার রাশিকে একবার অনর্থক নাড়াচাড়া করিয়াই পুনশ্চ ভয়ে-ভয়ে শুষ্ক মুখটা তুলিয়া বলিল, "মা! আর দু'টো ময়দা—"

মায়ের চোখদুটা জ্বলিয়া উঠিল। রক্তমুখী হইয়া বলিলেন, "জল বেশি ঢেলেচ বুঝি? বলি, আমার কেউ এখানে আছে নাকি তাই, তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আবার ময়দা দেব? জানো না—হিসেব ক'রে কর্ত্তাবাবুর মেয়ে ময়দা দিয়েচে। শতেকখোয়ারীর মন থাকে কোথায়? এইবার 'কানি' পরিয়ে রাখবো! একজোড়া কাপড় হ'তো—আমার মাইনে থেকে যে হবে, তা মনেও ঠাঁই দিয়ো না, খানিক, দেনাদারকে পাঠাতে হবে।" অপেক্ষাকৃত রুখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শতেকবুটি ন্যাকড়া পরেই থাক্, হাতি—"

মলিনা আর সহ্য করিতে পারিল না, পুনশ্চ হাঁটুর ভিতর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রথম উচ্ছ্বাসটা অশ্রুর ধারায় নির্গত করিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "আমি ত ব'সে ভাত খাচ্ছিনে, মা! রাতদিনই ত খাটচি—"

"খাটবে না ত, তোমাকে রাজরাণী করবে কর্ত্তাবাবুর 'নাতি'! যাও না এইবার ঘরে—" বামুন-মা বিশ্রীকণ্ঠেই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন।

এই অপরাধ! এই অপরাধে গর্ভধারিণী, জননী, স্নেহের আধার মা-ও শাস্তির দণ্ড হাতে তুলিয়াছেন! এ কাহিনীর জবাব নাই, তাই মলিনা নীরব হইয়াই রহিল।

এমনিই সময়ে 'ভাবী-রাজরাণী'র মা একখানি সুকোমল ও সুদৃশ্য রুমালে তাঁহার চশমাটি মুছিতে-মুছিতে দেব-দুর্লভ কন্যার জননীর মতই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "তোমাদের আক্কেলটা যা-হোক্, বাছা! দু'জনই এইখানে ব'সে রয়েচ—পুষ্পর কি দরকার হয়-না-হয়, গিয়ে দেখে ত আসতে হয়! সে যে ডাকের চিঠিপত্র লিখে একটু জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে পাচ্ছে না—সে সব দেখবো কি আমরা?"

খুন করিয়া ধরা পড়িলে মানুষের অবস্থাটা যেমন হয়, তেমনিই বামুন-মার অবস্থাটা দাঁড়াইল। মুখখানাকে শাকের মত করিয়া বলিলেন, "আমরা ত শুনিনি, মা—"

"শুনবে আবার কি? জান ত বাড়ীতে কেউ নেই—সুরেন গেছে পুষ্পর জন্তে ডিম আনতে, আর দুটো চাকর—তারাও গেছে পাঁঠা আনতে, পাড়া-গাঁয়ের কচি পাঁঠা পুষ্পর খেতে ইচ্ছে হয়েচে। সৌরেশ ত বাইরে সোনা ওজন দেখচে—পুষ্পর গহনার! হুঁশ করতে হয়, বাছা, পরের বাড়ী কায করতে এসেচ—হুঁশ করতে হয়!" বলিয়াই একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলিয়া পুষ্পর মা চলিয়া গেলেন। মলিনাও বোধ করি বা 'হুঁশ' করিয়াই তদণ্ডে হাত ধুইয়া জল লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। বামুন-মা অবশনেত্রে মেয়েটার দিকে একটিবার তাকাইলেন। তাহার মূর্ত্তিটা আড়ালে পড়িতেই হঠাৎ সজোরে ললাটে করাঘাত করিয়াই পরিত্যক্ত ময়দার পাত্রটা টানিয়া লইলেন।

মলিনা ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই বামুন-মা মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়িয়ে রয়েচ—কাপড় ক'খানাকে পুঁটুলি বাঁধতে হয় ত! কাল কখন্ বাঁধবে, শুনি?"

মলিনা ভয়ে ও বিস্ময়ে মায়ের প্রতি তাকাইল, বলিল, "কেন?"

বামুন-মা দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ হবে! বলি, মেয়ে বুকে ক'রে থাকবো এইখানে?" ঈষৎ কণ্ঠ নামাইয়া আবার বলিলেন, "নাই বা দেখালাম গাঁয়ে মুখ—জেলার সহরে শুনিচি 'বিধবা আশ্রম' আছে, সে জায়গা কেউ ঘোচায়নি ত!" বলিয়াই উহুনের জালটা ঠেলিয়া দিতে হাত বাড়াইলেন।

পলকে মাতৃ-অন্তরের সমস্ত রহস্তই মলিনার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। মিনিটকয়েক নিঃশব্দ থাকিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "কালই নয়, মা! পৌষ-

মাসটা যাক্। নইলে যার বিয়ে তাঁর অকল্যাণ হবে—' বলিয়াই তাড়াতাড়ি মুখ হেঁট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অভিমান করিয়া পুত্র বিষ পান করিলে, যেমন জননী একান্ত নৈরাশ্যভরে পুত্রের পানে মুখ তুলিয়া চায়, তেমনি করিয়াই বামুন-মা খোলা দুয়ার দিয়া দৃষ্টি পাঠাইয়া দিলেন, যাহা পরিণামে ঐ রজনীর পাষাণ বুকে ঠোকা খাইয়া টালয়াই পড়িয়া গেল।

এ কয়দিন বামুন-মা এ সম্বন্ধে আর কোনও কথাই উচ্চারণ করেন নাই। অবিশ্বাস-অনিশ্চিতের ভিতর দিয়া অ-দিন কয়টা যেমন করিয়াই হউক কাটিয়া গেল। বাধা-হীন মাসটা পড়িতেই বামুন-মা কর্তাবাবুর নিকট গিয়া বিদায় চাহিয়া বসিলেন, যেন কোনও নিষেধ, কোনও আপত্তিই কাহারও আর তিনি গ্রাহ্য করিবেন না। কর্তাবাবু তখন উপরে স্বীয় কক্ষে বসিয়া একটা ফর্দ তৈয়ারী করিতেছিলেন তাঁহার কন্যা ও কন্যাস্থানীয়া আর-একজন দ্রব্যাদির নাম বলিয়া দিতেছিলেন।

কথাটা সৌরেশেরও কানে তদ্দণ্ডেই আসিয়া পড়িল, সে তখন পাশের একটি ঘরে বসিয়া কতকগুলি নিমন্ত্রণ-পত্রের ঠিকানা লিখিতেছিল। কেন যে ঐ নির্বোধ রাঁধুনীটা এমন পাওনার দিনেও বিদায় চাহিতে আসিয়াছে, তাহার কারণ আর কেহ না বুঝিলেও সৌরেশের বুঝিতে বাকী রহিল না।

হঠাৎ তাহার মনে এক অতিরিক্ত পরিচিত মুখ উঁকি মারিয়া গেল। চিঠিগুলি ফেলিয়া রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়াই সে অকস্মাৎ নীচে নামিয়া গেল। যাইবার সময় দেখিতে পাইল, পুষ্প এক প্রান্তে এক জানালায় বসিয়া একখানা চিঠি হাতে করিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

সৌরেশ নীচে নামিয়াই দেখিল, মলিনা দালানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পরনে সদ্য ভাঁজ-খোলা একখানা সেলাই-করা কাপড়, হাতে একটা ছোট পুঁটলি। সৌরেশ বরাবর মলিনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং একবার উপরকার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া সম্মুখের ঐ দীন-দরিদ্র পাচিকা-কন্যাকে বলিল, "এই নোটটা নাও—"

কোটি-কোটি যুগের পর সৌরেশের এই প্রথম কথা কওয়া, এই প্রথম কাছে আসা, চোখ তুলিয়া এই প্রথম চাওয়া! মলিনাও চাহিল, কিন্তু তদ্দণ্ডেই নতমুখী হইয়া অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক, অতিরিক্ত সরল কণ্ঠেই—যেমন করিয়া চাকর-চাকরাণী মনিবের সঙ্গে কথা কহে—তেমনিই করিয়াই বলিল, "মাইনে ত আমি পাইনে। মা পায়—কর্ত্তাবাবুর কাছে আনতে গেছে।"

সৌরেশ আর একটিবার এ-দিক ও-দিক তাকাইয়াই বলিল, "মাইনে নয়। এমনিই দিচ্ছি—"

মুহূর্ত্তেই মলিনার মুখটা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কঠিন কণ্ঠে বলিল, "কেন, দাম দিতে এসেচ?"

তড়িতের স্পর্শের মত সৌরেশের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া বিবর্ণ, রক্তহীন হইয়া গেল। একটু ইতস্তত করিয়াই মূঢ়, নির্ব্বোধ, ভ্রান্তের ন্যায় অস্ফুট গলায় বলিল, "না, না—" বলিয়াই তিল-তিল করিয়া হাত বাড়াইয়া নোটখানা গুঁজিয়া দিবার জন্য আতঙ্কে মলিনার একটা হাত স্পর্শ করিল, যেন কি করিতেছে সে জানে না, অথচ তাহা করিতেই হইবে!

এমনিই সময়ে কাহার পদশব্দে সৌরেশ চমকিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া দেখিল যে, একজোড়া শার্দ্দূল-চক্ষু তাহাদের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—সে পুষ্পর!

চোখোচোখি হইবামাত্র পুষ্প চোখ ফিরাইয়া সগর্ব্বে কাছের একটা দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল, যেন সে রাস্তার ইতর লোকের সম্মুখে এক তুলনাহীন, উপমাহীন, পরিমাণ-বিহীন—অসাধারণ সম্ভ্রম ছড়াইয়া যাইতেছে, যে-সম্ভ্রমের এক অলৌকিক নিশান তাঁহার 'শিক্ষা'র উপর অহর্নিশ খাড়া হইয়াই রহিয়াছে!

সৌরেশের সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল, হাত হইতে নোটখানা খসিয়া পড়িল। যে-প্রবাদ, যে-উপকথা এতদিন চাপাই ছিল, তাহা সে স্পষ্ট করিয়াই বুঝিল, একদণ্ডেই সমস্ত চরাচরে প্রচার হইয়া গিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাথায় এক পাহাড় তুলিয়া সৌরেশ উপরে উঠিয়া গেল। তখন মলিনা চলিয়া গিয়াছে।

ঃ আট ঃ

অনর্থ ঘটিবে বলিয়াই সৌরেশ আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু সমস্তটা দিন যখন নির্ব্বিবাদেই কাটিয়া গেল, তখন সে যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, তেম্‌নি বিস্মিতও হইল।

সন্ধ্যার পর আবার সৌরেশ সকালের পরিত্যক্ত পত্রগুলা লইয়া বসিল। দুই-চারিখানার ঠিকানা লেখার পর পুষ্প কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ঐ ক'খানা চিঠির ঠিকানা—তাও সারাদিনে লিখে উঠতে পার্‌লেন না ?"

পুষ্প কাছে আসিতেই সৌরেশের বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, সম্পূর্ণ এই ভিন্ন প্রসঙ্গটা পড়িতেই সে বুকে অপরিমিত বল পাইল এবং ইহাই বুঝিল, সকালের সেই ঘটনা পুষ্প বুঝিতে পারে নাই, নতুবা একেবারেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "অনেক যে !"

পুষ্পও সে হাসিতে যোগ দিল, কিন্তু তাচ্ছীল্যভাবেই জবাব দিল, "এ যদি আপনার 'অনেক' হয়, তা হ'লে 'ইউনিভারসিটি'র 'কোশ্চেন-পেপার' দেখলে কি করতেন, তা ত জানিনে !"

সৌরেশ একটু লজ্জায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

পুষ্প তত্রাপি তাহাকে রেহাই দিল না, একখানা লেখা খাম তুলিয়া লইয়া বলিল, "হাতের লেখাটাও বড্ডো কাঁচা আপনার ! এ লেখা লোকের সাম্‌নে বার করেন কি ক'রে—আমি হ'লে পারতুম না ! বই দেখে-দেখে বাড়ীতে খুব লিখতে পারেন না ?"

সৌরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এইবার একখানা খাতা করবো।"

পুষ্প আর একটা ঘা দিল। বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "ইংরিজিতেও চিঠিপত্র লিখতে, যা বুঝছি, আপনি পণ্ডিত!" পরক্ষণেই আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "আর আমার বন্ধুরা চিঠি লেখে—কি স্টাইল!" বলিয়া আর দাঁড়াইল না।

সম্মোহিত হইলে মানুষে পাদুকা মুখে করিয়া আনে, কেন না, সে বাজীকরের আজ্ঞাবহ দাস। তেমনিই ওই 'আঁকাছবি'র রূপ-মহিমায় সৌরেশ মূঢ় হইয়া গিয়াছিল, কাযেই মেয়েটির কথাবার্তায় যে শ্লেষ, যে বিদ্রূপ, 'শিক্ষা'র যে অহমিকা বারবার করিয়া বিষের ন্যায় ঝরিয়া পড়িল, তাহার জ্বালা অনুভব করিবার শক্তি সৌরেশের অসাড় অন্তরে তিলমাত্রও ছিল না। উপরন্তু, সে এক তৃপ্তিকেই বড় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল যে, তাহার নর-জীবটা সার্থক, ধন্য, বড় হইতেই চলিয়াছে! এবং বিবাহের কারাবাস হইতে বিদেশী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া এই সুশিক্ষিতা প্রেয়সীকে প্রেমলিপি উপহার দিবে—এই অত্যুগ্র আগ্রহে চিঠি লেখার 'স্টাইল'টা সুষ্ঠু করিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

আরও কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে। বিবাহের দিনটা ঘনাইয়া আসিল। একদিন বিকালে বাহিরে খোলা জায়গাটায় একখানা বৃহৎ চাঁদোয়া খাটানো হইতেছে, ও কেমন করিয়া কি ভাবে খাটাইলে মানানসই হয় সৌরেশ পরিদর্শন করিতেছে, এমনি সময় ডাক-পিয়ন তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিয়া গেল। খামখানা পুষ্পর লেখা—কেমৎ আসিয়াছে। সৌরেশ একটু বিস্মিত হইল, উপরন্তু চিঠির 'স্টাইল' শিখিবার বাসনাও তাহার মনের ভিতর অষ্টপ্রহর ঘুরিতেছিল, অতএব চিঠিখানা খুলিয়া দেখিবার এক অযথা লোভ তাহার মনের ভিতর তৎক্ষণাৎ প্রবল হইয়া উঠিল। একটু দূরে সরিয়া গিয়া

খামের মুখটা নখ দিয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং চাঁচখানার ভাব মুখের সম্মুখে ধরিতেই সে চমকিয়া উঠিল! এ কী! এই কি 'স্টাইল'? 'স্টাইলে'র মর্ম্ম না বুঝিলেও ইংরাজী দুই চারিটি কথার অর্থও অন্ততঃ তাহার কাছে দুর্বোধ্য নয়! কিন্তু, এ কি অর্থ-ভরা ভাষা!

তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, যেন এইমাত্র কোনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব-জুয়ারের মাথায় শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিয়ৎক্ষণ চিঠিখানা মুঠির ভিতর চাপিয়া রাখিয়া সে পকেটে পুরিল, অতঃপর যে দিকটায় বিদ্বান্ নাই, বড়লোক নাই, কোলাহল নাই—যে দিকটায় মূর্খ-অসভ্য, দীন-দরিদ্র ভাঙা-বাড়ীতে কান্নার মত বাস করে, গ্রামের সেই দিকেই সে একপা-একপা করিয়া অগ্রসর হইল, যেন পল্লীর ওই হতশ্রী অংশটায় এক ছবি তুলিয়া সে ঘর সাজাইবে!

পল্লীটি শেষ হইয়া যেখানে মাঠের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানে একটা গাছের তলায় সৌরেশ বসিল। সম্মুখে দূর-বিস্তৃত, দৃষ্টিহীন, কিনারাহীন প্রান্তর। বসিয়া এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে সে ভাবিল—'লোক-লোকালয়কে ঠকাইবার, ধ্বংস করিবার জন্যই কি পৃথিবীতে নারীর সৃষ্টি?' তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে যেন এক নারীকণ্ঠ হাসিয়া জবাব দিল—'না, না! নারী প্রেম দিয়া পুরুষকে ঠাকুর করে, আদর দিয়া সাজায়!' আবার ভাবিল—'পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর সামগ্রী—নারী। তাই বলিয়াই কি পুরুষকে বিদ্রূপ করিবার তার অধিকার আছে?' মুহূর্ত্তে ঐ-স্বরটা কাঁদিয়া বলিল —'ভুল কথা! নারী বুকের মাংস তুলিয়া পুরুষের নৈবেদ্য সাজায়, অশ্রু দিয়া মন্ত্র পড়ে।' সৌরেশ শিহরিয়া উঠিল। পুনশ্চ ভাবিল—'তবে কি পুরুষেরই সৃষ্টি নারীর পদমূলে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া?' সহসা একটি অতি কঠিন মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল—'মিথ্যা কথা! বিসর্জ্জনের দিনে নারী আপনিই জলে ঝাঁপ দেয়!'

সৌরেশের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকটায় একবার সভয়ে তাকাইল, দেখিল—অনন্ত-প্রসারী প্রান্তরের ওই ক্ষীণ-কিনারায় সেই আড়ষ্ট-মুখটি উধাও হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে! অনুমানে নহে—স্পষ্টই সৌরেশ বুঝিল, সে মুখ—মলিনার! সৌরেশ তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইল, নামাইবার সময় দেখিল—অন্ধকারের পাতলা ছায়া যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বন্ধুর মত, সখার মত পুলকে সরিয়া আসিতেছে, যেন একজন দুরন্ত গোপশিশু বৈষ্ণবপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের এখনই গলা জড়াইয়া ধরিবে।

কতক্ষণ বেহুঁশ হইয়া বসিয়া ছিল তাহা সৌরেশ টের পায় নাই, অকস্মাৎ কাহার কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙিল। দেখিল—'দাদু' লণ্ঠন হাতে করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন সঙ্গে [illegible]। সৌরেশ সন্ধ্যার পর কোথাও থাকিত না, আজ এই অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখিয়া বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। লোকজন ত চারিদিকে অনুসন্ধানে ছুটিয়াছেই, দাদুও তিষ্ঠিতে না পারিয়া নিজেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

সৌরেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দাদু, তুমি এসেচ—কেন?"

স্নেহের পুত্তলের দর্শন পাইয়া 'দাদু'র তখন চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেন, তা তুই কি ক'রে জানবি—বাড়ী চল্!"

সৌরেশের চক্ষু ভেদ করিয়া জল বাহির হইল—জীবনে এই তাহার প্রথম রোদন! কোনও কথা সে কহিল না, নিঃশব্দে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। যাইবার পথে তাহার মনে হইল, পায়ে যেন কিসের টান পড়িতেছে—'দাদু'কে যে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার জবাব যদি ইহাই হয়?

দুল

ফিরিবামাত্র অনেকেই অনেক কৈফিয়ৎ চাহিল। সৌরেশ সকলেরই মনস্তুষ্টি করিল, কিন্তু ফাঁকা কথায়।

রাত্রিকালে আহারাদির পর যথারীতি একজোড়া 'গঙ্গাজল', পুষ্প ও অন্যরা উপরকার দালানে বসিয়া জটলা করিতেছে। কেবলমাত্র সৌরেশই নিজের খাটিতে বসিয়া। পুত্রকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর—কি বলব, গঙ্গাজল-মা, না, শাশুড়ী—যাই হোক—" পুষ্পর মায়ের প্রতি আঙুল বাড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন, "উনি একটা ঘড়ি দেবেন—কি ঘড়ি নিবি?"

প্রশ্নটা যাহাকে করা হইল, তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইবার আগেই, পুষ্পর মা কথাটা যেন একটু বিশ্লেষণ করিয়াই বলিলেন, "তোমার ত কিছুরই অভাব নেই, বাবা! তবে, এটা 'কাস্টম'—কি ঘড়ি চাই, বল!"

এ দিকে পুষ্পও যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল, চট্ করিয়া বাঁ হাতটা উল্টাইয়া স্বীয় হাত-ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার এই ঘড়িটি আমি নিজে গিয়ে দোকানে 'চয়েস্' করেছিলুম—'একসেলেণ্ট' 'টাইম' দেয়!"

'দাদু' একটু দূরে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। অন্য দিন হইলে, বোধ করি বা, সৌরেশও রহস্য করিয়া 'দাদু'কে বলিয়া উঠিত—"তুমিও বলো না দাদু, তোমার হুঁকো-কল্‌কে কেমন তামাক পোড়ায়?" কিন্তু, সে চুপ করিয়াই রহিল।

সৌরেশের মা আবার কহিলেন, "আজকে ঠিক বলতে পারবি নে, হ্যাঁ রে?"

"পারবো মা!" ঈষৎ দৃপ্ত গলায় কথা দুইটা উচ্চারণ করিয়াই সৌরেশ থামিল। পরক্ষণেই আবার গলা সহজ করিয়া বলিল, "বলতে

এই-ই পারবো [illegible], ও-সবে আমার দরকার নেই, হবেও না দরকার!” হঠাৎ তার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

পুষ্পর মা একটু চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “[illegible]!”

একটু হাসিয়া সৌরেশ অবিলম্বেই জবাব দিল, “ইংরিজি [illegible] জানে না, দাদুও জানে না। আপনার কথা শুধু আমি বুঝলে [illegible] হবে না, গঙ্গাজল-মা!”

এক মুহূর্তও অপব্যয় হইল না। পুষ্প তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ইম্‌পারটিনেণ্ট টক্!”

সৌরেশ একটিবার ঐ বিদুষী মেয়েটির দিকে তাকাইল, তাকাইয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল।

ইহাদের ভিতর যে একটু রাগারাগি চলিতেছে, তাহা সৌরেশের মা-ও বুঝিলেন, দাদুও বুঝিলেন। দাদু আস্তে-আস্তে হুঁকাটা মুখ হইতে নামাইয়া হতভম্ব হইয়া ইংরাজী-জানা ঐ তিনটি নর-নারীর পানে এক-একবার চাহিয়া ব্যাপারটার অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন। সৌরেশের মা আর অতখানিও সময় নষ্ট করিলেন না, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুত্রকেই বলিয়া উঠিলেন, “কি বলছিস তুই, হ্যাঁ রে, সৌরেশ?”

সৌরেশ চুপ করিয়া রহিল, মিনিটখানেক পরে নিতান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলিল, “এমন কিছুই না! মায়ের সুমুখে সন্তানের যা বলা উচিত, তাই বলছি, মা!” কণ্ঠস্বর হঠাৎ দৃঢ় করিয়া বলিল, “বিয়ের কথাটা ভুলে যেতে পারো না? আমি বিয়ে ত করবো না, মা!”

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল, যেন লোকালয়ে বাজ পড়িয়াছে! বিস্ময়ে, সংশয়ে ও উদ্বেগে সৌরেশের মা পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, “আজ বাদে কাল বিয়ে—বলছিস কি তুই?”

[illegible]

সৌরেশ তেমনি করিয়াই বলিল, "কাল ছেড়ে এই মুহূর্তেই যদি হতো, তা হ'লেও নয়!" ঈষৎ হাসিয়া আবার সুরু করিল, "মা, চিরটা কাল আমার মনকে আদর দিয়ে আদুরে ক'রে তুলেছ—এ মন আমিও ফেরাতে পারবো না, তুমিও পারবে না!" কণ্ঠস্বর পুনশ্চ কঠিন হইয়া উঠিল।

সৌরেশের মায়ের মুখচোখ শুকাইয়া গেল! বলিলেন, "ক্ষেপলি না কি? মেয়ে সুদ্ধ এতদিন এনে, বাড়ীতে রেখে—কেলেঙ্কারি করিস নে, সৌরেশ!"

অবিচলিতকণ্ঠে সৌরেশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "এর চেয়েও বড় কেলেঙ্কারি, মা, চাপা থাকে, চাপাও আছে! ওঁদের ব'লে দাও—বিয়ে আমি করবো না।"

অসহ্য অপমানে, লাঞ্ছনায়, 'গঙ্গাজল-মা'র সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। ক্ষিপ্তার ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন, "আমিও অমন গোরুর হাতে মেয়ে দিতে চাই নে!"

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল। 'দাদু' হুঁকাটা কোনরূপে একধারে এক জায়গায় ঠেসাইয়া রাখিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া কন্যা-স্থানীয়া ঐ শক্ত-অবলাটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন—যেন তিনি নিজেই অপরাধ করিয়া মাপ চাহিবার চেষ্টা করিতেছেন!

সৌরেশের মায়েরও অন্তস্তল যেন তোলপাড় করিতেছিল, তাড়াতাড়ি 'গঙ্গাজল-মা'র হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন,—"রাগ কোরো না, ভাই! তুমি আমাকে মাপ করো—"

কিন্তু, অনলে ধূনার ছিটাই পড়িল! দ্বিগুণ রোষে হাত ছাড়াইয়া লইয়া 'গঙ্গাজল-মা' বলিয়া উঠিলেন, "বাঁদরে মুক্তোর অর্থ কি বুঝবে? কত ব্যারিস্টার আমার মেয়েকে—"

পুষ্প বাধা দিল। অস্ফুট অথচ কঠিন কণ্ঠে বলিল, “চুপ করো, যা, রুচির হিসেব ও-সব লোকের থাকতেই পারে না!” একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, “আমি স্বচক্ষে দেখেছি—সেই বাঁধুনীর মেয়েটার সঙ্গে ওঁর যে একটা কুলটা—”

সৌরেশ শিহরিয়া উঠিল, ও সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মুখ-চোখ—আগাগোড়া দেহটাই—কঠিন হইয়া গেল। অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, “মুখ একটু খাটো করো, পুষ্প! সে কী তবে শুনবে? সাবিত্রী—যে সত্যবানকে বাঁচিয়ে এনেচে!” বলিয়াই উঠিয়া গিয়া জামার পকেট হইতে সেই অভিশপ্ত চিঠিখানা বাহির করিয়া আনিয়া আবার টোকা দিয়া কহিল, “এইবার ইংরিজি কথা কাষে লাগবে, কেন না, ইংরিজি মা-ও বোঝে না, দাদুও বোঝে না! বলতে পার পুষ্প—” চিঠিখানা পুষ্পর সম্মুখে ধরিয়া এক-একটি করিয়া বলিতে লাগিল, “বলতে পারো, বোঝাতে পারো—অন্য পুরুষকে কোন্ মেয়ে এমন সম্বোধন করতে পারে? তোমার হাতে-লেখা চিঠি পুষ্প—ফেরৎ এসেচে! হয় মালিক বাড়ী নেই, নয় সে গ্রহণ করে নি—চিঠির ওপর তোমার নাম জানিয়ে ঠিকানা দিয়েছিলে কি না? চেয়ে দেখ, বুঝে দেখ,—জড়ানো অক্ষরে নয়, স্পষ্টাক্ষরে লেখা—‘মাই লভ্’!”

পুষ্পর মুখখানা সিঁদুর মত হইয়া গিয়াছিল। সৌরেশের কথাটা শেষ হইবামাত্র একটা অলস-ভীত ব্যর্থ রোখ্‌কে আশ্রয় করিয়া সে বলিল, “যার বিদ্যের দৌড় ফার্স্ট ক্লাস পর্য্যন্ত, সে ও-সব বুঝতে পারে না। —‘এটিকেট্’!”

সৌরেশ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, অবজ্ঞায় বলিয়া উঠিল, “সাবাস্! ঐ যদি—থাক্! মনান্তরের পরমায়ু আর বাড়াতে চাই নে! আজ

তোমার সঙ্গে এত ঝগড়া, কাল থেকে তোমার আমার মাঝখানে, হয় ত, অদর্শনের হ্রদ সৃষ্টি হ'তে পারে—"

"মুখ দেখতে চায় কে আপনার? রাত্রির এই ক'ঘণ্টা—আমি রাঁধুনীর মেয়ে নই!" দৃপ্তকণ্ঠে কথাটা বলিয়াই পুষ্প উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সৌরেশও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাধা দিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "তা ত নও-ই! তফাৎ—আকাশ-পাতাল! সে সাবিত্রী!"

সৌরেশ আর দাঁড়াইল না।

: নয় :

তাহাই হইল। পরদিন পুষ্পর মা ও পুষ্প কলিকাতায় চলিয়া গেল। পূজার বাড়ীতে প্রতিমা ভঙ্গের মত সৌরেশের আশীর্ব্বাদ পরিণয়ের উৎসবটা অকস্মাৎ রহিত হইয়া গেল; কোথা হইতে, কেনই বা যে এই দুর্দ্দৈব ঘটিল, তাহা বাহিরের লোক টের পাইল না, নিরানন্দের ভাঙা ছবিটার কুচিগুলা লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া তাহারা নিরস্ত হইল।

পুত্রের এই আদুরে দেহটির ভিতর যে এক কঃসেবের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা সৌরেশের মা কোনও দিন কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। তিনি অবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে, সৌরেশকে কহিলেন, "তা' বামুন-দি'র মেয়েটিকেই না-হয় আনতে পাঠাই—কি বলিস তুই ?"

মাতৃপ্রাণে ব্যথার আঁচড় পড়িয়াছে, সৌরেশ তাহা বেশই বুঝিল। তত্রাপি খাম-খেয়ালী গোঁ তাহার মন হইতে বিদূরিত হইল না। স্বচ্ছন্দেই প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কেন মা ?"

মা ভয়ে-ভয়ে একটু হাসিয়া কহিলেন, "হাতে সূতোই যেন বাঁধা হয়নি; কিন্তু মা হয়ে আমি কি থাকতে পারি রে—অকল্যাণ হয় যে, বাবা!"

সৌরেশ চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুয়েক পরে ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "মা! আমার কল্পতরু তুমি—তোমার কাছ থেকে এই 'অকল্যাণটা' আমি চেয়েই নিচ্ছি!"

মা শিহরিয়া জিব কাটিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ষাট্, ষাট্!" একটু পরেই আবার আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "সত্যি বাছা! মা

[illegible]

[illegible] বাঙাল মেয়ে পুণ্য—সেয়া ব'বে [illegible] [illegible] [illegible]! [illegible] করিয়া পুত্রের পানে দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "বামুন-ঝি'র মেয়েটি তু[illegible] [illegible]—কর না বিয়ে?"

মায়ের সম্মান পৃথিবীতে বড় করিতে গিয়া [illegible] একই [illegible] পাণি-গ্রহণ করিয়াছিল। আর এই সৃষ্টিছাড়া ছেলেটার কাছে মায়ের এমন কাতর নিবেদনও তুচ্ছ হইয়া গেল! সংযত-কঠিন কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তা হয় না, মা! তা হ'লে পৃথিবীতে অবিচার থাকে না! প্রবঞ্চনার নামে কলঙ্ক পড়ে—শয়তানের রাজ্যে রামের জন্ম হয়!"

"তুমি ত আমার রামই, ভাই!" কথাটা বলিতে-বলিতে 'দাদু' তাঁহার খেলো-হুঁকাটি হাতে করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হুঁকায় একটা লঘু টান মারিয়াই বলিলেন, "রাজত্বটা শয়তানেরই হয়েছিল বটে রে, কিন্তু, রামের চোখ পড়তেই—কি জানিস্ ভাই—ধর্মের হয়ে গেছে!"

যদিও 'দাদু' সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়াই আসিয়াছেন, তত্রাপি [illegible] সমস্ত আলোচনার ভিতর তিনি আসিয়া পড়েন, তাহা সৌরেশের ইচ্ছা ছিল না। প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার মানসে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি আগে কলকে সামলাও, দাদু! এক ফোঁটা নল্‌চে—মাথায় একটা ধুঁচি!"

দাদুও একগাল হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "আর খোলটাকে অগ্রাহ্য করলি?"

"তা কি পারি! দেখছি কোন্‌টা বড়—তোমার ভুঁড়ি, না, হুঁকোর খোল!" বলিয়াই সৌরেশ এক ঝলক হাসিল, মনে হইল, যে হাসি পুড়িয়া গেল উহা আর মুখে উঠিবে না!

[illegible] সৌরেনের কথায় বাধা দিয়া 'দাদু' [illegible] এমনভাব, যেন
একটা কথা হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়াছে, এমনিই ভাব দেখাইয়া
বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, একটি চাঁড়ালের মেয়ের কথা শুনবি, দাদু—"
একটা 'সুর' টানিয়া লইয়া বলিয়া সুরু করিলেন, "কোথায় সে থাকতো,
জানিস্ ? খুব নির্জ্জন এক অরণ্যে। দেহটা লুকিয়ে রাখতো, পাছে
কারুর সামনে পড়ে—চাঁড়ালের মেয়ে কিনা! সেই বনে বাছাই-করা
কতকগুলি ঋষি থাকতেন, তাঁরা রোজ ভোরে সামগান করতে-করতে
সরযূ নদীতে স্নান করতে যেতেন। ঋষির গলা আর 'বেদে'র গান
মেয়েটিকে এমনিই মাতিয়ে তুল্‌লো যে, সে রোজ আগেভাগে উঠে
ঋষিদের যাবার রাস্তাটা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলো—কেন জানিস ?
ঋণ শোধ করবার জন্যে—ঠাকুরের নাম শুনিয়ে ঋষিরা তাকে মাতিয়ে
তুলেছে কিনা! কিন্তু, দেখাটি সে দিত না—অ-পবিত্র যে! একদিন
আর সে নিজেকে লুকোতে পারলে না—ঋষির গানে অবশ হয়ে পড়লো!
কিন্তু শাপ না দিয়ে ঋষিরা তাকে কি বললেন জানিস—'তোর কাছে রাম
আসবেন, বুকে তোর রামের আসন পড়েচে'!"—'দাদু'র চোখদু'টি সজল
হইয়া উঠিল। চোখ মুছিয়াই গলায় জোর দিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন,
"তারপর মেয়েটা সত্যি-সত্যি ক্ষেপে গেল—যে ফলটি, যে খাবারটি তার
মুখে ভাল লাগে, অমনি সেটি মুখ থেকে নামিয়ে রাখে—রাম আসবেন,
রামকে দেবে! কিন্তু ফল-খাবার যে এঁটো হলো, তা তার হুঁশ নেই!—
হ্যাঁরে, মলিনার কি হুঁশ ছিল যে, সে রাঁধুনীর মেয়ে!"

সৌরেশ শিহরিয়া 'দাদু'র দিকে একটিবার তাকাইয়া মুখ নামাইয়া
লইল।

'দাদু' পুনশ্চ সুরু করিলেন, "কিন্তু, রাম আর আসে না! মেয়েটি
ছট্‌ফটিয়ে উঠলো। ক্রমে হতাশ হয়ে দেহত্যাগ করবার জন্যে আগুনের

দান

কুণ্ড সাজালো—রাম ত এলো না! তারপর আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় সামনে এসে কে দাঁড়ালো জানিস—রাম!" কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, গলা ঝাড়িয়া সুরু করিলেন, "কিন্তু, মেয়েটার মুখে কথাও সরে না, চোখে পলকও পড়ে না—কেমন যেন হয়ে পড়লো! তখন রাম কি করলো, বল দিকিনি—" উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "স্পর্শ করলো! যাকে ছুঁলে নাইতে হয়—রাম তার হাত ধরলো!—হ্যাঁ রে, মল্লিনাকে ছুঁয়েছিলি তুই, পুষ্প বললে?"

সৌরেশের ঘাড়টা যেন মাটির সঙ্গে লুটাইয়া পড়িল।

'দাদু'র মুখ চলিয়াছিল। প্রগাঢ় ভক্তিতে বলিয়া উঠিলেন, "তখন মেয়েটির জ্ঞান হলো! দেখলে, তার সর্ব্বস্ব এসেছে! কেঁদে ফেললে। আর কি করলে শুনবি—তাড়াতাড়ি আনন্দে আগুনে ঝাঁপ দিলে! রাম চ'লে যাবে, আবার তার বুক খালি হবে—দেহটাকে আর জিইয়ে রাখতে পারে কি সে!"

সৌরেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সেদিন সেই জনহীন প্রান্তরে তাহারই প্রশ্নের জবাবে এই কথাই ত কোথাকার এক নারীকণ্ঠ বলিয়াছিল—নির্জ্জনের দিনে নারীই আগে ঝাঁপ দেয়!

'দাদু'র কাহিনীর সমাপ্তি তখনও হয় নাই। শশব্যস্ত হইয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, "রামের বুকেও কি বাজে নি? নিশ্চয়ই বেজেছিল, নইলে—" হুঁকাটা নামাইয়া কলিকার ছাইগুলার উপর একটা চড় মারিয়া কহিলেন, "নইলে, মল্লিনাকে তুই কি সাবিত্রী বলতে পারিস? সত্যিই রে, গায়ের রঙে চোখেরই সুখ হয়, কিন্তু মনের সুখ হয় মনের রঙে! রূপে মানুষকে লম্পট করে, প্রেমে মানুষকে সন্ন্যাসী সাজায়! লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতন, রূপ-আর-প্রেমের বনিবনতা খুব কম মেয়েরই থেকে মনে

থাকে। তাই যে মেয়ে যত কালো, সে মেয়ে প্রেমে তত বড়। কেন জানিস্—একজন চর্চা করে প্রাণ দেবার, আর একজন চর্চা করে প্রাণ নেবার। কিন্তু, পাওনাটা থেকে যায় দান আগে করলেই। নইলে, মলিনার কাছে পুষ্প আর দাঁড়াতে পারে না।"

সৌরেশের মা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রবল আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "মলিনাকেই ত বিয়ে করতে বলছি, বাবা।"

কলিকার আগুনটা নিবিয়া গিয়াছিল, হুঁকায় দু'একটা অনর্থক টান মারিয়াই 'দাদু' বলিলেন, "পুরুষ হয়ে তুই ত আসিস্‌নি, মা! বুঝতে পারবিনে।—এখন অন্তত ও তা পারবে না! অতিরিক্ত ভালবাসলে মেয়েমানুষ এত উঁচুতে উঠে যায় যে, পুরুষে তার নাগাল পায় না। নিশ্চয়ই মলিনা খুবই ভালবেসেছিল, নইলে তুই মা, তোর সামনে কি ও নির্ভয়ে বলতে পারে—মলিনা ওর সাবিত্রী?" একটা ঢোঁক গিলিয়াই আবার বলিলেন, "এখন ও ভুল করুক, সাধক হোক—তারপর কাউকে কিছু বলতে হবে না!"

সৌরেশের মায়ের চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমার একটি ছেলে—বউ নিয়ে ঘর করতে পাবো না, বাবা?"

'দাদু'ও চোখ দুটি মুছিয়া কহিলেন, "আর, আমারও কি দু'টি, হ্যাঁ ক্ষেপি?" সৌরেশের পানে চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমায় আশীর্বাদ করি ভাই—মলিনার কাছে যেন তুমি পৌঁছতে পার! প্রেমে মানুষকে বড় করে—প্রেম দিয়ে মেয়েমানুষকেও পূজো করলে সেই পূজোটা ভগবানেরই পাদপদ্মে পড়ে! মেয়েমানুষ শুধু টেলিগ্রাফের 'তার'—তার শরীরে অসীম বিদ্যুৎ! কিন্তু, সে মলিনার মত ময়লা-রঙ মেয়েরই,

পুষ্পের মত রঙ, রূপসীর দেহে নয়।” বলিয়াই সৌরেশের মাথায় হাত ঠেকাইয়া উঠিয়া গেলেন। বাকী দুইজনও যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দুইটি স্বতন্ত্র দিকে এক-এক পা করিয়া সরিয়া গিয়া স্থানটিকে খালি করিয়া দিল।

* * * * *

চামড়া-ছেঁড়া হরিনামের ‘খোলে’র মত ‘দাদু’র বাড়ীটাকে ফেলিয়া রাখিয়া কয়েক দিন পরেই মায়ের সঙ্গে সৌরেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এখানেও দিন কয়েক কানাকানি চলিল, তারপর গুজব কথার মত সারা-ব্যাপারটাই একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

কিন্তু হাল্কির সংসারে বিষাদ ঢুকিলে, উহার ভাঙন ধরে, নতুবা অযোধ্যাকাণ্ডের অমন পরিষ্কার সমাপ্তি হইত না। মাস কয়েক পরেই আর এক দুর্দ্দৈব ঘটিল। একদিন বিশূচিকায় হঠাৎ সৌরেশের মা সংসারের মায়া কাটাইয়া বসিলেন! সৌরেশ পিতার মর্ম্ম বুঝে নাই, এক কাণাকড়িতেই সে দুনিয়া জিতিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাও তাহার লোকসান হইয়া গেল! এইবার পৃথিবীর প্রতিটি ‘সত্য’ তাহার চোখে ফুটিল, চোখে পড়িল—অ-বেলায় তাহার হাট ভাঙিয়াছে! বেচিবার সবই রহিয়াছে, কিন্তু কিনিবার কেহই ত নাই! তাই বুঝিবা ঝুড়িভরা সামগ্রী লইয়া তাহাকে বসিয়াই থাকিতে হইবে—যেন দূর-দূরান্তরে কখন কাহার পায়ের আঘাতে ধূলি উড়িয়া চোখে লাগিবে, তাহারই আশ্বাসে ভাঙা-বেলায় অপলক-নয়ন তাহাকে তুলিয়া রাখিতে হইবেই হইবে!

এ দিকে ‘দাদু’ও ভাঙিয়া পড়িলেন। যে অসীম উৎসাহ, অদম্য বল লইয়া এই লোকটি এতদিন লড়াই করিয়া আসিতেছিলেন—সমস্তই এই একটা আঘাতে ধ্বসিয়া গেল! মায়ের মৃত্যুর পরই সৌরেশ পিত্রালয়ে চাবি দিয়া ‘দাদু’র কাছেই আসিয়াছিল, কিন্তু যে-শোক, যে-আর্ত্তনাদ নিছক স্বতন্ত্র—পৃথক-করা স্থানটা হইতে উঠিয়া বৃদ্ধকে পলে পলে পলকা

মনিব-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যখন বামুন-মা মলিনাকে সঙ্গে করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িলেন, তখন বেশ-একটু বেলা হইয়া উঠিয়াছে। শীতের বেলায় রৌদ্রের তাত তত্টা না থাকিলেও, দূর-বিস্তৃত প্রান্তরের রুক্ষ চেহারাটা চোখে পড়িতেই বামুন-মার মনে কি হইল, বলা যায় না, কিন্তু, মলিনা যেন—একটু অবশ গলায় বলিল, "মাঠটা ক'কোশ হবে মা? কিনারা দেখতে পাচ্ছিনে—আচ্ছা, কি ক'রে লোকজন চাষ করতে আসে?"

যাঁহাকে প্রশ্নটা করা হইল, তিনি একটি কথারও জবাব দিলেন না। পায়ে অধিকতর জোর দিয়া মলিনাকে পাশ কাটাইয়া পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

কয়েক পদ গিয়াই বামুন-মা হঠাৎ উচ্চ ও অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "জব্দ আমিও করতে কি জানিনে—খুব জানি!" থমকিয়া দাঁড়াইয়া মলিনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোর মামার বাড়ীতেই ঢুকবো। কেন, কি জন্যে আইবুড়ো থাকবি তুই—এখ্খুনি তোর মামাকে বলবো তার বন্ধুর সঙ্গেই বিয়ে দিতে! চোখে দেখেছি যাই, নইলে কত আইবুড়ো মেয়ে অমন—" হঠাৎ পরিত্যক্ত গ্রামটার কোলে একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি চোখে পড়িতেই তিনি থামিলেন ও কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া চাপা-গলায় বলিলেন,—"আসছে কে—সুরেশের মতন, না?"

মায়ের প্রথম দৃষ্টির সঙ্গে মলিনারও চোখ একটিবার ও-দিকে পড়িয়াছিল। জোর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "ময়লার ছেলেকে বামুন ঠাওরালে, মা? ওর ঘাড়ে যে দুধ-দয়ের বাঁক!"

বামুন-মা একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "চোখে কি নজর হয় মা, আর!"

"নজর হওয়াতে আমার দিদিও কেউ ত দেখেনি, মা! চলো—" বলিয়া মলিনা ঐ বিস্তীর্ণ মাঠের অন্তহীন রাস্তাটার দিকে আঙুল বাড়াইল।

বামুন-মা চারেক পথ চলার পর একটা পুষ্করিণীর [illegible] পুনশ্চ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "এইবার [illegible] আমার বাড়ী যেতে হবে কি না! এই যে খোলা-রাস্তাটা [illegible] স্টেশনে যাবার রাস্তা। মাঠটা পার হলেই স্টেশন—রেলে [illegible] যেতে হয়।"

একটু থামিয়া পরক্ষণেই আবার বলিয়া উঠিলেন, "দায় পড়েছে [illegible] যেতে! কেন, 'বিধবা-আশ্রমে' যাবো কিসের জন্যে? ওর বিয়ে হতে পারে, আর তোর পারে না? ওর যদি জাত থাকে, তোর থাকবে না? টেকা দিয়ে আমিও বিয়ে দেব, দিয়ে বর-কনে দেখিয়ে নিয়ে যাবো—এক আমিও করতে জানি!"

উক্ত কথাগুলি বামুন-মা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া শিবালয়ের রাস্তাটা ধরিতেই মলিনা বলিল, "মা, পুকুরটার বেশ জল—নেয়ে নিলে হয় না? নাওও না!"

মা আপত্তি করিলেন না। উভয়েই কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া স্নানটা সারিয়া লইবার উদ্যোগ করিল। একখানি মাত্র গামছা, কাজেই একসঙ্গে উভয়ের স্নান করা হইল না। বামুন-মাই প্রথমে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিলেন। অতঃপর, মলিনা মায়ের ভিজা-কাপড়খানা পরিয়া পুঁটলিটা উঠাইয়া লইতেই বামুন-মা বলিলেন, "ও কি হবে? ছাড়া কাপড়টাই পরবি'খন—"

মলিনা বলিল, "আয়না-চিরুনী আছে, খোঁপাটা আঁচড়ে বেঁধে দি মা?"

"নিশ্চয়ই। গাঁয়ে ঢুকলেই ত 'পাত্র' তোকে দেখতে আসবে। দেখ —বেশ ক'রে চুল ফেরাবি, 'পাতা' কাটবি—জব আমিও করতে জানি!' বলিয়াই বামুন-মা 'হরিনামের মালা'গাছটা বাহির করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। মলিনাও জলে নামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরেই মলিনা জলের ঘাট হইতে উঠিয়া আসিল ও মায়ের সম্মুখে পড়িতেই তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! মিনিটখানেক মূঢ়ার ন্যায় তাকাইয়া থাকিয়া নিস্তেজকণ্ঠে কহিলেন, "কি করলি, মলিনা—সীঁথেয় সিঁদুর দিয়ে এলি?"

মলিনা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া কহিল, "নইলে সধবা মেয়েকে ত ভালো দেখায় না, মা! অকল্যাণ হয়।"

"নিশ্চয়ই ত! মেয়েমানুষের বিয়ে কি দু'বার হয়—আমি যে চোখে দেখেছি।" দৃঢ়কণ্ঠে কথাটা বলিয়াই বামুন-মা মালা-গাছটা একবার মাথায় ঠেকাইয়া গলায় ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আর ত এসে পড়েছি—ওই ত স্টেশন! সহরে গিয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দেবতা-ঠাকুরকে —জব করতে আমরাও পারিনে কি?" বলিয়াই আবার এই ক্ষণ-পূর্ব্বেকার উপেক্ষিত পথটা আদরে বরণ করিয়া লইলেন।

সহরে গিয়া যখন ইহারা পৌছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। 'বিধবা-আশ্রম' রাত্রে খুঁজিয়া লওয়া অসুবিধা বুঝিয়া উহারা একটা হোটেলে গিয়া উঠিল—স্টেশনের কাছেই।

হোটেল বলিতে অনেকেরই হয়ত সুরম্য প্রাসাদ, এবং তদনুরূপ সাজসরঞ্জাম—টেবল, চেয়ার, কাঁটা-চামচের কথাই মনে পড়িবে। কিন্তু, এ হোটেলটি সে শ্রেণীর নহে, ইহা 'হিন্দুর বিশুদ্ধ হোটেল।' বাড়ীখানার বাহিরকার প্রাচীর কাঁচা-মাটীর—ভিতরে খান কয়েক টুকরা-টুকরা ঘর। ঘরগুলার দেওয়াল কঞ্চি ও চেঁচা-বাঁশের—উপরে কাদার পাতলা প্রলেপ

বেওয়ার। এই ঘরগুলি প্রবাসী অতিথিকে ভাড়া দেওয়া হয়। হোটেলে প্রবেশ করিবার মুখেই একটি ঈষৎ প্রশস্ত ঘর আছে—সেই ঘরে সারি দিয়া চারিদিকে উচ্চ কাষ্ঠাসন পাতা, এবং প্রতি আসনের দক্ষিণ কোণে জলভরা এক-একটা পাতলা পিতলের গ্লাস। ঘরটির এক কোণে একটা কাঠের সিন্দুক, তদুপরি একখানা ছেঁড়া মাদুর, ওয়াড়-হীন তুলা-বাহির-করা একটা বালিশ, সাদা-কালো-রাঙা পাড়-তোলা সূতায় চিত্রিত একটি জীর্ণ কাঁথা। এ সমস্ত শয্যা হোটেলের মালিকের, রাত্রিকালে এই ঘরটির এক কোণে বিস্তৃত হয়। মালিক—এক স্থূলকায়া প্রৌঢ়া।

নবাগতা দুইটি 'খরিদ্দার' দেখিয়া হোটেলের মালিক সহর্ষে অভ্যর্থনা করিল। অতঃপর কিরূপ ঘর প্রয়োজন, ক'দিন থাকিবে, কি কাযে আসা হইয়াছে—ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন করিবার পর যখন সে জানিতে পারিল যে, উহারা 'বিধবা-আশ্রমে' ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত আসিয়াছে, তখন নিতান্ত হতাশে নাক সিটকাইয়া কহিল, "তা, হোটেলে থাকতে এসেচ—পয়সা আছে ত?"

বামুন-মা চমকিয়া উঠিলেন। আকাশ হইতে কালো পর্দার মত নামিয়া রাত্রির ঘন রঙ্ চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, এ স্থান হইতে বাহির হইয়া আপাততঃ কোথায়ই বা তাঁহাদের আশ্রয় মিলিবে? অপিচ, এ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে বামুন-মা যেন হঠাৎ খবর পাইলেন যে, বিনিময়ে অর্থ প্রদান করিতে হইবে, নতুবা এখানেও তাঁহাদের আশ্রয় মিলিবে না। কিন্তু বিনিময় করিবার সংস্থান আছে কি না, তাহাও তিনি বিদিতা নন। সত্য কথা, মনিববাড়ী হইতে যেন কিছু মাহিনা আজ সকালে তিনি পাইয়াছেন—সে কত, তাহা ত তিনি গণিয়া, বাজাইয়া, দেখিয়াও দেখেন নাই। তদ্ব্যতীত বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়াই মলিনার হাতে নোট-টাকা তিনি ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বেল-

ভাড়া দিয়া কত অবশিষ্ট আছে, তাহা ত মলিনাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। কাজেই হোটেল-উলীর এই প্রশ্নটা তাঁহার মনে এক দৈত্যমূর্তি ধরি উঁকি মারিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া কোনও কথাই তিনি সহসা বলি পারিলেন না।

জবাব না পাইয়া হোটেলউলী চটিয়া উঠিয়া কহিল, "আচ্ছা আপনার কি, তোমাদের পয়সা-কড়ি আছে? না থাকে ত বাছা, পথ দেখ—"

বাবার মুখ দিয়াই জবাব বাহির হইবে মনে করিয়া মলিনা কোনও কথা কহে নাই। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্রীর রূঢ় অথচ নিতান্ত সঙ্গত কথাটা কানে খট্ করিয়া লাগিতেই মলিনা বিনম্রকণ্ঠে বলিল, "রাত্রিতে কোথায় যাবো মা! পয়সা দেব বৈ কি।"

হোটেলউলী তৎক্ষণাৎ হাত পাতিয়া বলিল, "তা দাও, ঘরের দু'জনকার চার-আনা চার-আনা—আট আনা, আর ভাতের দু'জনকার দশ-আনা দশ-আনা—পাঁচ সিকে।" বলিয়াই রান্নাঘরের দিকে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ নব্‌নে—ঠাকুর—আঁটকুড়ির ছেলে, শুনতে পাচ্ছিস—ডাল আর-একটু বাড়বে—'তাই' আর-খানিকটে ঢেলে দিবি, বুঝলি?" পুনশ্চ মলিনার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কৈ বাছা, বের করলে?"

মলিনা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "কাল সকালে দেব, দিলে চলবে না?"

হোটেলউলী মুখ বাঁকাইয়া জবাব দিল, "তোমরা যাচ্ছ 'আচ-ছেরমে'—যে দরের মানুষ, বুঝে নিয়েছি! না বাছা, আগাম চাই!"

মলিনা নতগলায় বলিল, "আশ্রমে গেলেও আপনাকে ফাঁকি দেব না।"

হোটেলউলী আবার চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা নচ্ছার ত তোমরা! অমন 'খদ্দেরে' কাজ নেই আমার—রাস্তা দেখ, রাস্তা দেখ।"

কিন্তু রাস্তা দেখিতে হইল না। মলিনা তৎক্ষণাৎ আঁচলের খুঁট হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া হোটেলউলীর হাতে দিল।

হোটেলউলী আধুলিটা কেরোসিনের ল্যাম্পের আলোয় বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল, "[illegible]—[illegible]"

মলিনা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আধুলি আর কাউকে [illegible] দিলাম।"

হোটেলউলী আধুলিটাকে বার কয়েক [illegible] দেখিয়া বলিল, "আর কৈ—আর পাঁচ সিকে?"

মলিনা মায়ের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "আমরা [illegible] খাবো না।"

"তা, না খাও," এস, ঘর দেখিয়ে দিই—" বলিয়া হোটেলউলী একটা কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বামুন-মা ও মলিনাকে তদনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল, ও একধারে একটি ঘরের শিকল খুলিয়া বলিল, "এই ঘর—একখানা তক্তা পাতা আছে—দু'জনায় শোবে।" বলিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইল।

মলিনা ব্যগ্রব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "একটা আলো দেবেন না?"

হোটেলউলী বিরক্ত হইয়া উঠিল, রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "থাকবে ত 'আচছেবুমে'—সেখানে 'সেজ' জ্বলবে, নয়? বলি, তেলের পয়সা দেবে?—একটা একআনি চাই।"

"তা দেব বৈ কি, মা।" বলিয়া মলিনা একটা আনি বাহির করিয়া দিল।

"হোটেলউলী হাতের আলোটা নামাইয়া দিয়া বলিল, "দেখ বাছা, সলতে তুলো না—তেল বেশী পুড়বে।" ঘরটায় ঢুকিয়া বলিল, "তক্তার ওপর চাপ দিয়ো না বেশী, ব'লে রাখছি—না পোষায়, চ'লে যাও।"

মলিনা আস্তে-আস্তে বলিল, "না মা, আস্তে-আস্তেই শোবো।"

হোটেলউলী আর অপেক্ষা করিল না।

মলিনাও তৎক্ষণাৎ ল্যাম্পটা মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিতে গেল, ও কপাট-টা ভেজাইয়াই ভয়ে আঁতকিয়া উঠিল। একটু ইতস্তত করিয়াই আড়ষ্ট ও চাপা গলায় হোটেলউলীকে ডাকিল, "ও মা—ওগো—"

"বেশ ত কাঁচা গলা! কে যায়ী—" জড়িতকণ্ঠের এক ভাঙা আওয়াজ শ্রুত হইল।

হোটেলউলী সেই আওয়াজটার গা ঘেঁসিয়া তখন যাইতেছিল, বলিল, "খদ্দের এসেছে রে!—ভোলা, তোর মেসোর জন্যে একটু রাখিস, নইলে এসে খুনোখুনি করবে!—কি গো, তোমরা আবার কি বলছ—" বলিতে-বলিতে মলিনাদের সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মলিনা ব্যগ্রকাতরকণ্ঠে বলিল, "ঘরে ত খিল নেই—"

হোটেলউলী একপ্রকার বিশ্রী হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "মা গো! চার আনার খদ্দের—তার আবার খিল! জনাপেছু আট আনা ক'রে দিতে পারবে? আট আনায় খিল পাবে।"

"তাই দিচ্ছি—" বলিয়া মলিনা আর একটি আধুলি বাহির করিয়া দিল।

"এস তবে—" বলিয়া হোটেলউলী আর-একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া ভিতরের দিকে মুখ করিয়া বলিল, "ভোলা, চার আনার ঘরে যা ত! এ-ঘরে খদ্দের ঢুকবে—"

কথাটা সমাপ্ত হইবামাত্র পূর্ব্বেকার মত এক অরুচিকর তক্তা হইতে একটা কদাকার লোক টলিতে-টলিতে উঠিয়া মেঝেয় দাঁড়াইল। কেরোসিনের ল্যাম্পটা মলিনারই হাতে ছিল, উহার আলোকে, লোকটা স্খলিত দৃষ্টিতে বারকয়েক মলিনার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ

খদ্দের, মাসী!" বলিয়াই তক্তার নীচে হইতে একটা কিসের ... একটা বাহির করিয়া তাহার 'মায়ের মুহোল্লয়া'র পানে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ... করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "রেখেছি মাসী, মেসোর জন্যে!" বলিয়া ইতর-ভদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, ধনি-দরিদ্র—অনেকেরই কাছে যাহা প্রিয়বস্তু, তাহা—সেই অপরূপ দ্রব্যই হোটেলউলীর হাতে দিয়া দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। হোটেলউলীও বোতলটাকে তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভিতর পূরিয়া 'খরিদ্দার' দুটিকে ঘরে যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া চলিয়া গেল।

সহরের এই সহায়-সম্বলহীন ঘেরাটোপে, রাত্রির এই দুর্দ্দান্তক্ষণে, বামুন-মার ভিতর-বাহিরকার আকৃতি কিরূপ হইল, তাহা আদৌ টের পাওয়া গেল না। কিন্তু, মলিনার সর্ব্বদেহ আতঙ্কে কাঠ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি মায়ের হাতে একটা টান দিয়া ঘরে পা বাড়াইয়াই নাক সিটকাইয়া একটু পিছাইয়া আসিল, তারপর নাকে আঁচল চাপা দিয়া ঢুকিয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "বাপ্ রে বাপ! দুর্গন্ধ! মা, এ কি খারাপ মেয়েমানুষদের বাড়ী?"

বামুন-মা নির্ব্বিকার, যেন পৃথিবীর কোনও কুৎসিত দৃশ্যের বিচার করিবার তাঁহার আর অধিকার নাই।

মলিনা কপাটে খিল আঁটিয়া ঘরটার এক কোণে মাকে টানিয়া আনিয়া তেমনই নাক টিপিয়া বলিল, "তক্তার ওপর কি পড়ে রয়েছে—মদ?" পরক্ষণেই আবার কহিল, "ছোঁড়াটা অত মাতাল—আমার ভয় করছে, মা!"

বামুন-মা মাথাটা টিপিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

পাশে মলিনাও বসিল, এবং দুয়ারের দিকে ভীত-কম্পিত চোখে একবার চাহিয়াই অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "মাসীটেও কি গো! স্বামীর জন্যে মদ

[illegible] নশোর হাত থেকে!” একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিল, “[illegible] মা, মাগীর হাতে নোয়াও নেই, সিঁথেয় সিঁদুরও নেই, তবে?”

বামুন-মা কি-যেন ভাবিতেছিলেন, বিমনা হইয়াই জবাব দিলেন, “সহরে, শুনিছি, সধবা বিধবা বোঝা যায় না।” বলিয়া আঁচলটা বিছাইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন।

মলিনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “ভিজে মেঝে—এমনি শুয়ো না, মা। এই কম্বলটা পাতি—” বলিয়া পুঁটলি খুলিয়া একখানা কম্বল বাহির করিয়া পাতিতে গেল।

বামুন-মা বাধা দিয়া বলিলেন, “না, মা, না! তুই মুড়ি-শুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়—”

“কন্‌কনে শীত, স্যাঁৎসেতে জায়গা—অসুখ করবে যে! ওঠো, কম্বলটা বিছুই—” বলিয়া মলিনা মায়ের বাধাটা অগ্রাহ্য করিয়াই তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেল।

বামুন-মা একটু হাসিলেন, বলিলেন, “ওরে, ভেতরে আগুন থাকলে—না, না, তুই শো, মা!”

মলিনা মুখ নীচু করিল। স্পষ্টই বুঝিল, যে-কারণেই হউক, ঐ শয়ান নারী দেহটার পদতলে চরাচরের সমগ্র প্রার্থনা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেও কোনও ফলই আর প্রসূত হইবে না! অগত্যা সে আলোটা নিবাইয়া দিয়া মায়ের পার্শ্বে শয্যা গ্রহণ করিল। সঙ্গে-সঙ্গেই হোটেলের আলো ও কলরব বাঁশ-কঞ্চির ফাটা দেওয়াল ফুঁড়িয়া এক ঝাঁক হাউয়ের ন্যায় ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িল।

ভোরের আলো পৃথিবীতে পড়িতে-না-পড়িতেই, হোটেলওলী মলিনাদের ঘরের কাছে আসিয়া বজ্র-গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, “ওঠো না গো—তোমাদের কি আর রাত পোয়াবে না?”

রাতটা মলিনারই প্রথমে পোহাইল। সে ধড়মড় করিতে একটা বসিয়া মাকে ঠেলিয়া তুলিতে গিয়াই চমকিয়া উঠিল, দেখিল জ্বরে তাঁহার গা পুড়িয়া যাইতেছে! আতঙ্কে আর একবার তাঁহার গায়ে হাত দিয়া আড়ষ্টকণ্ঠে ডাকিল, "মা, অ মা—"

"কি গো! তোমরা জন্মের ঘুম ঘুমুচ্ছো না কি?"—বাহির হইতে আবার এক বিকট চীৎকার আসিল।

মলিনা আপাতত মায়ের খবর লওয়া স্থগিত রাখিয়া খিল খুলিয়া দিল ও আড়ষ্টপদে পুনশ্চ মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

হোটেলউলী একবার মলিনার দিকে তীব্র দৃষ্টি ফেলিয়াই পূর্বোক্ত 'খাবার-ঘরে'র দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, "এসো গো, ঠাকুর, এসো—"

অবিলম্বেই একটি লোক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল—তাহার হাতে ঝোলানো বিশেষ-বড় একটি পুঁটুলি, অর্থাৎ বস্তা, কাঁধেও তাদৃশ আকারের একটা সংসার। তাহার মাথার চুলগুলি প্রায় সমস্তই শাদা, কাযেই তাহাকে যুবা বা প্রৌঢ় বলিলে তর্ক উঠিবে। কিন্তু, তাহার হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও সৌম্য আকৃতি অনেক বলিষ্ঠ তরুণ যুবাকেও হার মানাইয়া দেয়। সে হোটেলউলীর নির্দ্দেশমত ঘরে ঢুকিল এবং কোণে ঐ দুটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "দুটি মেয়েছেলে রয়েছে—আমায় অন্য ঘর দাও না, মা-লক্ষ্মী?"

হোটেলউলী তাহার স্বাভাবিক কর্কশ-গলায় বলিল, "ওরা থাকিবে নয়—আট আনার ঘরে থাকবে ওরা? এখ্খুনি 'আচছেরমে' ভর্ত্তি হতে যাবে—" পরক্ষণেই ঘরে ঢুকিয়া বিশ্বের পাপে ঠেলা ওই নারীদুটির দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেমন ভালোমানুষের মেয়ে বটে তোমরা? বলি, ঠাঁয় ক'রে ব'সে রইলে—আমার ঘরে কি খদ্দের

"আজ ছোটদমে' যাবে, কি, কোথায় যাবে—চ'লে যাও, নইলে এসে বোসো! কৈ, উঠ্‌লে?"

মায়ের সাড়া মলিনার এখনও লওয়া হয় নাই। শুধুই সে অনুমানে বুঝিয়াছে—তিনি বেহুঁশ হইয়া রহিয়াছেন। মায়ের বুকে একটি হাত রাখিয়া কাতরকণ্ঠে জবাব দিল, "মায়ের বড্‌ডো জ্বর এসেছে—একটু পরে গেলে হবে না?"

হোটেলউলীর সম্মুখে যেন ভূত নাচিয়া গেল! আত্‌কিয়া উঠিয়া বলিল, "কি—জ্বর হয়েছে? বেরিয়ে এসো—বেরিয়ে এসো! আমার বাড়ীতে রুগী-ঘুগী রাখা চল্‌বে না, বাছা! হাঁসপাতালে নিয়ে যাও—আপদ যত!"

আবেদন ব্যর্থ হইয়া গেল, তত্রাপি মলিনা ছাড়িল না। পুনশ্চ কহিল, "মায়ের জ্ঞান নেই, এখন ত নিয়ে যেতে পার্‌বো না, মা!"

হোটেলউলীর সহিষ্ণুতা এবার গণ্ডী অতিক্রম করিল। দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, হয়ে এসেছে না কি, হয়ে এসেছে?"

"আঃ, কি কর্‌ছো, মা-লক্ষ্মী!" কথা কয়টা বিরক্তভাবে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়াই নবাগত লোকটি মোটগুলা নীচে নামাইল।

হোটেলউলী তাহার বিশ্রী মুখটা লোকটির দিকে ফিরাইয়া তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, "দেখ না ঠাকুর, মাগীগুলোর আক্কেলখানা! ওদের জন্যে আমাকে খন্দের খোয়াতে হবে!"

লোকটি শান্তগলায় বলিল, "জ্বর এসেছে বলছে, উঠতে পারে কি, বাছা?"

হোটেলউলী হাতমুখের এক অকথ্য ভঙ্গী করিয়া বলিল, "তুমিও ঠাকুর ত বেশ দেখছি! রুগী থাকলে 'খদ্দের' ঢুকবে ঘরে? জানো—পূরো-ঘরটার কত ভাড়া? রোজ দু'টাকা!"

"আমি দিচ্ছি—" বলিয়াই চট্ করিয়া লোকটি কোথায় হইতে একটা থলি বাহির করিল ও উহা হইতে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া হোটেলউলীর হাতে দিয়া বলিল, "জমা রেখে দাও। এতেও যদি না কুলোয়—আবার দেবো। আর, আমি ঐ চালায় যাচ্ছি।" বলিয়াই মোটগুলা আবার তুলিয়া লইয়া অদূরে একটা গরুর চালায় গিয়া উঠিল।

হোটেলউলী এই অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। দশ টাকা মূল্যের কাগজখানার দিকে একদৃষ্টে মিনিটখানেক চাহিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

আর একজনও স্তম্ভিত হইয়াছিল, সে মলিনা। রাস্তার উড়ো-ধূলার মত সকলেই উহাদিগকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে; আজ এমন অ-দিনে, এই একই দুনিয়ার ভিতর কেমন করিয়াই বা যে এক মহাপ্রাণের আবির্ভাব হইল, তাহা ভাবিতে গিয়া ঐ অভিশপ্ত মেয়েটি বিহ্বল হইয়া পড়িল। একটিবার মনে করিল, সে উঠিয়া গিয়া লোকটির পদধূলি গ্রহণ করিয়া আসে, কিন্তু তাহার কৃতার্থ অন্তরের কোণে এক সময়োচিত সরম রোদন তুলিয়া তাহাকে পলকে-পলকে বিব্রত করিয়াই তুলিতে লাগিল।

যাহাই হউক, আপাততঃ সে একটু নিশ্চিন্ত হইল। কম্বলখানা বেশ করিয়া মায়ের গায়ে চাপা দিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া আবার ডাকিল, "মা—"

কিন্তু, সাড়া নাই, শব্দ নাই! মলিনার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল, এই প্রবাসে, এমন অকথ্য কদর্য্য স্থানে একাকী সে কী প্রতীকার করিবে? তাহার অকারণ জীবনটার যিনি পলে-পলে নিত্য-নূতন অর্থ বাহির করিয়া আসিয়াছেন, তিনি—ঐ একমাত্র

অবলম্বনই যে, এমনধারা হেলিয়া পড়িয়া রহিলেন, তাঁহাকে উঠাইবার জন্য কাহাকে আজ সে ডাকাডাকি করিবে ?

এমনি সময়ে অন্য ঘর হইতে এক যুক্ত-কলহাস্যের বিকট শব্দ উঠিল, এবং দেখিতে-দেখিতে একজন লোক দুয়ারগোড়ায় আসিয়া মুখ বাড়াইয়া মলিনার দিকে খানিক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল। মলিনা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, কাল রাত্রিতে যে অশ্লীল অভিনয়টা করিয়াছিল, সে এই লোকটাই !

এক দিকে মেয়েটির জননী জ্বরের ঘোরে চেতনাহীন, অপর দিকে তাহার নারীত্বের উপর পশুর চোখ! [illegible] ছটফট করিয়া উঠিল। কিন্তু—

কি ভাবিতে গিয়া, এই একটু পূর্ব্বেকার সেই প্রবল 'শুভার্থী'র কথাটা তাহার মনে আসিল। এবার লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা—সমস্ত পোষাকী-বাধা [illegible] ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও বরাবর চালায় গিয়া উক্ত [illegible]টিকে কাতরস্বরকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন—" [illegible] কিছু [illegible] পারিল না, গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

[illegible] হইয়া বলিয়া উঠিল, "[illegible] কি করেছি, মা! ও-সব [illegible]—নারায়ণ। কার [illegible] করেছে, হ্যাঁ মা ?"

[illegible] তেমনি করিয়াই বলিল, "আমার মায়ের—"

[illegible] সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "মা ? [illegible] আছেন ?"

[illegible] বলিল, "কি জানি, ভালো নেই [illegible] তো! সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে —[illegible]! আপনাকে—", একটা ঢোক গিলিয়াই বলিয়া ফেলিল, "[illegible] মুখ তুলে চাইতে হবে! আমাদের কেউ নেই !"

লোকটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আরে ক্ষেপি ! আমি [illegible] মানুষ, না, দেবতা যে মুখ তুলে চাইবো ? চল, তোর মাকে দেখে আসি।"

দেখ, তুইও আমার মা, আর তোর মা-ও আমার মা—" একমুখ হাসিয়া মলিনাকে লইয়া সে তাহাদের ঘরে গেল।

অতঃপর রোগণীর মুখের ভাব ও তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা করিয়া কি জানি কেন সে মনে-মনে দমিয়া গেল। কিন্তু সে-ভাবটা গোপন করিয়া মলিনাকে বলিল, "ভয় কি মা! তবে এমনি ফেলে রাখলে ত চলবে না—ডাক্তার দেখাতে হবে। আচ্ছা, আমি ডেকে আনছি ডাক্তার, তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত ব'সে থাকো—" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

মুখের কথাটি উচ্চারণ করিবামাত্র যে ঐ নিছক অচেনা লোকটি এতটা নিজেকে বিলাইয়া দিবে, তাহা মলিনা কল্পনায়ও জানিতে পারে নাই। অপরিমিত হর্ষে, আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় লোকটিকে মনে-মনে বারংবার প্রণতি জানাইয়া সে দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট পাচেক এমনিভাবে কাটিয়া গিয়াছে, লোকটি ফিরিয়া আসিল। বিষণ্ণভাবে বলিল, "এ জায়গা বড় খারাপ, মা! এখানে কি তোমাদের ঢুকতে আছে? ছাই, আমিও কি জানতাম। পূর্ববঙ্গে এক ঘর যজমান আছে আমার—সেখানে গিয়েছিলুম। ফেরবার পথে, তাই এখানে নেমেছি।" একটু থামিয়াই বলিল, "এরা ছোটলোক আর পাষণ্ড! মাগী কি বলছে, জানো মা, ডাক্তার ঢোকানো হবে না, হোটেলে খদ্দের আসবে না! পাষাণ মাগী, পাষাণ! যাক, হাসপাতাল আছে, সেইখানেই নিয়ে যেতে হবে—আমিও যাব, তুমিও যাবে, কেমন মা?"

মলিনা এ পরিহাসের জবাব দিবে কি? তুফানের মাঝে আশ্রয় দিবার জন্য আপনিই এক পাহাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—যাহাতে মজ্জিত অর্ণব-পোত। শুধুই ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "আপনার দয়ার আলো যে

দিকে পড়বে, সেই দিকেই যাবো—আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? কিন্তু, মা উঠতে পারবে?"

লোকটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমাকে বুড়ো দেখে মুখ বাঁকাচ্ছিস? ওরে, তুলোর মত তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে বসবো—মা বে!"

আর অপেক্ষা করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরেই একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া লোকটি রোগিণীকে হাসপাতালে লইয়া গেল, মলিনাও তদনুসরণ করিল।

'পেশেন্ট' নামিবামাত্র হাসপাতালের ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন। অতঃপর চোখের চশমা খুলিয়া গম্ভীরভাবে রুমালে মুছিতে-মুছিতে লোকটিকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি বলাবলি করিলেন। ফলে ইহাই দাঁড়াইল যে, 'রোগিণী'কে উক্ত চিকিৎসাশ্রমে 'ভর্তি' করিয়া দিয়া উহাদিগকে হোটেলে ফিরিয়া আসিতে হইল। মলিনাকে বুঝানো হইল যে, তাহার মায়ের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তই হইয়াছে।

হোটেলে ফিরিয়া লোকটি বাজার হইতে চাল-ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া একরাশ বাজার করিয়া আনিয়া মলিনার সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল, "দেখ্, মা! হোটেলে আর খেয়ে কাষ নেই—শতেক জাতের হাত পড়ছে! আমি বামুন—আমার হাতে খাবি ত?"

যদিও পূর্ব্বদিন হইতে মলিনার পেটে জলবিন্দু পর্য্যন্ত যায় নাই, তথাপি মাকে হাসপাতালে রাখিয়া আসিয়া অবধি সে-দিকটায় তাহার তত খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ এই অপরিহার্য্য অথচ অকারণ গণ্ডগোলের রব শুনিয়া মলিনা একটু থমকিয়া গেল। একটু পরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু, ছেলের পেটের দিক মা-ই তাকায়! হাড়ি আমিই চড়াতে যাচ্ছি!"

লোকটি বিস্ময়ে ও পুলকে বলিয়া উঠিল, "তুমিও—"

কথাটাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়াই মলিনা জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আমিও, বাবা, বামুনেরই মেয়ে!" একটা গোপন নিশ্বাস ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি একখানা গামছা লইয়া কুয়াঁর ধারে স্নান করিতে গেল। পিন্টু দেখিল—সোজাসুজি একটা ঘরের জানালায় বসিয়া নরপশুটা তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে!

যাহাই হউক, নিরুপদ্রবেই আরও পাঁচটা দিন কাটিয়া গেল। লোকটি এখনও এই হোটেলে পড়িয়া আছে, যেন সে যেচেছে—এই সর্ব্বহারা মেয়েটিকে মর্ত্ত্যে পাহারা দিবার জন্যই ভগবানের তরফ হইতে সে আসিয়াছে। সে প্রত্যহই হাসপাতালে যায় ও বামুন-মার খবর লইয়া আসে। আর প্রতিদিনই দুপুরবেলা মলিনাকে ডাকিয়া শাস্ত্রানুমোদিত দেহতত্ত্বের জোর-আলোচনা করে। একদিন মলিনার আহারাদি সারা হইবামাত্র তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথার জবাব দিতে হবে, মা। মানুষ মারা গেলে লোকে কাঁদে কেন?"

পূর্ব্বদিন পার্থিব 'মায়া-মোহ' লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ফলে, মলিনা নিজেকে অনেকটাই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মায়ায়। স্নেহ-ভালোবাসার পাত্রপাত্রীর দেখা আর পাবে না ব'লে! কেউ দু'দিনের মত বিদেশে গেলে চোখে জল আসে, আর জন্মের মত একজন কোথায় চলে যাবে—কান্না আসবে না?"

কথাগুলি লোকটিকে যেন ধাক্কা মারিয়া একটু পিছাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ আবার তর্ক তুলিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "যা চলন হয়ে আসছে, তাই-ই তুমি বলছ, মা! কিন্তু, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই—কান্না উচিত

কি না? ধরো, তুমি কাঁদছ, আমি কাঁদছি, অর্থাৎ মনের ভেতর এক-একটা শোক নিয়ে আমরা টানাটানি করছি! আমরাও যখন মরবো, তখন তোমার-আমার কাঁদবার লোকও ঠিক এমনিই শোক নিয়ে টানাটানি করবে, কেন না, আমাদের এই আচার-প্রকৃতি [illegible] [illegible]। এ রকম মৃত্যুর কেন্দ্রে যাওয়া তোমারও [illegible] আমারও [illegible] নয়—এই কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চাইছি, মা! ঢাক বাজিয়ে [illegible]কে জীবনটা পাত ক'রে ভালবেসে আসছি, কিন্তু, মরবার সময় আত্মহত্যা করবার জন্যে যে তার হাতে একখানা ছুরি দিয়ে যাবো—ভালবাসার রীতি [illegible] ত, মা!"

মলিনা [illegible] শিশুর ন্যায় প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা ত নয়ই, শোক হাজারই হোক!"

লোকটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ভুল করলে, মা! ঐ শোক-টাকেই আগে তাড়াতে হবে। নইলে, কান্না দূর হবে না!"

মলিনা একটু লজ্জিত হইয়া গেল, বলিল, "ঠিকই বটে! আমি মেয়েমানুষ—অত কি ধরতে পারি, বাবা!"

"না পারলে চলবে না ত, মা! মেয়েরাই ত কান্না পৃথিবীতে প্রথম নিয়ে আসে। শোক—অসুর! এই অসুরের সৃষ্টি তোমরাই করেছ, একে খুন করাও তোমাদেরই হাতে। মনের ভেতর শোক উঠবামাত্র একটা কথা শুধু ভাববে—তোমরা ছোটদের জন্যে বিষ রেখে যাচ্ছ!" লোকটি একটু থামিল। দেখা গেল, তাহার চোখ দুটা যেন ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ আবার যেন অভিমানে বলিয়া উঠিল, "তোদের মুখ চেয়ে থাকি আমরা—মা, লজ্জা করে না তোদের?"

এ কি ভর্ৎসনা! মলিনা লজ্জায়, কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া মাথা নীচু করিল।

লোকটি পুনশ্চ মুখ তিরস্কার করিয়া বলিল, "জবাব দাও, নইলে ছাড়বো না। বলো, কথা দাও—শোক-জিনিষটা তুমি অন্তত ছাড়তে পারবে?"

হঠাৎ এই সম্বন্ধ মলিনার মনটাকে যেন দোলা দিয়া গেল। সে চকিতে অদ্ভুত লোকটির পানে তাকাইল।

চতুর লোকটিও সে চাহনি তৎক্ষণাৎ চিনিয়া ফেলিল। তেমনি হাসিয়াই বলিল, "চমকালে যে? মনে করছ—তোমার মনের এত খাঁটি খবর আমার কাছে আছে? ছিঃ মা, এতও নরম বুক তোমাদের!"

মলিনা অপ্রতিভ হইয়া গেল। নতমুখী হইয়া বলিল, "তা কেন—"

লোকটি একমুখ হাসিয়া বলিল, "তবে, আমাকেই পরখ করছিলি বুঝি, হ্যাঁ মা?"

মলিনার মুখখানা লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। নিঃশব্দে কাপড়ের আঁচলটা লইয়া শুধু নাড়াচাড়া করিতেই লাগিল।

শক্ত লোকটি কিন্তু তখনও নাছোড়বান্দা। যেমন করিয়া মায়ের কাছে ঝড়-বাদলে খেলিতে যাইবার জন্য পুত্র আবদার ধরে, তেমনই করিয়াই লোকটি আবার বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে কথা দিলে ত—কান্নাকাটি তুমি করতে পাবে না?"

এবার সত্য-সত্যই মলিনার মুখখানা শুকাইয়া গেল। সভয়ে বলিল, "কেন, মা আমার নেই?"

লোকটি এমনিই ভাব দেখাইল যে, সে যেন অতিরিক্তই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বলিল, "কিসে কি কথা পাড়ছ! এই তুমি না বলছিলে—তোমার বুক শক্ত? আমার মুখ তুমি এমনি করেই রাখতে পারবে না, মা?"

একটা অবথা, অকারণ ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়া
মলিনা নিজেকে মনে-মনে খুব-খানিকটা ধিক্কার দিল
কুণ্ঠায় বলিয়া উঠিল, "না, বাবা, না! আপনি যে গুরু

"তবে কথা দিলে, কেমন ত?" বলিয়া লোক
স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মলিনা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হুঁ!"

লোকটি রহস্যের ভান করিয়া হাসিয়া বলিল, "
নাই-ই থাকে, তা হ'লে কাঁদবে না ত?"

মলিনা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বলিল—"না।"

"কেন?"—লোকটি প্রশ্ন করিল।

মলিনা তেমনি করিয়াই জবাব দিল, "আপনি বারণ

অতঃপর যেমন করিয়া উদ্বিগ্ন ছাত্রকে লোকে পা
দেয়, তেমনি করিয়াই ঐ অত্যাশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব, কঠিন
দিল—"যেখানে সকলেই যায়, আজ সকালে সেই
গেছেন—ওঠো, সৎকার করবে।"

গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ-জানালার বাহিরে বৃষ্টিপড়া
—তাহার মা নাই! জগতের প্রতিনিয়ত শত-শত
মতই বুঝিল—তাহার মা নাই! চোখ মেলিয়া এক
চাহিল, দেখিল—অনন্তপ্রসারী পৃথিবী জুড়িয়া শুধু
মূর্ত্তিমান এক হাহাকারই পড়িয়া রহিয়াছে! সে কে
আসিয়া কি হইয়া গেল, চকিতে ভাবিতে গিয়াই
সমস্তই আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে! শুধু
প্রেতমূর্ত্তি তাহাকে পলে-পলে আহ্বান করিতেছে—
আর ছাই কিছুই কোথাও নাই!

মলিনা এইরূপ অজ্ঞান হইয়া আছে, লোকটি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেরী কোরো না, মা!"

মলিনা চমকিয়া উঠিল এবং শূন্যদৃষ্টিতে একটিবার লোকটির পানে তাকাইল।

লোকটি অতিরিক্ত স্নেহে বলিল, "করিস্‌নে মা দেরী আর—"

"বাবা—" মলিনা কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ গলায় স্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল। গলা ঝাড়িয়া বলিল, "না, কাঁদবো না। বাবা, একটা কথা বলুন না?—মায়ের মুখে কথা বেরিয়েছিল আর?"

মলিনার এতাদৃশ ধৈর্য্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া লোকটিও অবাক হইয়া গিয়াছিল। অবিলম্বেই বলিল, "কাঁদবিনে, তা জানি, মা! নইলে অতটা আবদার কোন্ ছেলে মায়ের কাছে অমন নির্ভয়ে করতে পারে?" একটু পরেই আবার বলিল, "কথাবার্ত্তা আর হয়নি, মা! প্রথম দিনই দেখে বুঝেছিলাম—তিনি আমাদের ঠকিয়ে চ'লে যাবেন। ডাক্তারে কি বললেন জানিস্—অতিরিক্ত উত্তেজনায় মাথায় খুব রক্ত উঠে চেতনা-শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল! ও অসুখে বাঁচে না মানুষ—হঠাৎ মৃত্যু হয়। তবুও ওঁরা পাঁচটা দিন ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে রেখেছিলেন!"

মলিনার মুখখানা হঠাৎ ঝুলিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই মুখ তুলিয়া অপরিমিত উৎসাহে বলিল, "চলুন!—"

"এক মিনিট দাঁড়া, মা! একখানা গাড়ী ডেকে আনি—" বলিতে-বলিতেই লোকটি অদৃশ্য হইয়া গেল ও অবিলম্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মলিনাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিয়মে যখন মৃতার সৎকার করিয়া উহারা ফিরিয়া আসিল, তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। হোটেলের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দু'একটা ঠেলা মা[illegible] হোটেলওয়ালী বিরক্ত হইয়া চেঁচাইয়া

উঠিল। অতঃপর আপন-মনে বোধ করি-বা ঐ বাহিরের লোক দুটির আত্মশ্রাদ্ধ মায় সপিণ্ডকরণের মন্ত্রপাঠ করিতে-করিতে খিল খুলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "রাত্ত-দুপুরে কপাট-ঠেলাঠেলি পোষাবে না, বাছা—মোদো-মাতালের বাড়ী নয়! দশটা টাকা দিয়ে মাথা ত কিনে রাখোনি—"

মাথা কিনিয়া রাখে নাই বলিয়াই বুঝি-বা ওই আশ্রয়ভিক্ষার্থীরা কথাটি কহিল না। নীরবে ভিতরে ঢুকিয়া সম্মুখের ঘরটা পার হইয়া উভয়ে উভয়কার পৃথক নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়াভিমুখী হইল।

হোটেলউলী খিলটা পুনশ্চ বন্ধ করিয়াই মলিনাকে হাঁকিয়া বলিল, "ওগো বাছা, যাচ্ছ কোথা ঠরঠরিয়ে—দাঁড়াও, দাঁড়াও!" বলিতে-বলিতে দ্রুতপদে মলিনার নিকটে আসিয়া বলিল, "ও ঘরে তোমার আজ শোওয়া হবে না! চার আনার ঘরে চল, তোমার কাপড়-কম্বল রেখে এসেছি—"

উক্ত লোকটিও ইত্যবসরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ?"

হোটেলউলী হাতে করিয়া একটা নির্ব্বাপিত কেরোসিনের ল্যাম্প আনিয়াছিল, সেটিকে জ্বালিয়া বলিল, "ও ঘরে আমার ষোলজন 'খদ্দের' এসেছে—ওরা 'মড়া' নিয়ে এসেছিল পোড়াতে।"

এক ফোঁটা অপরিসর কুটীরে অতগুলা লোকের কুলান কিরূপে হইল, তাহা ভাবিবার আগেই, লোকটি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পুরো ঘরটাই নিয়ে রেখেছি ত, আর কাউকে দিলে কেন?"

হোটেলউলী মুখ মচকাইয়া জবাব দিল, "মা গো! দিলাম কেন—ওঁকে কৈফিৎ দিতে হবে!" পরক্ষণেই এক কল্পনাতীত সংবাদ দিতেছে এমনিই ভাব দেখাইয়া বলিল, "ওরা ষোল্ল জনে ষোল টাকা দিয়েছে এক রাত্রে, পারো তোমরা দিতে?"

বাকি ন' টাকা দিচ্ছি—" বলিয়াই লোকটা ক্রোধে কোমর হইতে চট্ করিয়া টাকার থলিটা খুলিয়া ফেলিল।

মলিনা তাড়াতাড়ি থলিটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "বাবা, আপনার টাকা 'খোলাম-কুচি' নয়!" অতঃপর হোটেলউলীকে বলিল, "না মা, পারি নে! চার আনার ঘরেই আমি যাচ্ছি— বলিয়া লোকটিকে অগ্রে রাখিয়া প্রথম দিনকার অর্গলহীন ঘরটায় ঢুকিল। হোটেলউলীও আর দাঁড়াইল না।

ও-ঘরটার ইতিহাস লোকটি মলিনার মুখে পূর্বেই শুনিয়াছিল, তজ্জন্যই তাহার শান্ত-প্রকৃতি এই অভাগী মেয়েটার মুখ চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরে আসিয়া পুনশ্চ এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার মুখেই মলিনা মুখতাড়া দিয়া বলিল, "তুমিও, বাবা, এইখানেই শোও না? পোট্‌লা-পুঁটুলিগুলো বয়ে-ছয়ে নিয়ে আসি, আনবো?" মলিনা লোকটিকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে সুরু করিল।

লোকটি একটু মুস্কিলে পড়িল। স্পষ্টই বোধ হইল যে, তাহার বুকে সম্মতি ও আপত্তির ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে। একটু পরেই স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "তুমি শোও—আমার চালা ত সাম্‌নেই!" বলিয়া ঘরের কপাট-জোড়াটা একবার অনর্থক পরীক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "দেখ্, মা—একটু ভয় পেলেই 'বাবা' ব'লে ডাকবি, আমি ছুটে এসে পড়বো।"

মলিনা নাছোড়বান্দা হইয়া আবার বলিল, "চালায় ত সেই কন্‌কনে হিম! শোও না, বাবা, এখানে?"

"না গো, না! পাকা হাড়ে কি হিম লাগে? তুমি মা, লক্ষ্মীর মতন শোও দিকিনি এখন—রাত হয়েছে!" বলিয়া লোকটি কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। অগত্যা মলিনা একাই আঁচল বিছাইয়া মেঝের এক পার্শ্বে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

এ-কয় দিনের দুর্ভাবনা ও সারাটা দিনের পরিশ্রান্তি মলিনাকে বেশ একটু জখম করিয়াই ফেলিয়াছিল, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অবিলম্বেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অতঃপর বিবিধ প্রকারের পর-পর কতকগুলি দুঃস্বপ্নেরই ভিতর দিয়া যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিল, প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। তন্মুহূর্ত্তেই দেহ ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িল ও কপাট খুলিতেই দেখিল—সেই লোকটি ঠিক দুয়ার ঘেঁষিয়া দুটা হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বাহিরে বসিয়া রহিয়াছে। মলিনা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "বাবা, তুমি এখানে! শোওনি?"

লোকটি মুখ তুলিল। নিদ্রালস চোখদুটা মুছিয়া স্মিতমুখে বলিল, "এইখানেই ঘুমটা সেরে নিয়েছি, মা! ঘুম নিয়েই ত কথা।"

কারণটা কিন্তু আয়নার মতই মলিনার চোখে ভাসিয়া উঠিল। স্পষ্টই বুঝিল, এই অপটু ঘরটায় তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া লোকটির দেবপ্রাণ ঈষদ্দূরেও সরিয়া থাকিতে পারে নাই। মলিনার মুখ দিয়া কথা সরিল না, কয়েক মিনিট অপলকনেত্রে ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটির দিকে মূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার শীতও করেনি, হিমও লাগেনি?"

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাকা-হাড়ে কি শীত-হিম লাগে, মা! তোর ভয় করেনি, হ্যাঁ মা?"

মলিনার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল "ভগবান আমায় পায়ে ঠেলেছেন—তুমি কেন আর আদর দিচ্ছ, বাবা!"

লোকটি অস্থির হইয়া উঠিল, বলিল, "ও কি, কাঁদছিস? তবে আজই আমি চ'লে যাবো—"

মলিনা চোখ মুছিল, ধীরকণ্ঠে বলিল, "তা জানি। আমার সামনেকার সমস্ত জীবনটাই অন্ধকারে কালো—ক'দিন তুমি আর আলো ধ'রে

থাকবে? তাই ত বলছি, আদর দিয়ে আর আমাকে সহ-হারা ক'রে তুলো না!" মলিনা চোখে আঁচল চাপা দিল।

এই প্রকাণ্ড সত্যটা লোকটির মনেও এইবার মুহুর্মুহু উঁকি মারিয়া গেল এবং এই সত্যটার মূলে যে অতিগুরু এক সমস্যাও নিহিত আছে, তাহাও এই কয়েক দিন ধরিয়াই সে বুঝিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইহার বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ ও অবসর বিগত অনুরূপ কয়েক দিনের কোনও মুহূর্ত্তেই সে পায় নাই। আজ সেই কথাটাই পাড়িতে গিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গটার রক্তনেত্র দেখিয়া শঙ্কায় সে [illegible] মেয়েটিকে সর্ব্বাগ্রে ঠাণ্ডা করিবার প্রয়োজন বুঝিয়াই সে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "দেখ্ মা, স্নেহটা নীচগামী, তা যদি না হতো, বাপ-মায়ের সামনে ছেলে-মেয়েরা চোখের জল ফেলতে পারতো না। আমার বুকটা কি পাহাড়-পর্ব্বত যে কেবলই ঘা দিবি?"

ভিতরে প্রস্রবণ উঠিলেও মলিনার বাহিরকার চোখে অশ্রু নিমেষে নিরোধ হইয়া গেল। ধরা গলায় বলিল, "আর, আমিও বলছি—আদর ছাড়া সন্তানকে সাজা দেবার বাপ-মায়ের আর কোনও দণ্ড নেই!" বলিয়াই ত্বরিতপদে কূয়া হইতে জল তুলিয়া আনিয়া লোকটির সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "মুখ ধোও—আমি আহ্নিকের জায়গা করি গে। সকাল হয়ে গেছে, একটু জল মুখে দাও—সেই ত কাল কোন্ সকালে নাকে-মুখে ভাত দুটো গুঁজেছো—" বলিয়াই চালাটার দিকে চলিয়া গেল।

লোকটি একমুখ হাসিয়া শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিল, "এই জন্মেই লোকে মেয়ের 'বর' মাগে, নইলে বুড়ো-বাপের যত্ন করবে কে?"

মলিনার কথার বদ হইল না, তাহার মনোমত সমস্ত ব্যবস্থাই এক-এক করিয়া লোকটিকে গ্রহণ করিতে হইল। তখন স্থায়ী, অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী—হোটেলের সকল লোকই উঠিয়াছে ও ভিন্ন-ভিন্ন লোকের

ভিন্ন ভিন্ন কায ও কথাবার্ত্তায় বাড়ীখানা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-রাত্রিকার শবদাহকারীরা হোটেলের দেনা-পাওনা চুকাইয়া গেল, 'ঠাকুর' বাজারে চলিয়া গেল, হোটেলওলী পূর্ব্বদিনকার সঞ্চিত কতকগুলা শুক ওল-কচু পুঁইশাক-কাচকলা লইয়া ঠিক আতার ঘরের দুয়ার চাপিয়া কুটিতে বসিল।

মলিনার স্নানাদি সারা হইতেই লোকটি বলিল, "মা, এ তিনটে দিন হাড়ির ভাত খেয়ে আর কায নেই তোমার, মালসা পোড়াও—চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা ত করতে হবে। তুমি ব'লো, আমি হবিষ্যির কেনা-কাটা ক'রে আনি।"

কথাটা মলিনার মনেই ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরমুহূর্ত্ত হইতেই এই লোকটি তাহাকে এমনিই জ্ঞানহারা করিয়া বিব্রত রাখিয়াছিল যে, এই সময়োচিত দুর্লঙ্ঘ্য অনুষ্ঠানের কথাটা তাহার মনেই উঠে নাই। সচকিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা! আমি হবিষ্যিই করবো। তোমার জন্যে শুধু হাড়িটে চড়িয়ে দিই।"

বাধা দিয়া লোকটি কহিল, "কিছু দরকার নেই মা! বড় দেখে একটা মাল্‌সা আন্‌বো, তোমারও হবে, আমারও হবে।"

মলিনা একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার যেমন কথা! 'মাল্‌সা'র পাক-ভাত, তুমি খেতে পার কি?"

লোকটি হাসিয়া জবাব দিল, "বাপ-মা যাদের মুখে ক্ষীর-দই দেয়, তারা যদি পারে—আমি পার্‌বো না? সাধে কি বলতে রুচি হয়—তুই ক্ষেপী!" বলিয়াই একখানা গাম্‌ছা কাঁধে ফেলিয়া বাজারে চলিয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে স্থানটাও বিষম জনহীন, স্তব্ধ, খালি হইয়া গেল, যেন এইমাত্র 'ঠাকুর-তলা' হইতে প্রতিমা উঠানো হইয়াছে। মলিনার হাতেও

জন

জুটিয়াছে বলিয়াই কত না সংসারে আজ ছাই পড়িয়াছে! মেয়েদের ভিতর লোকটা শার্দ্দূলের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল ও এক জোর-ধাক্কায় কপাট-জোড়াটা খুলিয়া ফেলিয়াই মেয়েটির দিকে হাত বাড়াইল—

চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কোথা হইতে সপাৎ করিয়া ঝাঁটার এক প্রচণ্ড আঘাত লম্পটটার পিঠে আসিয়া পড়িল। 'পশু'টা লাফাইয়া উঠিল ও হাতের মুঠিটা ছাড়িয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—তাহার মাসীই আগুনের একখানা আঙ্‌রার ন্যায় ঝাঁটা উচাইয়া রহিয়াছে!

দুর্জ্জয় ক্রোধে হোটেলউলীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছিল। রক্তমুখী হইয়া বলিয়া উঠিল, "হারামজাদা! বাধি পেয়েছ তুমি?—ভদ্দরলোকের মেয়ে ছেঁাড়া? শয়তান—" হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পুনশ্চ বৃষ্টির মতই ঝাঁটার আঘাতে লোকটাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতে লাগিল। লম্পটটা পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিরাটকায়া ঐ স্ত্রীলোকটি দুয়ার আট্‌কাইয়া ধরিল—পারিল না।

ইত্যবসরে বাজার হইতে ব্রাহ্মণটি হাঁ-হাঁ করিয়া ফিরিয়া আসিল ও সম্মার্জ্জনীর শব্দটা লক্ষ্য করিয়া দুয়ার-গোড়ায় পা দিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

লোকটিকে দেখিয়াই হোটেলউলী উত্তেজনায় বলিয়া উঠিল, "একটা কুকুর ডাকো ত ঠাকুর, কুকুর! হারামজাদাকে 'ডালকুত্তো'কে দিয়ে খাওয়াবো—"

লোকটি হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, ক্যালফ্যাল করিয়া হোটেলউলীর পানে চাহিতেই সে ঘৃণায় বলিয়া উঠিল, "শূয়ারটা কিনা ভদ্দরলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিতে যায়! কপাটের আওয়াজ না পেতাম যদি—"

চট্‌ করিয়া কদাকার মুখটা বোন্‌পোর দিকে ফিরাইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ করলি যে! অ-ভুয়ার—" বলিয়াই আর-এক ঘা ঝাঁটা কসিল।

মলিনা যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণটিকে দেখিতে পাইয়া যেন তাহার দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "বাবা—" কথাটা উচ্চারণ করিয়াই ঝরাপাতার ন্যায় কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল।

নিমেষে পৃথিবীটাই যেন ব্রাহ্মণটির সম্মুখ হইতে উড়িয়া গেল। পাগলের ন্যায় বাহির হইতেই হাতদু'টা বাড়াইয়া উঠি-পড়ি করিয়া মলিনার কাছে আসিয়া বসিল ও তাহাকে দু'হাতে বেড়িয়া ধরিয়া আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "ভয় কি মা, ভয় কি—"

মলিনা কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ভয় ত নেই, বাবা!" হোটেলউলীর পানে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "ঐ মা আমায় বাঁচিয়েছে!"

ঝরঝর করিয়া মলিনার নয়নপথে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। কিন্তু অকারণে, অযথা, অনর্থক কাঁদিল না বলিয়াই ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস পাইল না। ব্যাপারটা বুঝিবার পূর্ব্বাহ্নেই হোটেলউলীর রণমূর্ত্তি সে দেখিয়াছিল, দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তাহার ক্রিয়াকাণ্ড, তদুপরি বুকফাটা আর্ত্তনাদ দেখিয়া সে জড়পিণ্ডের ন্যায় স্থির, মূক, বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। ঐ-যে-ঐ কদাকার, কর্কশ, ইতর মেয়ে-লোকটা—উঁহার ভিতর অমন এক দুর্লভ রমা-প্রকৃতি যে চাপা থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে গিয়া, তাহারও দুটি চোখই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। একটু পরে হোটেলউলীর পানে তাকাইয়া ভাঙা-গলায় বলিল, "সত্যিই মা লক্ষি, তুমি 'মায়ের' কায করেছ!"

হোটেলউলী তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতিকঠোর গলাটা বাহির করিয়া বলিল, "মা-বাপ বুঝিনে, ঠাকুর! এই বিন্দী-হোটেলউলীকে সহরটার লোক চেনে—সে কেমন! গায়ের হাওয়া লাগলে ধুয়ে ফেলে যারা কে

[illegible]।

"কেমন লোক—মেয়েটা ভদ্দর লোকের, তা কি জানিনে! কত বেটা বউ-ঝি নিয়ে এসে ঘর ভাড়া করেছে—কেউ বলুক দিকিনি বিন্দীর বেচালের কথা!"

হাতের ঝাঁটা দিয়া পথ দেখাইয়া 'বোন-পো'কে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, "একটা নচ্ছার বামুন আছে, রাস্তে থাকে—বুঝলে বাবা? ছোঁড়াটাকে রোজ বলি—গলায় পৈতে পরিস্ তুই বাপু, আসিস্নে—আসিস্নে! কিন্তু বাবা—" শিহরিয়া দু'হাত জড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, "পায়ে ধরতে আসে—বুঝে যেয়ো আক্কেল! তা, কখন আসে, কখন যায়—কৈ খদ্দেরে টের পাক দিকিনি! ঠাকুর মশাই, মানুষের এজ্জত—ঐ বাজার দিয়ে এলো বুঝি! আঃ, বেলা হলো কত—খদ্দেররা আমার সারা হয়ে যাবে গো!" বাহিরে 'ঠাকুরে'র গলার আওয়াজ পাইয়াই বাহির হইয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

তুচ্ছ সূত্র ধরিয়া এক-এক জন লোকের সঙ্গে কি-এক দিনক্ষণে আলাপ হইয়া যায় যে, পথের পথিকও পরমাত্মীয়ের স্থান জুড়িয়া বসে! এই কাণ্ডের পর হইতেই লোকটি স্পষ্টই টের পাইল যে, ঐ মেয়েটির [illegible] ভিতর যত বড়ই রহস্য চাপা থাক্ না কেন, তাহাকে কিন্তু কড়াক্রান্তিতে দেনা-পাওনা চুকাইয়া যাইতে হইবে। আহারাদির পর মলিনাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে বলিল, "বুড়ো হলে নানান দোষ ঘটে, মা! হোটেলে আর মন টিকছে না! চলো ত, মা, তোমার স্বামীর কাছে—আমিও থাকবো'খন কিছুদিন!"

জবাবের অপেক্ষায় সে মলিনার পানে তাকাইল।

মলিনার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল! তাহার অনির্দ্দিষ্ট জীবনের গতি কেমন করিয়া, কি ভাবে, কোন্ প্রথায় কোথায় গিয়া ঠেকিবে

তাহা সে এই কয়েকটা দিনের ভিতর তেমন জোর করিয়া ভাবিতে পারে নাই। হঠাৎ এই স্থনিশ্চিত স্থায়ী পাহাড়টা সম্মুখে রুখিয়া উঁচু হইয়া উঠিতেই তাহার বুক শুকাইয়া গেল। কোথায় যাইবে—কে তাহার স্বামী?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটিবার সে পিতৃ-ভিটার কথা ভাবিতে গেল। কিন্তু যে-পথ তাহার মা সবে সেদিন ছাড়িয়া অনায়াসে তাহারই সম্মুখে নিজেকে বলিদান দিতে পারিয়াছে, সে-পথ আর সে ধরিবে কি করিয়া? অতঃপর, আর-একটা স্থানের কথা মনে পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল, যেন চোখে বিষম ঝাঁঝ লাগিয়াছে।

কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া লোকটি আবার বলিয়া উঠিল, "বল, হ্যাঁ মা?"

মলিনা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বাবা, শুনিছি, এখানে 'বিধবাশ্রম' আছে, সেইখানেই থাকবার জন্যে এসেছিলাম—"

এই রকম যে একটা জবাব পাইবে, তাহা লোকটি পূর্ব হইতেই আঁচ করিয়াছিল। এইবার তাহার মনে পড়িল, হোটেলউলী ত সেদিন এই কথাটারই আভাষ দিয়াছিল। তত্রাপি, মেয়েটির সিঁথির রাঙা রেখাটির পানে একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া বিস্ময়ে কহিল, "ও কি কথা, মা! তুমি যে সধবা!"

"তা হোক, বাবা! ও ছাড়া আর আমার ঠাই নেই!"—মলিনার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

প্রসঙ্গটাকে লঘু করিবার জন্ত লোকটি হাসিয়াই জবাব দিল, "ক্ষ্যাপা মেয়েটাকে নিয়ে আমি হয়েছি অস্থির! হ্যাঁ মা, 'বিধবাশ্রমে' সধবা

মেয়েকে কি নেয়, মা যার কেউ?" পরক্ষণেই অভিমানের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, "ফের যদি ও-কথা মুখে আনবি, আমিও তোর মায়ের মত হবো!"

"একি, পাগল! মলিনার চোখ ফুঁড়িয়া হঠাৎ জল বাহির হইল, বলিল, "বাবা! আমার যে কেউই নেই! নইলে—"

"থাক্, মা! বলবার তোর যাই-ই থাক্—তোকে আর কোন কথা বল্‌তে হবে না!" একটু থামিয়াই লোকটি আবার অতিরিক্ত স্নেহকণ্ঠে বলিল, "স্বামীর অনাদর পেলে মেয়েমানুষ যেখানে গিয়ে রাগ ক'রে থাকে, তুই সেইখানেই থাক্‌বি—আমার বাড়ী চল্!"

লটারীর অর্থপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলে যেমন রাস্তার ভিখারীর মনের অবস্থার বিপর্য্যয় হয়, তেমনিই এই 'আকাশ-বাণী' শুনিয়া মলিনার ভিতর-বাহিরকার রঙ্ ও অনুভূতি পলকে চল্‌কিয়া উঠিল। অবশনেত্রে লোকটির দিকে তাকাইয়া কোনওরূপে মুখের কথা বাহির করিয়া বলিল, "নিয়ে যাবে আমায়?"

লোকটি আরবে মুহূর্ত্তেই জবাব দিল, "না নিয়ে গেলে থাক্‌তে পারবো কি, মা? আমার আর আছে কে? ঘরে একটা ছেলেও নেই, মেয়েও নেই—কার মুখ দেখবো গিয়ে!" একটু থামিয়াই শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "গুছিয়ে নে মা সব—পাঁচটায় ট্রেন! আমি সাম্‌নের দোকান থেকে জোড়া দুই শাড়ী তোর, আর শীতের জামা দুটো কিনে আনি—" বলিয়াই টাকার মোটা থলিটা হইতে গোটাকয়েক টাকা বাহির করিয়া লইয়া থলিটা মলিনার হাতে ফেলিয়া দিয়া হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল—যেন আর তাহার অবসর নাই!

অতঃপর দিবসের পড়ন্ত বেলায়, এক অতিবড় নিরাশ্রয়া, বিশ্বের পায়ে-ঠেলা, সর্ব্বহারা অভাগীকে এক দেবপ্রাণ রাস্তার পথিক আদরে খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মলিনাকে কেন্দ্র করিয়া যে মহা-ইতিহাস হোটেলের প্রেতনিবাসে রচিত হইল, তাহার একটি পাতা, এক অক্ষরও সে গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করে নাই। তাহার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত—দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া সবাই জানিয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পালিত-কন্যা—সবিতা!

: এগারো :

এ দিকে সৌরেশেরও জীবনের এক অভিনব পরিচ্ছেদ খুলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধবাড়ীর হিসাব মিলের সময় যেমন শোকার্ত্তের একটা গরমিল বারবারই হইয়া পড়ে, তেমনি যতই দিন কাটিতে লাগিল, ততই একটা অ-মিল তিল-তিল করিয়া বড় হইয়া সৌরেশের বিক্ষিপ্ত মনটাকে দুর্ভর করিয়া তুলিতে লাগিল। এই কথাটাই অতি কঠিন হইয়া অষ্টপ্রহরই তাহার মনে হইতে লাগিল—কোনও বিদেশী বিগ্রহ বুঝিবা সমাধি-ক্ষেত্রের মাটি-চাপা এক নর-কঙ্কালের উপর গঙ্গাজল ছিটাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রেতাত্মা উহার গালে এক চড় মারিয়া বিতাড়িত করিয়াছে! অনুমানে বুঝিত—বিগ্রহ মলিনা, আর প্রেতাত্মা সে নিজে!

যেমন সকলেরই লাগে, তেমনই মায়ের শোক ও দাদুর ছাড়া-ছাড়ি সৌরেশেরও বুকে প্রথমটা খুব খানিকটা লাগিয়াছিল, এবং সকলের মতই ও-গুলো আবার দুদিন, দুমাস পরে নরমও পড়িয়াছিল। কিন্তু, বুকের একটা চোট্ আর সারিল না, যাহা মলিনার মুখ-চোখ কোন্ দুর্দ্দিনে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। প্রতিক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল—সে বুঝি রত্নাকর, দস্যুবৃত্তি করিয়াছে!

দাদুর কাশী যাইবার পর হইতে সে দাদুর বাড়ীতেই ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর অকারণ ঐ বড়-বাড়ীটার উপর-দালানে বসিয়া অতীত জীবনটার সমালোচনা করিতে গিয়াই মনে-মনে বলিয়া উঠিল—"আঁধার স্তব্ধ, স্তব্ধ আঁধার!" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া তাকাইয়া রহিল—আ

বসিল, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার এদিক-ওদিক চলাফেরা করিল, আবার জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, সুরেন আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, কর্ত্তাবাবুর ঘরে—"

সৌরেশ তন্ময় হইয়া ছিল। কণ্ঠস্বরে কাছে একটা লোকের উপস্থিতি বুঝিয়াই, মুখ ফিরাইয়া বাধা দিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে সুরেন, বাঁশী বাজাচ্ছে কে রে? ঐ রান্নাঘরটার গা ঘেঁষে—"

সুরেন যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা আপাতত স্থগিত রাখিয়া খানিকটা কান পাতিয়া রহিল। অতঃপর সঠিক করিয়াই জবাব দিল, "কৈ দাদাবাবু, কেউ না ত—"

"তাই ত রে!" বলিয়া সৌরেশ নিজেই যে ভুল করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইল।

সুরেন মুখের অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটা পুনশ্চ ধরিয়া বলিল, "কর্ত্তাবাবুর ঘর ত, দাদাবাবু; পিঁপড়েতে বুজে গেছে! আজ নিজের ঘরে শোবেন —বিছানা করবো?"

সৌরেশের হৃৎপিণ্ডকে কে যেন হঠাৎ দোল দিয়া গেল! এইটি সেই ঘর, যে-ঘরে এমনি এক সন্ধ্যায়, এমনি নিরালায়, ফুলের মালা পোড়ানো হইয়াছে! এবার 'দাদু'র বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সৌরেশ এ-ঘরটার চৌকাঠ পার হয় নাই। ভৃত্যকে জবাবের আশায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সৌরেশ বলিল, "না, দালানে বিছানা ক'রে দিস্।"

মনিবের কথার উপর কোন দিনই সুরেন কথা কহে নাই, আজও দ্বিরুক্তি করিল না। নীচে নামিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই সৌরেশ পুনশ্চ তাহার কাছে একটা কথা পাড়িল, বলিল, "সুরেন, সেই-যে-সেই

রান

বামুন-মা—সেই যে যে আমাদের রাঁধুনী—তাদের বাড়ী অনেক দূরে,

দূর রে ?" যেন কথাটা তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছে।

বর্তমান রাঁধুনীর রান্না মনিবের মুখে খারাপ লাগিতেছে অনুমান

করিয়াই সুরেন বলিল, "না, দাদাবাবু, বেশী দূরে নয়—এই কোশ তিন-

চার! তা—" একটু দমিয়া বলিল, "তা, ওরা ত গাঁয়ে নেই, দাদাবাবু,

যে খবর দেব—"

চাকরটা হয় ত কি মনে করিতে কি মনে করিয়াছে, এই লজ্জায় স্বীয় উক্তিটা সাফাই করিয়া সৌরেশ বলিল, "খবর দিবি কেন—তা ত দরকার নেই!"

মনিবের মুখ দিয়া 'বামুন-মা'র রান্নার যে সুখ্যাতি উঠিত, তাহা সুরেনের অগোচর ছিল না। সুতরাং সেই নজিরটা সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "বামুন-মার রান্না যে ভাল, দাদাবাবু! আর এ মাগীর—"

সৌরেশ তাড়াতাড়ি সুরেনকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "দূর পাগ্‌লা! কারুর অখ্যাতি তুল্‌তে আছে—ছিঃ!"

একটু পরেই আবার বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা! তারা গাঁয়ে নেই ত যাবে কোথা? তুই ঠিক জানিসনে।"

"সত্যি বলছি, দাদাবাবু। এই পরশু না করে, ওদের গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সে বললে—এখান থেকে সেই বেরিয়ে তারা আর গাঁয়েই ঢোকেনি।" বলিয়া সুরেন 'দাদাবাবু'র পানে সগর্বে তাকাইল, যেন কোনও উকীল তার হাতের মাম্‌লায় অকাট্য প্রমাণ দিয়া হাকিমকে তটস্থ করিয়াছে।

বাস্তবিকই তাই! সৌরেশের মনের উপর বিস্ময়ের ছায়া পড়িল। ক্ষণপরে মনের আসল প্রকৃতি চাপিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে! বাড়ীই গেছে! লোকটা তোকে নাচিয়েছে—বুঝলি সুরেন?"

কিন্তু সুরেন এমন কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইল না যে, মেয়েটা তাহাকে বাবলা নাচাইতে পারে। মনিবের কথাটা কেবল শিরা অবিলম্বেই কহিল, "যাইছি, দাদাবাবু! আমি ঘুরে-ঘুরে জিজ্ঞেস করেছি। আর সে-লোকটা বামুনের ছেলে!" অতঃপর এক-প্রগাঢ় চিন্তার ডুব দিয়াই আবার বলিল, "হয় ত এই হবে—আর কোথাও খাটতে গেছে! দাদাবাবু, পেট চালাতে হবে ত—তারা গরীব লোক!"

তদ্দণ্ডেই কে যেন সৌরেশের কানের গোড়ায় অধকণ্ঠে বলিয়া গেল —'আর, তুমি বড়লোক। বড়লোক বলেই গরীবের মেয়েকে এঁটো করতে পার! শেষে দাম দাও—দশ টাকা!'!

সৌরেশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাহার হৃদয়ের চলন্ত অনুভূতির সমস্তই স্তরে-স্তরে স্থির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সুরেন, আনতে পারবি খুঁজে—পারবি?"

যে মুখ দিয়া এই প্রশ্ন বাহির হইল, তাহার পানে সুরেন চমকিয়া তাকাইল, দেখিল উপহাসের কোনও চিহ্ন নাই। সুতরাং ওই মূর্খ ভৃত্যটা এইটুকু ভাবিতে গিয়া অবাক হইয়া গেল যে, মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোক দুটিকে অ-দরকারী বলিয়া মনিব ঘোষণা করিল, আবার উহাদিগকেই এত শীঘ্র দরকারী বলিয়া তাঁহার আগ্রহ হইল কেন? অতঃপর পুরাতন ইতিহাসের মত খামখেয়ালী মনিব বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, হঠাৎ তাহাই মনে পড়িতে সুরেন ব্যস্ত হইয়া জবাব দিল, "কেন পারবো না, দাদাবাবু—"

"পারা চাই-ই।"

সুরেনের বুকটা উড়িয়া গেল। বাস্তবিকই 'দাদাবাবু' যে ঐ নারী-দু'টাকে হঠাৎ চাহিয়া বসিবে তাহা সে ভাবে নাই। তাই বলিয়াই অমন করিয়া সে একটা শক্তিহীন বাক্যে জোর দিয়াছিল। তারই

পরিণাম কি এই ? [illegible] সে ত [illegible] জানে। এ-যাবৎ উহারা ভাই—বন্ধু ? অথচ, মনিবের এতটুকু কঠিন [illegible] কখনো দেখায় নাই। খেয়ালী বাবুর বালক-জীবনে [illegible] ছিলেন তাহার পরিচিত ছিল না, তত্রাচ এই মনিবেরই স্বতন্ত্র ভৃত্যরূপে এই বাড়ীতে আসিয়াও এ পর্য্যন্ত কোনও দিন ইহার এতটুকু কঠিন আদেশ সে পায় নাই। তাই বুঝিবা, অতীত কালের সঠিক সত্যটা এতকাল ধরিয়া কল্পনার দোলায় দোল্ দিতে-দিতে যখন এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেকার বর্ত্তমানে উহার বিষম স্বরূপ-মূর্ত্তি সুরেন দেখিতে পাইল, তখন আতঙ্কে তাহার চাকরীগত ছোট বুকটা জমিয়া বরফ হইয়াই গেল। কিয়ৎক্ষণ জড়ের ন্যায় নতমস্তকে অর্থহীন উদ্দেশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই সর্ব্বনেশে স্ত্রীলোক-দু'টার সন্ধান করিবার সম্ভব-অসম্ভব হরেক প্রকারের বিচার-বুদ্ধির সংস্থান করিতে-করিতে সে নীচে নামিয়া গেল। সৌরেশ তখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রভাত হইতেই চতুর্দ্দিকে প্রকাশ্য ও গুপ্ত—সুরেনের নিয়োজিত মেয়ে-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই—চর ঐ দুর্লভ নারী দু'টির অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু, বামুন-মার আশ্রয়টা বাদ দিয়াও মলিনা যে-আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার রূপ-রস-গন্ধ কেহই ঘুণাক্ষরে টের পাইল না। পরিশেষে, তাহারা একান্ত হতাশ হইয়া সৌরেশকে তাহাদের ব্যর্থ-প্রয়াসের প্রবল কাহিনী একে-একে নিবেদন করিল।

ঘরে আগুন লাগুক, মানুষের সহ্য হয়। মা-বাপ মরিলেও মানুষ সহিয়া যায়, সহিতে পারে। যাহাকে অন্তরের অন্তর বলিয়া মানুষ আপনাকে ধন্য মনে করে, সেই স্নেহপিণ্ড, যাহার বাড়া নাই, সন্তানেরও গুরু অকল্যাণ হইলে মানুষ আবার হাসে, আবার লোকালয়ে মিশিয়া যায়। কিন্তু, একটা রহস্য আছে, যাহার মৃত্যু দূরে থাকুক, ঈষন্মাত্র

বিশ্বের মানুষের ইহজন্মটার ছাই পড়ে, যাহার [illegible] কামনা করে। সে তাহার উপমা নারী—প্রেমিকা। এত দিন [illegible] [illegible] বিবাহ সৌরেশ তাহার অবসর-অন্তরকে এক একবার [illegible] আনিয়াছিল, কিন্তু মানুষ-যায় নাম করিয়া [illegible] সে [illegible] পাওয়া গেল না—এই সংবাদের শেষ [illegible] হইতেই তাহার নব-জীবন দুর্ব্বল, দুর্ব্বহ, দুর্ভর হইয়া উঠিল।

যখন জীবনটাকে চালাইবার মত আর কোনও [illegible] রহিল না, তখন—সেই সময় সৌরেশের জমিদারীর একজন নায়েবের নিকট হইতে একখানা চিঠি আসিল এই মর্ম্মে যে, তথায় 'অজন্মা' হইয়াছে, প্রজারা এ বৎসর খাজনা-পত্র দিতে পারিবে না। চিঠিখানা পড়িয়াই তাহার খেয়াল হইল যে, সে নিজেই গিয়া বিলি-বন্দোবস্ত করিবে, কেন না, সে একটা কায চাহে, যদিই বা তাহার রিক্ত জীবনকে এতটুকুও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে!

অতঃপর একদিন এ বাড়ীটার ভার-ভাবনা সুরেনের হাতে অর্পণ করিয়া সৌরেশ জমিদারী ভ্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিল। যে মহলে গিয়া উঠিল, তাহার অনতিদূরেই পদ্মা, যাহার জল-হাওয়া নাকি ভারি অশান্ত—মানুষকে দিশেহারা করিয়া অথবা মাতাইয়া দেয়!

বাড়ীর লোকেরা সাজাইয়া দেয় বলিয়াই বোধ করি-বা বর কোঁচার মুখে 'ফুল' ফোটাইয়া, চন্দনের টিপ পরিয়া বিবাহ করিতে যায়, নতুবা 'জেলের আসামী' কোদাল ঘাড়ে করিয়া যে পাল্কীতে উঠিত না, এ কথা কে বলিতে পারে। তদ্রূপ বলিয়া-কহিয়া মানাইয়া পাঠাইবার কেহ ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা অনভ্যস্ত বলিয়াই হউক, সৌরেশ কোনও আড়ম্বর করে নাই, অথবা লোকলস্করও সঙ্গে লয় নাই। এমন কি, যাওয়ার সম্বন্ধে মহলে একটা সংবাদও পাঠাইবার প্রয়োজন বুঝে নাই।

ট্রেন হইতে যখন নামিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্টেশনে ভাড়াটিয়া গাড়ী-ঘোড়া বিস্তরই ছিল, কিন্তু, সে-দিকে সে দৃষ্টিপাত করিল না। একটা কুলীকে সঙ্গে লইয়া 'কাছারী-বাড়ী'র উদ্দেশে সে হাঁটিতে সুরু করিল।

জায়গাটা সহরতলী গোছের—রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তবে, ক্ষণপূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার স্থানে-স্থানে কাদা হইয়াছে। বৃষ্টির বিরাম হইলেও আকাশে মেঘ-বিদ্যুতের ছুটী তখনও হয় নাই। উপরন্তু, প্রকৃতির আবভাব, হাসি-ঠাট্টার রেশ এমনি করিয়াই বর্ব্বর পৃথিবীকে বুঝাইয়া দিতেছিল যে, উপরে আসন্ন ঘনবাদলের আবার প্রবল আয়োজন চলিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বাগানের মত একটা জায়গার মুখে পড়িতেই সৌরেশ পথিপ্রদর্শক লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি রে—বন?"

"না বাবু, জমিদারের বাগান—চলেন, চলেন, জল আসছে!"—লোকটা সৌরেশকে জোর তাগাদা দিল।

সৌরেশ আকাশের দিকে তাকাইয়াই পায়ে অধিকতর জোর দিল। কিন্তু গাছপালার অন্ধকার ও জলকাদা উভয়ে মিলিয়া তাহার গতিটাকে পদে-পদে প্রতিহত করিতেই লাগিল। পা-কতক সৌরেশ অগ্রসর হইয়াছে, লোকটা তাড়াতাড়ি কি-একটা কথা বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা এতই টানা, জড়ানো ও দুর্ব্বোধ্য যে, আগেকার লোকটি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না, এবং যেমন পা বাড়াইল, অমনি সদ্য জল-ভরা এক খালে টক্কর খাইয়া পড়িয়া গেল। লোকটা পিছনে ছিল, তাড়াতাড়ি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হিঁচড়িয়া সৌরেশকে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "দুর্ কালার বাবু! কইলাম কি—"

অনুযোগ করিবার কিছুই ছিল না। অতীত জীবনের কোন এক সময়ে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে সৌরেশ কি করিত, বলা যায় না; কিন্তু আজ

আর্দ্র পরিচ্ছদ ও এক-অঙ্গ জল লইয়াই লোকটির ইঙ্গিত অনুসারে একটু বেঁকিয়া অপর রাস্তায় পড়িয়া আবার চলিতে লাগিল। এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়া প্রায় মাইলখানেক আসিয়া একটা বাগানবাড়ীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া লোকটি গলা চাপিয়া বলিল, "এই কাছারী, বাবু!"

"অর্থাৎ—বড়লোকের অহংকার!"—হঠাৎ সৌরেশের বুকে আঘাত পড়িল।

মিনিটখানেক অকারণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লোকটিকে বিদায় দিল ও অন্ধকারের বুক চিরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যেমন কাছারী-বাড়ীতে ঢুকিবে, এক কর্কশকণ্ঠে আওয়াজ হইল—"জুতো মারবো, আর আবার করবো!"

সৌরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, অনুমানে বুঝিল—নায়েব মশাই।

ভিতরে আর একজন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "যা পেয়েছি, যোগাড় করেছি—ঘটী-বাটি বেচে! হুজুর, খেতেই পাচ্ছিনে!"

"আব্বার! মহলের বিল্‌কুল আদায় হলো, আর উনি আমার পুষ্যিপুত্তুর!—পরিবার বেচবি—পরিবার!"

"হুজুর আপ্‌নি মা বাপ্—"

"এই, কে আছিস্! বেটাকে বাঁধ্—"

আর অপেক্ষা করিল না। সৌরেশ এইবার জোরপদে ভিতরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চোখে পড়িল—নায়েবমহাশয় এক আরাম কেদারায় শুইয়া আছে, দুই জন যমাকৃতি পশ্চিমবাসী পদসেবা করিতেছে ও ঠিক পদতলে করযোড়ে দাঁড়াইয়া—আর একজন।

সম্মুখে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন আতঙ্কে চমকিয়া উঠে, তেমনি নায়েব মহাশয় চম্‌কিয়া উঠিয়া ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিহ্বল বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বাবু, আপনি!" বলিতে-বলিতে

নমস্কার করিয়া মনিবকে আগে রাখিয়া পথ দেখাইয়া ভিতরের একটি ঘরে লইয়া গেল। যাইতে-যাইতে দণ্ডায়মান লোকটিকে ইঙ্গিত করিল—সে যেন বিদায় গ্রহণ করে।

ভিতরে গিয়া নায়েব মহাশয় যেন মাথামুড় খুঁড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আসছেন, তা একটা খবর দিতে নেই, বাবু? পাল্কী পাঠাতাম—ও কি! জামা-কাপড় যে ভিজে!" তাহার চোখমুখ যেন কপালে উঠিয়া পড়িল।

সৌরেশ একটু আসক্তিহীন হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ! একখানা কাপড়—"

"দিচ্ছি! কিন্তু, বাবু, একটা কাকের মুখেও খবর পাঠাতে হয়—কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া নায়েব মহাশয় যেন উঠি-পড়ি করিয়া কক্ষান্তরে গেল ও অবিলম্বেই একখানা কাপড় আনিয়া 'বাবু'র হাতে দিল।

সৌরেশ কাপড়খানাকে হাতে করিয়াই বলিল, "এ কি আন্‌লেন—জরিপেড়ে মিহি? একখানা মোটাসোটা মিলের নেই?" নিজের পরনের কাপড়খানা দেখাইয়া বলিল, "দেখছেন?"

নায়েব মহাশয় চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! আপনি খদ্দর পরেন—চটু?"

সৌরেশ সহাস্যে বলিল, "কেন, আমি মানুষ নই দেশের?"

নায়েব মহাশয় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, তা নয়—"

"তবে, বড়লোক ব'লে?"—সৌরেশ হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বড়লোক আমি এইখানে! রাস্তায় নাম্‌লেই—দশ জনের একজন, অর্থাৎ গরীব!" বলিয়া কাপড়খানা প্রত্যর্পণ করিল।

নায়েব মহাশয় অগত্যা আর একখানি মিলের কাপড় আনিয়া দিল।

মনিবের এই আকস্মিক আবির্ভাবে নায়েব মহাশয় বেশ-একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল, তদুপরি যাহা বড়লোক-সমাজের নীতি-বিরুদ্ধ তদ্রূপ মনিবের সেই আচরণ দেখিয়া সে দমিয়া গেল। মানব-প্রকৃতি সে চুক্তি করিয়াই বুঝিত, বুঝিত—বড়লোকের ছেলে সৌখীন না হইলে তাহাকে দাবিয়া রাখা যায় না—তত্রাপি সে আশা ছাড়িল না, মন যোগাইয়া বলিল, "যা বলেছেন! অনেক বড়লোকের ছেলে ত আজকাল [illegible] খদ্দর পরে!"

সৌরেশ বলিল, "সখ ক'রে?—না। আমার মনে হয়, তাঁরা একটা সুযোগ পেয়েছেন, গরীব সমাজে ওঠবার। মনে হয় আমার, তাঁদের অনুভূতি হয়েছে—'বড়লোক' থেকে সুখ নেই, কেন না, 'বড়লোক' বিশ্বের খণ্ড মানুষ! পৃথিবীর রস-রক্ত থেকে এঁরা পৃথক, এঁরা স্পষ্টই বুঝেছেন—অহঙ্কারবাদ রেখে 'বড়লোক' হওয়া যায় না, যে-অহঙ্কার মানুষের ঐহিক দণ্ড! এঁদের আজ বারবার করেই মনে হচ্ছে—পৃথিবী গরীবের, চন্দ্র-সূর্য্য গরীবের, আলো-বাতাস গরীবের! এঁদের কিছুই নেই, অপর পক্ষ সমস্তই অধিকার ক'রে ব'সে আছে—যা অর্থের জোরে, দৈহিক সামর্থ্যে কেড়ে নেবার নয়! তাই, বড়লোকের ছেলে আজ দরিদ্রের সাজ ধরেছে—সে গরীব মহলকে চরিতার্থ করতে নয়, নিজেকে—নিজের বংশকে মুক্তি দিতে!"

প্রসঙ্গটা বাড়াইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি বুঝি-বা নায়েব মহাশয়ের ছিল না, তাই সে ও-কথায় আর সায় না দিয়া দেশের জল-হাওয়ার কথা তুলিল। অতঃপর হঠাৎ রাত বাড়িয়াছে টের পাইয়া তাড়াতাড়ি মনিবের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। বৃক্ষ-বাটিকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরম্য একটি কক্ষে শয্যা রচনা করাইয়া দিয়া রাত্রিকার মত সে বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই, সৌরেশ নায়েব মহাশয়কে বলিল—সে একটু বেড়াইয়া আসিবে।

নায়েব মহাশয় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ?"

সৌরেশ জবাব দিল, "এই ধরুন—এই গ্রামের এধার-ওধার, পারি যদি—কাছে-পিঠে অন্য কোন গ্রামে।"

নায়েব মহাশয় বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু, এ সবই যে আপনার মহল!"

সৌরেশ আগ্রহে প্রত্যুত্তর করিল, "বেশ ত!"

নায়েব মহাশয় সবিনয়ে কথা কাটিয়া বলিল, "তা কি হয়, বাবু! আপনি জমিদার—আপনার কি এমনি যাওয়া হয়? যাবেন বৈ কি, আপনার মহল—আপনি যাবেন না? তবে আর দুটো দিন সবুর করুন—খবর করি আগে! কিন্তু, বাবু, এবার যে বড্ডো অ-সময়! প্রজারা কি 'নজর' দিতে পারবে? পারবে না—ঘোর অজন্মা!"

চকিতে, বিগত-সন্ধ্যায় প্রবেশ-কালীন সেই দৃশ্যটা সৌরেশের মনে পড়িয়া গেল। ভাবিল—'ঐ কি অজন্মার রূপ?—এক পক্ষ দুর্জ্জয়, অপর পক্ষ নিস্তেজ? এক পক্ষ সেবার ও ভোগের অঙ্কে বসিয়া কশাঘাত করিবে, অপর পক্ষ একনিষ্ঠ হইয়া উহাই সহ্য করিবে? ইহাদেরই মধ্যখানে যে পরিমাণ-বিহীন ক্ষেত্র, উহাই কি অজন্মার প্রতীক?'

অচিরাৎ তাহার ভিতর হইতে কে যেন কঠিন-কণ্ঠে জবাব দিল—'নিশ্চয়! এ প্রথা, এ নিয়ম—সবলের, এ অভিযান শাশ্বত, সনাতন! যুগে-যুগে ইহারই প্রচলন হইয়া আসিতেছে, নতুবা প্রতারকের ঠাঁই হইত না। সবলের প্রতি কাযে, প্রতি আচারে, প্রতি নিশ্বাসে একই ঐ প্রতীক সহস্র মূর্ত্তি ধরিতেছে! তাই বলিয়াই ঈশ্বরের একই প্রতিপ্রকৃতি—একজন প্রতারক লোকালয়ের উচ্চসমাজে আসন পাতিয়াছে,—আর

একটি স্বচ্ছ প্রতিমা ঠকিয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে!—সে আর মলিনা!'

মনিবকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, নায়েব মহাশয় সাহস পাইল। বলিল, "নজরই হচ্ছে জমিদারের মান!"

"অর্থাৎ—"

নায়েব মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জমিদার-দর্শন প্রজার ভাগ্যের কথা। যদিই বা বরাতে ঘটে, তখন সোনা-রূপো দিয়ে দেখতে হয়, টাকা কি মোহর!"

সৌরেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তা হ'লে জমিদার এক অপূর্ব্ব জানোয়ার বলুন—টিকিট ক'রে দেখতে হয়!" পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা নয়, নায়েব মশাই! 'নজর' মানে অর্থ দিয়ে 'মানুষ' দেখবে—এ নয়! ধরলাম—প্রজায় 'নজর' দেয়। কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে—তারা দয়া ক'রে দর্শন দেয়। কেন জানেন, ওরা আন্তরিক আমাদের ঘৃণা করে—আমরা নাকি শত্রু!"

নায়েব মহাশয় বুঝিল, তর্ক করা বৃথা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে চলুন, আমিও সঙ্গে যাই—"

"দরকার হবে না!"

"পাইক—"

"কিছু না—"

সৌরেশ আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঃ বারো ঃ

দূরের মহল হইলে স্বভাবত যাহা ঘটিয়া থাকে, এ মহলেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। আদায় যথেষ্টই ছিল, কিন্তু অর্দ্ধেকটাও সদর-খাতায় জমা হইত কি না, সন্দেহ। সর্ব্বজ্ঞ 'দাদু' এ সমস্ত যে টের পাইতেন না, এমন নহে, তবে তিনি এটাও বুঝিতেন যে, মহলে গিয়া দু'মাস ছ'মাস বসিয়া না থাকিলে নিক্তির মাপে আদায় 'জমিদারী খাজনা'য় ঢোকে না। কিন্তু, বাড়ী ছাড়িয়া এক পাও তাঁহার নড়িবার যো ছিল না। আর একটা দিক দেখিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন যে, শ্রদ্ধায় দত্ত এই আধা-আধি আদায়ও শতকরা একটাকা হারে তাঁহার মূলধনের সুদ যোগাইতেছে। তেজারতিটাই তিনি ভাল বুঝিতেন। সুতরাং নায়েব, গোমস্তারাও এতদিন ধরিয়া নির্ব্বিবাদে একরোখা কারবার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, আজ হঠাৎ এই নূতন মনিবের সৃষ্টিছাড়া সর্ব্বনেশে কাণ্ড দেখিয়া নায়েব মশায়ের মন ভীষণ দমিয়া গেল।

সৌরেশ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন চরাচরে মধ্যাহ্নের রৌদ্র নামিয়াছে। একান্ত আশ্রিতের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া কি ছোপ তাহার মনে লাগিয়াছিল, কে জানে! কিন্তু, তাহার বহিঃপ্রকৃতির কোন রঙ বদলায় নাই; নায়েব মহাশয় এতক্ষণ ধরিয়া উৎকণ্ঠায় ঘরবাহির করিতেছিল, এক্ষণে মনিবের এক অতি-সৌম্য-মূর্ত্তি দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

পরদিন অপরাহ্ণে নায়েব মহাশয় 'সেরেস্তা'য় বসিয়া দুর্ব্বোধ্য নথি-পত্র দেখিতেছিল ও সৌরেশ পাশের ঘরেই বিশ্রাম করিতেছিল, এমন

সময়ে জন পঁচিশেক লোক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নায়েব মহাশয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—তাহারা সকলেই ভদ্রশ্রেণীর।

নায়েব মহাশয় চশমা খুলিয়া তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাপু, তোমাদের?"

লোকগুলি নিবেদন করিল, "হুজুর, আমাদের খাজনাটা—"

নায়েব মহাশয় পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কোন্ গ্রামের তোমরা?"

"আজ্ঞে, দেব-বাটীর।"

"দেবে তোমরা খাজনা?"

"যোগাড় করলাম বৈ কি, হুজুর, জমি বাঁধা দিয়ে। নইলে সেরেস্তার যে হুকুম, নালিশ হবে!"

নায়েব মহাশয় তাচ্ছীল্যভাবে প্রত্যুত্তর করিল, "বটেই ত। সেরেস্তা ত আর দান-সত্র খুলে বসে নি!—তা, এখানে কেন, গোমস্তা মশায়ের কাছে যাও।"

লোকগুলি সভয়ে বলিল, "হুজুর, তিনি সুদ ধরেছেন। হাল সনের সুদ!"

নায়েব মহাশয় মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিয়া উঠিল, "খেলাপি করলে কেন?"

লোকগুলি কাতরকণ্ঠে জবাব দিল, "আজ্ঞে, পেটের ভাতই যোগাতে পারছিনে। ফসল হয় নি যে বেচে দেব। টাকাকড়ি যোগাড় করতে, হুজুর, মাসখানেক যা দেরি হয়েছে!"

নায়েব মহাশয় অধিকতর ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "পেটের ভাত দু'দিন দেরি ক'রে খেতে পারো? যাও—সুদ না দিতে পারো, আদালতে গিয়ে জবাব দিয়ো! এ মামার বাড়ী নয় যে আবদার চলবে—"

"চলবে বৈ কি, নায়েব মশাই—" বলিতে-বলিতে সৌরেশ হাসিমুখে

প্রবেশ করিল। লোকগুলিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল, "আপনারা বসুন। বসুন না! মানুষের বিচারে ভুলচুক হয়ই, যেমনই নায়েব মশায়েরও হয়েছিল—এঁকে অপরাধী করবেন না!" অতঃপর নায়েব মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন, মানুষ ক'রে বাপ-মা ছেলেকে ছেড়ে দেয়, ছেলে উপায় করে—বাপ-মাকে এনে দেয়, কিন্তু হঠাৎ যদি এক দিন তার উপার্জ্জন বন্ধ হয়, তবে বাপ-মাকেই তার দুঃখ সইতে হয়। তেমনি প্রজাও জমিদারের উপযুক্ত সন্তান! জমিদার জমি দিয়ে তার জীবিকার ঠাঁই ক'রে দেয়, 'কর' যা গ্রহণ করে—তা প্রজার উপায়ের যৌতুক! এবং যদিই বা কোন-বার ফসল না হয়, সেবার প্রজার অভাব জমিদার নেবে না?"

এই ধীরমূর্ত্তি ছেলেটিকে দেখিয়া লোকগুলির প্রথমেই চমক লাগিয়া-ছিল, যেন শীতের দিনে বাদলের ফাঁকে তাহাদের গায়ে অকস্মাৎ খানিক রোদ পড়িয়াছে। অতঃপর, তাহার এই দেব-বাণী শুনিয়া উহারা যুগপৎ বিস্ময়ে ও উল্লাসে বিহ্বল হইয়া পড়িল—তাহাদের মুখ-চোখ ভুঁড়িয়া যেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছেলেটির দিকে ধারা বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু নায়েব মহাশয় অন্তদিকে হাঁটিতেছিল। স্পষ্টই সে ধরিয়া ফেলিল—ছেলেটা লক্ষ্মীছাড়া, সর্ব্বস্বান্ত হইবে! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে এদের সুদটা মাপ করলেন?"

সৌরেশ সহাস্যে জবাব দিল, "শুধু সুদ! এ সনের খাজনা-পত্রও।"

নায়েব মহাশয় মূঢ়ের ন্যায় খানিক মনিবের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে কলেক্টারীর টাকা? সেরেস্তার লোকসান হবে ত।"

"হোক্ না! লোকসান ছাড়া ব্যবসার সার্থক হয় না। জোর ক'রে লোকসান পূরণ করলে প্রকৃতির আইন ভাঙা হয়। আমার লোকসান,

অপরের লাভ—যা প্রকৃতির কাছে, নিয়মের কাছে তার প্রাপ্য। কিন্তু ছিনিয়ে যদি তার লাভটা আমি নিই, তা হ'লে প্রকৃতির কাছে, নিয়মের কাছে পাপ করা হয়, এবং এই পাপের দণ্ড আর এক দিক দিয়ে আসে, এম্‌নিভাবে যে, আমরা তখন বুঝতেই পারিনে—কেন।" সৌরেশ একটু থামিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "ভাবছেন, ওদের জিত্ হলো। কিন্তু, তা নয়—জিত আমারই, কেন না হারতে পেরেছি।"

আইন-কানুন কণ্ঠস্থ বলিয়া নায়েব মহাশয়ের সুনাম আছে। কহিল, "আইনে ওরা কিন্তু বাধ্য! ফসল হোক্-না-হোক, রাজকর আইনে রেহাই হয় না!"

সৌরেশের মুখে হাসি লাগিয়াই ছিল, বলিল, "হতো বৈ কি কেবল—যদি এম্‌নি নিরন্ন প্রজার হাতে আইন গ'ড়ে উঠতো। কিন্তু, আইন যারা করেন, তাঁরা হয় দরে জমিদারের মত, নয় এদের চেয়েও বড়। সুতরাং ওঁদের দরদ এদের অ-দিনের দিক্‌টায় পড়ে না!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "কিন্তু, সত্যিকার আইনে জমিদারের কর দিতে প্রজা বাধ্য নয় অজন্মার বছরে। স্বীকার করি, জমির ওপরই 'রাজকর,' কিন্তু তার অর্থ কি? জমির মাটির ওপর, না, জমির ফসলের ওপর? টাকায় মাটির মান কেউ রাখে না, রাখে তার ওপর ভোগের। সুতরাং জমি পতিত থাকলে খাঁটি আইনে, 'কর'ও পতিত্ হয়।"

নায়েব মহাশয় বুঝিল, তর্ক করা বৃথা। বলিল, "আপনি মালিক—আপনার যা হুকুম!"

"আর একটা!—অনুসন্ধানে জেনেছি, খাজনা অনেকেই দিয়েছে। সমস্ত ফেরৎ দিন—পারেন ত, আজই! আমার জমিদারীর আইন—আমার!" একটু থামিয়া সৌরেশ তাহার উক্তিটা শেষ করিল,—"কিছু বলবেন?"

নায়েব মহাশয়ের মুখখানা চূণ হইয়া গেল। মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে না—কি আর! তবে, বাবু, একবার ঢিল দিলেন, বারম্বার ওরা ঐ রকমই করবে—ফসল হলেও!"

সৌরেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না। পৃথিবীর নিয়ম এই যে—অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগ রাখতে হয়, রাখলে কোন-কিছু ভেস্তা হয় না। নইলে, বিশ্বপ্রকৃতির সাজ নষ্ট হয়, অর্থাৎ একের বিরুদ্ধে অপরের বিকৃতি ঘটে।" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "আমি যদি এদের অ-দিনে মুক্তি দিই, সু-দিনে ওরা নিজেরাই ধরা দেবে—না দিয়ে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর যত নালিশ, যত অশান্তি, যত বিদ্রোহ প্রবলের তরফ থেকেই ওঠে—দুর্ব্বলের তরফ থেকে নয়!" বলিয়া ও-ঘরে ফিরিয়া যাইতে সে উদ্যত হইল।

লোকগুলি এতক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে ঐ ছেলেটির দিকে তাকাইয়া ছিল, এবং বুঝি-বুঝি করিতেছিল—উনিই বুঝি-বা স্বয়ং জমিদার। এইবার নিঃসংশয় হইল, এবং সকলেই একসঙ্গে অগ্রসর হইয়া ভক্তিবিহ্বল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হুজুর! আপনি আমাদের মা-বাপ—" বলিয়া সৌরেশের পায়ের গোড়ায় ভাঙিয়া পড়িল।

যে লোকটি ঠিক সম্মুখেই ছিল, সৌরেশ খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "করেন কি! আমি যে আপনাদের ভাই!" বলিয়া যেন অতিরিক্ত রাগ করিয়াছে, এমনই ভাব দেখাইয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

*   *   *   *

তারপর বারোটা বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সৌরেশ আর দেশে ফিরে নাই, এবং সেই-যে-এক অতীত-দিবসের কি-এক ক্ষণে দেশের যা-কিছু—সমস্তর দায়িত্ব সুরেনের উপর অর্পণ করিয়াছিল, সে ঠিক

তেমনই আছে। সুরেন অনেকবার অনেক রোদন আনিয়া ‘দাদাবাবু’কে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু ‘দাদাবাবু’ সে-রোদনের কোন মূল্যই দেয় নাই। সে এই সুদীর্ঘ দিন, মাস, বৎসর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন মহলে বাস করিয়া কাটাইয়া [illegible] প্রজার সুখ-দুঃখে মিশাইয়া, যেন তাহার ঐহিক-জীবনে এ ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। যেমন কোনও ভাগ্যহীন নর দৈন্যের আকস্মিক আঘাত খাইয়া স্বীয় সজ্জিত গৃহ পশ্চাতে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনে গোপনে দূর-প্রবাসে চলিয়া যায়, এবং একদিন তেমনিই করিয়া আবার হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া দেখে—উপেক্ষিত সংসারে দুর্দ্দশার আর আদি-অন্ত নাই, সেই সময় সে যেমন মরীয়া হইয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহ-নারীকে সম্পদে সাজাইয়া, মানাইয়া, মাতাইয়া তোলে, ঠিক তেমনিই সৌরেশ যে-মহলের যে-লোকালয়ে প্রথম পা দিয়াছে, প্রাণপণে উহাকে সাজাইয়া নিখুঁত করিয়া আসিয়াছে, কোথাও ত্রুটি রাখে [illegible] করে নাই—যেন প্রত্যেকের এক নারীরূপ আছে, যে-রূপে [illegible] আলো নাই—যার পরিধানে জীর্ণবস্ত্র, উদর-পূর্ত্তির জন্য স্বীয় [illegible] ঠেলিয়া রাখিয়া পরের বাড়ীতে খাটিতে আসিয়াছে, যেন-বা কোথায় সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, কলঙ্কে কবে তাহার মুখ পুড়িয়াছে—তাহাকেই সে সর্ব্বস্ব দিয়া, জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ডাকিবে—‘তুমি এস!’ অতঃপর, যেমন দেবাদিদেব হিমালয়ের প্রস্তর-গাত্রে চোখ রাখিয়া কঠোর সাধনায় বসিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবীকে সম্মুখে হঠাৎ আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, তেমনিই সৌরেশও যেন এক যুগ স্তবে বসিয়া অকস্মাৎ আজ যাহাকে অবলোকন করিল, সে—মলিনা!

ঃ তের ঃ

স্বপ্নের প্রতিমা দেখা দিয়াছে।

সৌরেশের হাতের কায বন্ধ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সবিতার দরখাস্তের কোন মীমাংসাই হইল না। দুই জনেই নিঃশব্দে বসিয়া—সৌরেশ ও সবিতা।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সৌরেশের খাসভৃত্য আলো লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়াই সৌরেশের চমক ভাঙিল। বলিল, "নিমাই—না, আচ্ছা—"

নিমাই টেবলের উপর আলোটা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ, দেখ্—না থাক্।"

নিমাই চলিয়া যাইতেই সৌরেশ আবার ডাকিল, "শোন্ না"

একজোড়া চোখ, সহসা যেন এক কৌতুকের ঠোকা খাইয়া [illegible]র সৌরেশের মুখের দিকে উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

নিমাই আবার ফিরিয়া আসিল। সৌরেশ কহিল, "দেখ্—নাস' থাকবার বাড়ীর ওপরতলার ঘরটা পরিষ্কার আছে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আচ্ছা। হ্যাঁ, আর একটা কথা—আমার ঝি আর ঠাকুরকে ওখানে আজ যেতে ব'লে আয়—" সৌরেশ সবিতার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "এঁর জন্যে। শুনতে পেয়েছিস্?"

কিন্তু, বড় বেশী করিয়া শুনিল আর এক জন। সবিতা বলিয়া উঠিল, "হঠাৎ! দরখাস্ত আমারি মঞ্জুর?" যেন কতই না সপ্রতিভ, সঙ্কোচের আর লেশ মাত্রও নাই!

সৌরেশ এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। নিমাইকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়িয়ে রইলি?"

নিমাই খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, "তা হ'লে—আজ্ঞে, তা হ'লে আপনার খাবার-টাবার?"

সৌরেশ এবার অকারণ রাগিয়া উঠিল, বলিল, "গাধা কোথাকার! যে করে, সেই করবে—ঠাকুর!"

"তাকে ত ওখানে যেতে বল্‌ছেন—"

"হলেই বা! একসঙ্গে খাবার তৈরী হবে—এঁর আর আমার।"

"বুঝেছি—" বলিয়া নিমাই চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, সৌরেশ আবার হাঁক দিল,—"শোন্। তারপর এঁকে ওখানে নিয়ে যাবি।"

"আচ্ছা—" বলিয়া নিমাই বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট দুইটি প্রাণী—উভয়েই দেখিল, ঘরটি আলোকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে!

"বল্‌লেন না?"—সবিতা প্রশ্ন করিল।

সৌরেশ সবিতার দিকে তাকাইল, সবিতা মুখ নামাইল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া বলিল, "বলুন?"

"কি বল্‌বো?"

"আবেদন মঞ্জুর?"

কার?"

"জানি নে!" বলিয়া সবিতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

কিন্তু, অপর পক্ষের মুখ এক তিলও নড়িল না! স্থিরকণ্ঠে বলিল, "জানো বৈ কি! জানো—সবই! জানো—তুমিই সেই মলিনা, জানো—আমি প্রতারক—আর আমার শাস্তি কি? মলিনা, এ-ও জানো—আমার জীবনটা আজ অঞ্জলি দিলেও, তুমি ঘৃণায় ফিরিয়ে দেবে।

নিশ্চয়ই জানো—শাস্ত্রের কোনও পৃষ্ঠায় আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই! কি—জানো না, মলিনা?"

"ও কি—"

"কাঁদিনি!.. তা কি পারি! শয়তানের রোদন নেই—পাষাণের বুকে জল থাকে না!"—সৌরেশ রুমালে চোখ মুছিল।

এম্‌নি সময়ে নিমাই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—সব প্রস্তুত।

সৌরেশ উঠিয়া পড়িল, এবং টেবলের কাগজপত্রগুলা গুছাইয়া রাখিয়া নিমাইকে আদেশ দিল—"নিয়ে যা এঁকে— ইনি তোদের মা!" বলিয়া অগ্রেই বাহির হইয়া গেল।

* * * *

পরদিন সকালবেলা ঘুমের পরদা চোখ হইতে সরাইয়াই সৌরেশ সর্ব্বাগ্রে নিমাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কি করছেন রে? মনে আছে তো—তোদের মা?"

নিমাই কহিল, "জপে বসেছেন।"

সৌরেশ ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "কে জপে বসেছেন?"

নিমাই থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে—মা!"

"তবে!—আচ্ছা, যা—" নিমাইকে পরিত্রাণ দিয়াই, সৌরেশ আবার কি মনে করিয়া তাহাকে ডাকিল, বলিল, "শোন্, ত! তোদের মাকে একবার ডেকে দিবি, বুঝলি?

"আজ্ঞে, আচ্ছা—" বলিয়া নিমাই চলিয়া গেল।

কিন্তু, কেন?—নিমাই দৃষ্টির বাহির হইতেই সৌরেশের মনে প্রবল প্রশ্ন উঠিল—কেন? কিসের জন্য সবিতাকে সে আসিতে বলিল? এক-এক করিয়া পৃথিবীর আর-সকলের কাছে তাহার এতটুকু একটু প্রয়োজন রহিলেও, এরূপ ভান করিয়া সবিতাকে ডাক দিবার তাহার

ত কোনও প্রয়োজন নাই! অধিকারই বা কি? তবে?—এ প্রশ্নের জবাব ইহাই ত, যে-বিদ্রূপ একদিন সে নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই নৃত্য দেখিয়া তাহাকে ইহ-জীবনের সর্ব্ব-শোভার সমাপ্তির অপেক্ষায় থাকিতে হইবে!

এইরূপে যখন তাহার মনের ভিতর এক ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও লয়ের আয়োজন চলিতেছিল, তখন সবিতা এক কাপ চা হাতে করিয়া সহাস্যে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "আসতামই! ঘুম ভেঙেছে, চা চাই ত?" বলিয়া চায়ের কাপটা সৌরেশের খাটের উপর নামাইয়া রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

সৌরেশ বিহ্বল হইয়া কিয়ৎক্ষণ মেয়েটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "চা ত চাইনি আমি!"

কেহ হাসিতে বলে নাই, তত্রাপি এক মুখ হাসিয়া সবিতা বলিল, "কি মু[illegible]ল! চাইলেই বা পাবেন কোথা, যদি না নিয়ে আসি আমি! ঝি, ঠাকুর সবাই ত আমার কাছে। ও কি, জুড়ুলো যে!"

ক্ষতি কি? যদিও প্রতিদিন এম্‌নিই সময়ে সৌরেশের চা না হইলে চলিত না, তত্রাপি আজ আর ঐ বস্তুর দিকে লোভ্ করিবার মন তাহার ছিল না। চায়ের কাপটার দিকে দুই-একবার অন্যমনস্কভাবে দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, "জেল-ফাঁসিতে লোকের শাস্তি হয় না। সে হয়—"

সবিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, গরম চা ঠাণ্ডা হলো যে! খা—ন!"

সৌরেশ ঈষৎ হাসিল—সে হাসিতে আভাও নাই, রসও নাই। বলিল, "খাচ্ছি। এতদিন ঝি-ঠাকুরের হাতের কত কি খেয়েছি, আর আজ কতদিনের পর—মলিনা, বারো বছর!" সবিতার দিকে মুখ রাখিয়া উক্তিটা শেষ করিল—"তোমার হাতের একটি কাপ চা খাব না?"

সবিতা তখন একটা কাযে ব্যস্ত ছিল। কাপে কণাপ্রমাণ চায়ের পাতা ভাসিতেছিল, দেখিতে পাইয়া একমনে হেঁট হইয়া উহাকে উঠাইতে লাগিয়াছিল। অবশেষে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া উপরকার খানিক চা ফেলিয়া দিয়া যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার খান!" বলিয়া কাপটা তুলিয়া ধরিল।

আপত্তিও ছিল না। কিন্তু সবিতার হাতের গোড়ায় মুখ আনিতেই, সৌরেশের মুখখানা সহসা ছাই হইয়া গেল। যদিও সবিতার এই মুহূর্তে আবির্ভাব হয় নাই, তত্রাচ যে-দৃশ্যে সে এতটুকু হইয়া গেল, সে-দৃশ্যে চোখ ফেলিবার খেয়াল তাহার এতক্ষণ হয় নাই। এক্ষণে সেই খেয়ালটা যেন মূর্তি ধরিয়া তাহাকে চাবুক মারিল। তত্রাপি সে তন্মুহূর্তেই নিজেকে বীরবেশে সাজাইয়া ফেলিল—শক্তসিংহের ন্যায় নিজেই যে আঙুল কাটিয়াছে, রক্ত দেখিয়া শিহরিলে চলিবে কেন? চা [illegible] হইয়া গিয়াছিল, তত্রাপি যেন অপার তৃপ্তিতে পান করিয়া বলিল, "শুনেছি, স্বামী বোলেই সাবিত্রী সত্যবানকে বাঁচিয়েছিল। [illegible], তুমি কা'কে বাঁচাতে এলে সবিতা?"

কথাটা যেন বুঝিতেই পারে নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া সবিতা বলিল, "কি বল্‌ছেন? আমি ত সেবিকা—নার্স!"

তৎক্ষণাৎ সৌরেশ জবাব দিল, "বটেই ত! নইলে স্ত্রীলোকের নাম 'জননী' হতো না! একটা ঢোক গিলিয়াই আবার বলিল, "কিন্তু, তোমার স্বামী?"

সবিতার মাথায় এইবার যেন দুষ্টা সরস্বতী চাপিল। দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "তাঁর আদর পেলে মেয়েমানুষ কি বাইরে আসে?"

কিন্তু, সৌরেশের মুখের আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, তাহার বুকের

ভিতরটা যেন মুচড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যথিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অনাদর তোমাকে ?—চল, আমি গিয়ে তাঁর হাতে ধরবো!"

সবিতা মুখ নামাইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিমনা হইয়া বলিল, "কিন্তু, স্বামী ত আমার স্বর্গে!"

সবিতার দিকে মূঢ়ের ন্যায় মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া সৌরেশ বলিল, "সে কি! মাথায় সিঁদুরও রয়েছে, হাতে নোয়াও রয়েছে—আমি ত আর স্বপ্নে নেই!"

সবিতা জবাব দিল, "দেহটি রয়েছে যে! সংকার না হ'লে 'রাঙা'ও ওঠাতে নেই, হাতেরও খুলতে নেই—সাবিত্রী-সমাজের নিষেধ!"

"সংকার হয় নি? কবে মারা গেছেন?" সৌরেশ মুখখানা বিবর্ণ করিয়া সবিতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

সবিতা এইবার মুখ তুলিল, সে মুখ ধীর, প্রশান্ত, অত্যুজ্জ্বল! অচপল কণ্ঠে কহিল, "কবে মারা গেছেন? ঠিক মনে নেই! অতীতের কথা বিধবাকে মনে রাখতে নেই, রাখলে জন্মটা ব্যর্থ হয়, পৃথিবীর কাছে সে নিষ্ফল হয়।" একটা গোপন নিশ্বাস ফেলিয়াই আবার বলিতে লাগিল, "মনে আছে—শুধু একখানা ছবি, এক আবছা, আর গোটাকুতক—চমকানো কথা।"

সবিতা নতনেত্রে থামিয়া গেল।

সৌরেশ তৈলচিত্রের ন্যায় শুধু চাহিয়াই রহিল, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না, চোখের এক পলকও পড়িল না, যেন ভূতের বাড়ীর উপদ্রব দেখিয়াছে।

সবিতা আবার সুরু করিল, "আর কি মনে আছে, জানেন—" সহসা কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সামলাইয়া বলিয়া ফেলিল, "এক পরিষ্কার শঠতা!" বলিয়াই অপরদিকে মুখ ফিরাইল।

সৌরেশ শিহরিয়া উঠিল। আড়ষ্টগলায় ডাকিয়া উঠিল—"মলিনা!"

সম্মুখের লোকটি কাহাকে কি বলিয়া ডাকিতেছে, যেন বুঝিতেই পারে নাই, এম্‌নিই ভাব দেখাইয়া সবিতা সৌরেশের দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইল। অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কাউকে ডাক্‌ছেন?"

সৌরেশ থতমত খাইয়া গেল। সে-দিনের নিষেধ-ইঙ্গিতটা মুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িল, বুঝিল—পুরাতনের সমস্ত অধিকারেই দিব্য-দিলেশা পড়িয়াছে! দুই-একবার ছেঁড়া সচল চাহনি ফেলিয়াই অস্থিরগলায় বলিল, "মলিনা—না, না! সবিতা, আমি ছাড়া শঠতা—"

বাধা দিয়া সবিতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনি? না, না—আপনি কেন? তিনি আর-এক জন, যিনি আমার স্বামী, যাঁর মৃতদেহ আজও রয়েছে—যাঁর প্রাণ নেই, শ্বাস নেই! নইলে, আমি কি বিধবা হই—গরজ পড়েছে!" অতঃপর সৌরেশের আগাগোড়া দেহটা নিরীক্ষণ করিয়া ঠাওরাইয়া বলিল, "আপনারই মত! ঐ রকম মুখ, ঐ রকম চোখ, অমনিধারা কথাবার্ত্তা, চাউনি—সমস্ত, সব!—ও কি, অমন ক'রে চাইছেন আমার পানে? সত্যি বল্‌ছি—পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি—" বলিয়াই সৌরেশের পায়ে হাত দিল, যেন সে বিদ্যুৎ!

ঠাকুর-দেবতার 'পুষ্প' পায়ে ঠেকিলে ভক্তের মুখটা যেমন হয়, তেমনি চোখ মুখ কপালে তুলিয়া সৌরেশ পা দুটো টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি কর্‌লে, সবিতা?"

সবিতা স্থিরকণ্ঠে জবাব দিল, "কিছুই না। মৃত-স্বামীর পায়ে হাত ঠেকিয়েছি! আমারও আবার পরকাল আছে ত!"

প্রথমটায় কিছু বুঝিতে না পারিলেও, সবিতার এই ক্ষণ-পূর্ব্বকার ভাবে ও ভাষায় সৌরেশ বুঝি-বুঝি করিতেছিল যে, এম্‌নিধারাই এক

দুষ্প্রাপ্য অভিশাপ তাহার সৃষ্টিটা মধুর করিয়া যাইবে। তত্রাচ, মুখ ফুটিয়া নিজে কিছু জোর করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। এইবারে প্রবল উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "আমিও আজ তোমারই শপথ করে বলছি, সবিতা, আমার মৃত্যুই হয়েছে! কিন্তু—" অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ সবিতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, তুমি কি সবিতা! তোমার নারী-জন্মটা এমনিই ব্যর্থ ক'রে রেখেছ?"

সবিতা হাসিল, যেন এ হাসি সে চিরকালই হাসিয়া আসিয়াছে। বলিল, "কে বললে আপনাকে ও কথা, পণ্ডিতমশাই?" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া আবার সুরু করিল, "নারীজীবন ব্যর্থ হয় না, হবার যোটি নেই! নারীদেহে স্বামী-নাম হ'লেই সে দেহ সার্থক হয়—সধবা-বিধবায় তফাৎ নেই। এ অঙ্কের বই—প্রশ্নোত্তর মিল্‌বেই মিল্‌বে, তা গ্রন্থকার বেঁচেই থাকুন আর মরেই যান!—স্বামী ত সম্ভোগের বস্তু নয়!"

কোথাকার কি-এক স্পর্শ সৌরেশের হৃৎপিণ্ডকে আঘাত করিয়া গেল! সবিতার দিকে চাহিয়া ছিল, দৃষ্টি নামাইয়া দেখিল—নীচেটায় বিষম অন্ধকার! আবার তাড়াতাড়ি মুখ তুলিল, দেখিল—মেয়েটির মুখমণ্ডল ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব, অসহনীয় জ্যোতি নির্গত হইতেছে! তাহার চোখ দুটা ভারী হইয়া উঠিল। অতঃপর, আর একটিবার মুখ নামাইয়া বলিয়া ফেলিল, "স্ত্রীও তাই—"

সবিতার মুখটা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, "টাকায় দাম দিতে হয়—তাই বুঝি?"

সৌরেশের মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল। অত্যল্পকাল পরেই অপরাধীর ন্যায় বলিল, "জানি, সবিতা, জানি—আমি কি, আমার অপরাধ কতটা। তাই ব'লেই এই বারোটা বৎসর দেহটাকে একপাশে ক'রে রেখেছি!

কেন, শুনবে? ছোঁয়াচ দেবার জোর ছিল না!" একটু চুপ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, আজ?—আজ আমি সার্থক, একাকার! মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—আমি আর তুমি! মাঝে—অনন্তবিস্তারী স্বর্গ! আমার হাতে—তোমার ঘৃণা, তোমার উপেক্ষা! আর, তোমার হাতে—আমার নরজন্ম, আমার রাজমুকুট!"

সবিতা একটিবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল, তাকাইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মুহূর্ত্তেই সৌরেশ আবার বলিয়া উঠিল, "জানি আমি, অমনি ধারা খানিক অবজ্ঞা ছাড়া আমাকে আর কিছুই তোমার দেবার নেই! ও-ই আমার প্রাপ্য।" বলিয়াই এক ম্লান উল্কার ন্যায় বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। কয়েকপদ গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, যেন বাধা ঠেকিয়াছে! নিমেষেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "বিনিময়ে আমি কি দিচ্ছি শুনবে?—বুক জুড়ে এক মহা-বসন্তের ঝড় উঠেছিল—সেই হাহাকার—আমার অপারতৃপ্তিই আজ তোমাকে অর্পণ করলাম! মলিনা, তুমি সুখী হও—"

"দাদাবাবু—"

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে কে ডাক দিল।

সৌরেশ ও সবিতা উভয়েই চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিল—সুরেন।

ঃ চৌদ্দ ঃ

সুরেন স্টেশন হইতে নামিয়াই বরাবর আসিয়াছে, কোন স্থানে একটু বসে নাই, কোনও জায়গায় একটু দাঁড়ায় নাই।

কাছারী-বাড়ীর নিয়ম, 'বাবু'র ঘরে লোক থাকিলে, আর কেহ সে-সময় প্রবেশ করিতে পারিবে না—নিষেধ; এবং এই নিয়ম প্রতিপালিত হইবার নিমিত্ত বাহিরের প্রহরী-পাইকরা সতর্ক থাকিত। সুরেন কাছারী-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একে-একে জিজ্ঞাসা করিয়া 'বাবু'র কক্ষের নিকট আসিতেই, এক জন পাইকের সম্মুখে পড়িয়াছিল। সে যদিও বিশেষ খানিক ইতস্তত করিয়া 'বাবু'র ঘর ভদ্রতার খাতিরে দেখাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু এ-নিষেধটা বারংবারই করিয়া দিয়াছিল যে, আপাতত সে যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। সুরেন ডাক দিয়াই বাহিরে এমন এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, যেখান হইতে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। অতঃপর যখন তাহার মনিবের অভ্রান্ত মূর্ত্তিটি তৎসহ সেই কতদিনকার দুষ্প্রাপ্য 'আশ্চর্য্য'—মলিনার আকৃতিও তাহার চোখে পড়িল, তখন পাইকের নিষেধবাক্যে আর ভর দিতে পারিল না—নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিয়া ঘরে দাঁড় করাইয়া দিল। এ দিকে বাহিরের লোকটাও চাকরী বজায় করিল। তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া সুরেনের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "উল্লুক—"

ব্যাপারটা আর যাহার কাছে যেমনই হউক না, সৌরেশের কাছে উহা সহজই ঠেকিল। চট্ করিয়া পাইকের হাত ছাড়াইয়া দিয়া সুরেনকে কাছের গোড়ায় টানিয়া আনিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "সুরেন,

তুই ?, খবর কি রে ?" তারপর এ পক্ষের জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই অপর পক্ষকে স্নেহকণ্ঠে বলিল, "অপ্রতিভ হোস্‌ নে !" সবিতার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "উনি ঘরে থাকলে সবাই আসতে পারে— সবাইকার 'আপনার' কি না! যা তুই—"

লোকটা লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর সৌরেশ মুখের ছাড়া-কথাটা অপরিসীম উদ্বেগে উঠাইয়া লইয়া সুরেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, "খবর কি বল্‌—হ্যাঁ রে, সুরেন ?"

এই না-বলার জন্য সুরেন কতটা দায়ী, তাহা বিচার করিয়া ভাবিয়া অপ্রতিভ হইবার তুলনায় সে তাহার অভ্যর্থনার তালটাই তখন বেশী করিয়া সাম্‌লাইতেছিল। ঘাড়টা একবার বাঁকাইয়া সোজা করিয়া বলিল, "বাড়ী-ঘরের চাবি আপনাকে দিতে এসেছি, দাদাবাবু! আমি আর পারবো না।"

দীর্ঘ বারোটা বছর ধরিয়া সুরেন 'দাদু'র বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি যা-কিছুর ভার-ভাবনা মাথায় করিয়া আছে। সেই যে একদিন সৌরেশ মহল-পরিদর্শনে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, তারপর হইতেই এ-দিকটার ছবি-দৃশ্য এমনিই তাহার মনের বাহির হইয়াছিল যে, কোনও দিন কোনও মুহূর্ত্তে আর তাহার পুনরুদ্রেক হয় নাই—তাহার সমগ্র মনটা জুড়িয়া এক দূর-প্রবাসী আলেয়া উঠিয়া তাহাকে দিশেহারা করিয়া রাখিয়াছিল এবং এই ভৃত্যটা যখন বারংবার নিবেদন পাঠাইয়া মনিবকে কিছুতেই ফিরাইয়া আর আনিতে পারিল না, তখন অগত্যা নিজেই বুকে বল ধরিয়া এই অলৌকিক দায়িত্ব খুঁটিয়া লইয়াছিল।

জবাব দিবার সৌরেশের কিছুই ছিল না। তত্রাপি জোর করিয়াই কহিল, "এক যুগ চেষ্টা ক'রেও তুই যদি না পারিস, সুরেন, আমি তো নতুন লোক!"

সুরেন মুখের উপর বলিল, "আপনি যে মালিক!" মুখখানা সর্ব্ব আড়ষ্ট করিয়া আবার সুরু করিল, "দাদাবাবু, ও-পরশটায় অজন্মা চলেছে ক'বছর ধ'রে! কারুর ঘরে এক মুঠো ধান নেই, একটা পয়সাও নেই! আমার কাছে রোজই লোক আনাগোনা করে ধানের জন্যে, চালের জন্যে, টাকা ধারের জন্যে। কিন্তু আমার কি বাবার—তাই দেব? অত গোলা-মরাই আর চাবিপত্র নিয়ে দাদাবাবু, আমি আর থাক্‌তে পার্‌ব না!"

তাহার কণ্ঠস্বর দৃঢ় হইয়া উঠিল।

সৌরেশের মুখেও সহসা কে যেন খানিকটা কালি ঢালিয়া দিয়া গেল। ক্ষিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তারা ত কেড়ে নিতে আসেনি।"

সুরেনের সর্ব্বদেহ যেন আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, "ডাকাতি হচ্ছে, দাদাবাবু, ডাকাতি হচ্ছে! পাশাপাশি তিন-চারখানা গাঁয়ে উপ্‌রি-উপ্‌রি ডাকাতি হয়ে গেল! না, দাদাবাবু, কিছুতেই আর পার্‌ব না।"

সৌরেশ একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। খানিক পরে বলিল, "খুন হয়েছে—তা ত হয় নি?"

স্কুল-কলেজের ছেলেরা সহজ একটা প্রশ্ন কড়া-শিক্ষকের মুখে শুনিয়া যেমন সহর্ষে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, তেম্‌নিই নির্ভয়ে সুরেন মুহূর্ত্তেই প্রত্যুত্তর করিল, "একেবারে না হলেও জখম হয়েছে অনেকে। মহিম ময়রাকে জানেন ত তেঁতুল-পুকুরের?—তার পরিবারের একটা—" থামিল।

সৌরেশ চম্‌কিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "থাম্‌লি কেন?"

সুরেন মুখ নামাইয়া বলিল, "জিবে আন্‌তে নেই, দাদাবাবু, একটা—চেঁচে নামিয়ে দিয়েছে।" একটু পরেই মুখ তুলিয়া কোনও রকমে বলিয়া ফেলিল, "চাবি দেয়নি ব'লে!"

পাথরের ন্যায় আনতমুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সৌরেশ হঠাৎ একটু হাসিল। সে-হাসিটা সাম্‌লাইবার চেষ্টা না করিয়াই বলিল, "তাই বুঝি আমায় ও-সব ফেলে দিতে এসেছিস্ খুন-জখম হবার ভয়ে, হ্যাঁ রে?"

সুরেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে ত নিশ্চয়ই, দাদাবাবু! পরের জিনিস বুকে ক'রে রইছি—খুন হ'লে চল্‌বে কেন?"

সৌরেশ হাসিয়া উঠিল, কহিল, "আর যদি আমি হই—"

"খুব হয়েছে!" ও-দিকটার জানালার কাছ হইতে এক দীপ্ত চাপা নারীকণ্ঠ শ্রুত হইল। লক্ষ্য নির্ণয় করিতে সৌরেশের তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। সেই দিকে চাহিতেই দেখিল—সবিতার খরচোখ তাহার দিকে পড়িয়া রহিয়াছে! চোখোচোখি হইতেই সবিতা চোখ ফিরাইয়া লইল।

সৌরেশও পলকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিষম উদ্যমে আবার বলিয়া উঠিল, "অসম্ভব নয়! আর, খুন হ'লেও রক্ষে কেউ ত করতে যাবে না!"

সুরেন বলি-বলি করিয়াও বিশেষ একটা কথা যেন বলিবার ফাঁক পাইতেছিল না। এইবার অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "ইস্! সেটি হচ্ছে না, দাদাবাবু! দরখাস্ত ক'রে থানা থেকে পুলিস এনে বাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। নইলে, সে-স্থানে এই সময়ে নিয়ে যেতে আপনাকে আসি আমি?"

সৌরেশ কি ভাবিয়া সুরেনের মুখের উপর একবার তাকাইল। খানিক পরে জবাব দিবার একটা কথা যেন বহুকষ্টে পৃথিবীর ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, "তা হ'লে আর আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? আমি মনে করছি—কাশীবাসী হবো।"

কোথা হইতে, কি হেতু, কেনই বা এ কথাটার হঠাৎ উৎপত্তি হইল, তাহা বুঝিবার বালাই গ্রহণ না করিয়াই সুরেন কোমরে জড়ানো একখানা গামছার গাঁট খুলিয়া একগোছা চাবি বাহির করিয়া মনিবের সম্মুখে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এই নিন, দাদাবাবু, আপনার চাবি-পত্র, তার পর যা করবার করুন।"

চকিতে এই ব্যাপারটাকে খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিল আর একজন—সে সবিতা। মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া রোষদীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি ত আচ্ছা, সুরেন! তোমার মনিব বল্‌ছেন—'কাশীবাসী হবে', আর তুমি দিচ্ছ সংসারের চাবি ওঁকে! লজ্জাও নেই?"

একদিনকার একই শ্রেণীর ঐ মেয়েটির সাড়া পাইয়া সুরেন অধিকতর সাহস পাইল। ব্যগ্রকাতর-কণ্ঠে বলিল, "দাদাবাবু! তা হ'লে আপনি অন্য কাউকে দিয়ে যান—" সবিতার দিকে ফিরিয়া অনুনয়-কণ্ঠে বলিল, "তুমিও একবার বলো! পার্‌বো না আমি আর—দিব্যি গেলে বল্‌ছি! দাদাবাবুর যা খাই—এক বেলাই দু'টো, তাও পাইনে! হামা দিয়ে পাড়ার কোলের ছেলেগুলো এসে পাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—শুন্‌বে আর?"

সুরেনের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

অলক্ষ্যে সবিতাও চোখ মুছিল। বলিল, "এক-আধ মুঠো দাও ত?"

"আমার বাবার ভাত নয় ত, দিদি—" সুরেন হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিতে-মুছিতে পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "দেশে আগুন লেগেছে, দিদি, দেশে আগুন লেগেছে!"

"ভস্ম হয়ে যাক্! ও কথা বড়লোকের কাছে কয়ো না, সুরেন—তোমার জেল হবে!" সবিতার চোখ দু'টা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

যে বড়লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া খোঁচাটা মারা হইল, সে এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ছিল, এইবার তাহার মুখ ফুটিল। স্বভাব-পরিমিত হাসির আভা মুখে আনিয়া সুরেনের দিকে মুখ রাখিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই! জেল কি আর বড়লোকের হয়? গরীবকে শাসন করতেই বড়লোকের জন্ম, বড়লোকের এই সম্মান!" পর-মুহূর্ত্তেই গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌ছিস তুই—বাড়ী যেতে? যাবো। আজই, এই সন্ধ্যায়! কেন জানিস্? সবাই দেখবে—বড়লোকের শাস্তি কি!" বলিয়াই চাবির গোছাটা তুলিয়া লইল।

সুরেন অত-শত না বুঝিলেও, এইটুকু বুঝিয়া হর্ষে লাফাইয়া উঠিল যে, দাদাবাবু এবার সত্যই দেশে ফিরিবে! বলিল, "বাঁচলাম, দাদাবাবু! দিনে-দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ হয়েছে!"

"হোক্ না! তুই পুলিস বসিয়েছিস—আমি গিয়ে জেল দেব! আচ্ছা, তুই এখন বাইরে যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়—"

সুরেন বাহির হইয়া গেল।

সৌরেশ সবিতার নিকটে দু'এক পা সরিয়া আসিয়া বলিল, "এ চাউনি অধিকারের দৃষ্টি নয়, সবিতা! হয় ত তোমার সঙ্গে দেখা আর না হ'তে পারে! তাই, একটা কথা ব'লে আমাকে ফুরিয়ে ফেলতে চাইছি! দেখ, এক দুর্লভ নরজীবন নিয়ে আমি জন্মেছিলাম! তার ধ্বংস হলো, কি প্রতিষ্ঠা হলো, তা জানিনে—জানবার প্রবৃত্তিও নেই। যদি ধ্বংস হয়ে থাকে, তার জন্যে দায়ী তুমি! যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে—সে বাহাদুরিটা তোমারই!"

সবিতা এ ছাই-ভস্মের কি প্রতি-জবাব দিবে? নিঃশব্দে অধোমুখী হইয়া বসিয়া রহিল।

সৌরেশও জবাবের আশা রাখে নাই। ব্যস্ত হইয়া আবার

বলিয়া উঠিল, "আর সময় নেই। কিন্তু, তাই ব'লে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া কিছু করতে চাইছিনে। আগেও বলেছি, ফের বলছি—তোমরা যে এসেছ, সে মাতৃত্বের আকর্ষণে, সেবার আকর্ষণে—দাম্পত্যের টানে নয়। যদিই বা কিছু এতে আমার আমিত্ব থাকে, সে তোমরাই আমাকে অর্পণ করেছ, আমি শুধু তাকে আশীর্ব্বাদ ব'লেই হাত পেতে ধ'রে নিয়েছি!" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "যদি এইখানেই থাকো, তা হ'লে আমি জানবো, ফাঁকি দিয়ে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা আমার হলো!" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। চৌকাঠের কাছাকাছি গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তেই ফিরিয়া দ্রুতপদে সবিতার কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ডাকলে আমাকে?"

সবিতা একান্ত অপরিচিতার ন্যায় অনাসক্ত কণ্ঠে কহিল, "কা'কে কি বলছেন—আমাকে?"

ভূমিকম্প হইলে অচল পাহাড়ও যেমন নড়িয়া উঠে, তেমনি সৌরেশের সারা দেহ দুলিয়া উঠিল। মৃতের ন্যায় মুখখানা রক্তহীন করিয়া বলিল, "না, না! আমার ভুল হয়েছে!" বলিয়াই নত-মুখে বাহির হইয়া গেল।

ঃ পনেরো ঃ

কথার নড়চড় হইল না। সন্ধ্যার ট্রেনেই সৌরেশ দেশ-যাত্রা করিল—সহযাত্রী হইল একমাত্র সুরেন।

স্টেশন হইতে এই যাত্রিদ্বয়ের গন্তব্যস্থান মাইল ছয়েক। রাস্তা মেঠো-কাঁচা—পদব্রজে কিংবা গোরুর গাড়ীতেই 'এই-একটু' রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। যাহারা গো-যানে যায়, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ইহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। সৌরেশ হঠাৎ আসিতেছে, কাযেই আয়োজন কিছুই ছিল না। ট্রেন হইতে নামিয়াই সৌরেশ 'প্ল্যাটফরমে'র একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল—স্টেশন পানে গেল না। তারপর নির্দ্দিষ্ট হইয়া টিকিট দু'খানা সুরেন স্টেশনের বাবুকে দিয়া ফিরিতেই, সৌরেশ বলিল, "হ্যাঁ রে, মাঠে-মাঠে রাস্তা আছে ?"

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ট্রেন হইতে অন্যান্য যাহারা নামিয়াছিল, তাহারা নিমেষেই কোন্ দিক দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্মুখের দূর-প্রসারী প্রান্তর ঠেলিয়া চলিবার, বোধ করি, আর কেহই ছিল না। চারিদিকে চম্‌চমে রৌদ্র, মাঝে মাঝে উষ্ণ বায়ুর আনাড়ী ঝাপ্‌টা প্রকৃতিকে সচল করিয়া তুলিতেছিল। সুরেন প্রশ্নটার এক মনোমত অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিল, "আপনার জন্যে পাল্কী আন্‌ছি গাঁ থেকে—"

জল ছিটাইয়া যেমন মানুষ আগুনের রোখ্ ব্যর্থ করে, তেম্‌নিই সৌরেশ মুখ দিয়া একটু হাসি বাহির করিয়া সুরেনের আগ্রহ দাবিয়া রাখিয়া বলিল, "পাল্কী আমার জন্যে ? নবাব ত আচ্ছা—তুই !"

সুরেনের অপ্রতিভই হইবার কথা। কিন্তু, সে অবাক্ হইয়া গেল, বলিল, "কি বল্‌ছেন, দাদাবাবু, মাটীতে আপনার কখনও পা ঠেকেনি ;

এক বেলার রাস্তা, আর এই রোদ—আপনি হাঁটবেন? একটু দাঁড়ান, এখ্‌খুনি নিয়ে আস্‌ছি পাল্কী—"

সুরেন প্রস্থানোদ্যত হইতেই, সৌরেশ ডাকিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল, "তা হ'লে, দু'খানা পাল্কী চাই, জানিস্ ত? তোর আর আমার।"

সুরেনের যেন মাথাটা কাটা গেল। হঠাৎ কথাটার জবাব কি দিবে, ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষণেক পরে কথাটাকে উড়াইয়া দিয়াই সহাস্যে বলিল, "বেশ মজাটি হয় তা হ'লে! লোকের হাততালির চোটে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হয়—পাল্কী চড়লে!"

সৌরেশ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "কেন?"

"কি বলেন যে তার ঠিক নেই!" সুরেন দাদাবাবুর অস্বাভাবিক জেরাকে সম্পূর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিয়াই সচকিত হইয়া আবার বলিয়া উঠিল, "ইস্! আর দেরী করবো না, দাদাবাবু—একদণ্ড দাঁড়ান!"

সৌরেশ এবার চটিয়া উঠিল, বলিল, "না রাগলে তোরা সোজা হোস্‌নে, না? আমি মানা করছি—পাল্কী আমার দরকার নেই।" পরক্ষণেই স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "রোদ-রাস্তা তোরও যদি না লাগে সুরেন, আমারও লাগবে না। আরাম-জিনিসটা বড়-লোকের একচেটে না ত!" হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "না রে না, তা নয়! কখনো মাটীতে পা পড়েনি কিনা, তাই আজ পা ফেলে দেখবো—ঠিক তোর সঙ্গে!" বলিয়াই তাহার হাত-ব্যাগটা নীচে হইতে তুলিয়া লইল।

ফাঁকি দিয়া চাকরীটা অনেক ক'বৎসরই সুরেনের হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মনিবের এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কোনও দিন সে দেখে নাই। দুর্ভেদ্য রবিরশ্মি, তদুপরি অন্তহীন পথ—দাদাবাবু হাঁটিয়া যাইবে? এই ত সেই-ই 'দাদাবাবু', যে 'কর্ত্তাবাবু'র স্নেহের দুলাল, অতুল ঐশ্বর্য্যের

মালিক! 'দাদাবাবু'র ত অর্থের অনটন নাই! তবে? এই সময় অকস্মাৎ 'দাদাবাবু'র জীবনেতিহাসের প্রথম দিকটার এক শোনা-গল্প তাহার মনে পড়িয়া গেল—উনি—'খেয়ালী' লোক! কথাটা সে এর-ওর কাছেই শুনিয়াছিল, কিন্তু নিজে দেখে নাই। আজ, উহার এক-টুক্‌রা অভিনয় দেখিয়া সে ইহাই স্থির করিল যে, 'দাদাবাবুটা'র ঘাড়ে এক ভূত চাপে, যে ওঁর দেহটাকে দেহ বলিয়া জ্ঞান রাখিতে দেয় না।

অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া সুরেন আর পাল্কীর কথা তুলিল না। শুধুই বলিল, "কিন্তু, আমি কি ম'রে গেছি যে, ব্যাগটা আমি নিতে পারিনে?"

সৌরেশ যেন একটি শিশু! খানিকটা হাসিয়া বলিল, "আমিও ম'রে যাইনি! তুই ক্ষেপা, পাগল! নিজেই বল্‌লি, এক বেলার রাস্তা—একলা সব রাস্তাটা নিয়ে যেতে পারিস্? আমি খানিকটে নিই, তারপর তুই খানিকটে নিবি—হাতাহাতি ক'রে যাবে, বুঝ্‌লি?"

সুরেন অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। আর কথাটি না কহিয়া অদূরে একটা রাস্তার দিকে পা বাড়াইতেই সৌরেশ বলিয়া উঠিল, "ওখান দিয়ে কি রে? মাঠে-মাঁঠে চল্, শীগ্‌গির হবে।"

সুরেনের সহিষ্ণুতা এবার গণ্ডী অতিক্রম করিল। তথাপি যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "একটু দূর হয় হোক্, তবু 'রাস্তা' দিয়ে গেলে দু'একটা গাছতলা পাবো। আর, ওটা এক জলজ্যান্ত ময়দান—হু-হু করছে! তাই কি রাস্তা আছে? সাঁওতাল-কোঁড়াও যেতে পারে না!"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌরেশ কহিল, "মনে কর্, ওদের চেয়েও আমরা শক্ত!"

সুরেনের এইবার যেন কান্না আসিল। বিষম চটিয়া বলিয়া উঠিল "আমরা পৃথিবীর পাহাড়, আকাশের বাজ! কিন্তু, যাবেন কি ক'রে? হোঁট্‌রা, নদী-নালা, কাঁটাবন—"

জবাবটা যেন সৌরেশের জিহ্বাগ্রেই ছিল। তৎক্ষণাৎ বলিল, "হ'লেই বা। শীগ্‌গির হবে ত!"

"তাই হোক্!" বলিয়া সুরেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া 'প্ল্যাটফরম' হইতে 'রেল-লাইনে' নামিল ও 'রেল-লাইনে'র আসন—সুউচ্চ মৃত্তিকা-শৃঙ্গের গা বহিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া মাঠে নামিল। সৌরেশ তাহার ঠিক পশ্চাতে।

খানকতক জমি পার হইয়াই, সুরেন পশ্চাতে এক অস্ফুট-শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইতেই সৌরেশ বলিয়া উঠিল, "পা ঢুকে গেছে রে! আয় দিকিনি, আয় দিকিনি—"

সুরেনের বুকটা উড়িয়া গেল! উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মাঠের এক গভীর ফাটলের ভিতর 'দাদাবাবু'র ডান পা-টা ঢুকিয়া বিষম আট্‌কাইয়া গিয়াছে! ভিতরটায় একটিবার চাহিয়াই, এদিক ওদিক পা-টা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অনেক কষ্টে টানিয়া তুলিয়া ফেলিল, দেখিল—পায়ের ছাল-চাম্‌ড়া খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি খানিকটা ধূলা লইয়া ক্ষতস্থানে ছড়াইয়া দিয়াই বলিল, "দেখলেন, কি হলো? আপনার কি অভ্যাস আছে? ইস্, রক্ত যে গো—"

বোধ করি বা সুরেনের কথাগুলি সৌরেশের কানে পৌঁছিল না। মণিমুক্তা হারাইলে লোকে যেমন খোঁজে তেম্‌নি এদিক-ওদিক একবার চাহিয়াই ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সুরেন, আমার জুতো? গর্ত্তর ভেতর প'ড়ে গেছে রে—"

গর্ত্ত হইতে যে খালি-পা উঠিয়াছে, তাহা স্বরেনেরও খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি গর্ত্তর ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিল, "একেবারে নীচে চ'লে গেছে, দাদাবাবু! ওঠানো যাবে না!"

"না যাক্! চল্, খালি পায়েই যাবো—" বলিয়াই সৌরেশ জুতার অপর পাটি-টা ফেলিয়া দিয়া আবার হাঁটিতে সুরু করিল।

স্বরেন একবার বলিল যে, এখনো ফিরিয়া রাস্তায় উঠিয়া গেলে ভালো হয়। কিন্তু, সৌরেশের মতের আর পরিবর্ত্তন হইল না।

স্বরেন পথ দেখাইয়া অগ্রে-অগ্রে চলিয়াছে। 'দাদাবাবু'র কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া মাঝে-মাঝে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া-ফিরিয়া দেখে। সৌরেশ তাহাকে অধিকতর পায়ে জোর দিতে তাগাদা দেয়। অতঃপর এমনিই হইয়া দাঁড়াইল যে, সৌরেশ যেন স্বরেনকে তাড়াইয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। একটানে মাইল তিনেক গিয়া একখানা নিতান্ত উঁচু-নীচু, দুর্গম জমির উপর পড়িয়া স্বরেন ফিরিয়া চাহিতেই, সৌরেশ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ রে, চল্‌তে পারছিস্‌নে তুই?"

স্বরেন অবাক হইয়া গিয়াছিল। বলিল, "দাদাবাবু! আপনার ঘাড়ে, কোনো 'দেবতা' চেপেছে—নিশ্চয়ই! মোষের কাঁধের মতন আমার পা, আর আমার সঙ্গে হাঁটতে এ-পরগণায় কেউ পারে না—আমাকেও আপনি হারিয়ে দিয়েছেন। এত হাঁটতে আপনি পারেন ঐ নরম পায়ে?"

সৌরেশ তেমনি হাসিয়াই বলিল, "আমরা যে বড়লোক রে! সব দিকেই বড়! চল্, এখন চল্—"

আরও মাইলখানেক ঝড়ের মত উহারা আসিয়া এক ছোট বনের মুখে পড়িল। বনটা খাঁটি বাবলার। স্বরেন 'দাদাবাবু'কে আঙুল বাড়াইয়া ভয়ে-ভয়ে একটা সরু রাস্তা দেখাইয়া বলিল, "দাদাবাবু,

রাস্তাটা বেবাক্ কাঁটায় ভর্ত্তি! অন্যদিক দিয়েও আর যাবার যো নেই—”

সৌরেশ রাস্তাটায় একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিল, “আমাকে আগে যেতে বল্‌ছিস? আচ্ছা, পেছিয়ে আয়—সাবধানে পা ফেলিস্—”

সুরেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “না, না! আমি বলছি, আপনি কিছুতেই ও-রাস্তায় পা পাততে পার্‌বেন না! আমার কাঁধে উঠুন—”

সৌরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, “বড়লোকের পায়ের তলাও ভয় দিয়ে তৈরী রে—কাঁটাও মুখ তুলতে পারে না!” বলিয়াই পাশ কাটাইয়া সটান অগ্রসর হইল।

দাদাবাবুর কাণ্ড দেখিয়া সুরেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, পুতুলের ন্যায় পশ্চাতে-পশ্চাতে চলিতে লাগিল—আগেকার লোকটির পায়ের গতি-বিধির দিকে চোখ রাখিয়া। যখন সে দেখিল, দাদাবাবু কেবল আঙুলের টিপ রাখিয়া-রাখিয়া ভেল্কি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ওই সর্ব্বনেশে রাস্তাটা পার হইয়া গেল, তখন তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। হাড়ে-হাড়ে সে ইহাও বুঝিল যে, তাহার নিজের পায়ের অবস্থাটা কিন্তু এম্‌নিই দাঁড়াইয়াছে যে, ভালো পথেও সে আর এক-পাও বুঝি-বা হাঁটিতে পারিবে না। যাহাই হউক, অকথ্য রাস্তাটা পার হইয়াই সুরেন সর্ব্বাগ্রে গোটাকতক বাব্‌লা-কাঁটা ছিঁড়িয়া পায়ের কাঁটাগুলাকে একে-একে তুলিয়া সৌরেশকে বলিল, “সত্যি, দাদাবাবু, আপনি হয় ধ্রুব, না প্রহ্লাদ!”

সৌরেশ এতক্ষণ কথাটি কহে নাই। এইবার গম্ভীরভাবে বলিল, “আর, আমি কি ভাবছি, জানিস্? তুই আমাকে কাঁধে ক'রে আন্‌বি বল্‌ছিলি, তা হ'লে বাড়ী পর্য্যন্ত তোকেই কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হ'ত আমাকে!” বলিয়াই খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিল।

সুরেন লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইয়া আবার রাস্তা ধরিল। তীর নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা সোজা পথে প্রবলবেগে উড়িয়া যায়, উভয়ে তেমনি সোজা চলিতে লাগিল। সম্মুখে কত উঁচু আল পড়িল, নালা পড়িল, ডোবা পড়িল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমনিই করিয়া অনেক দূর গিয়া সম্মুখে এক মেঠো-নদী দেখিয়াই সুরেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আড়ষ্ট হইয়া বলিল, "দাদাবাবু, 'দিশে' লেগে গেছে—অনেক দূরে এসে পড়েছি! এখন উপায়?

সভয়ে সে সৌরেশের পানে চাহিল।

কচি ছেলে দোয়াত ফেলিয়া মুখে কালি মাখিলে, মা যেমন সেই মুখে তাড়াতাড়ি চুমু খায়, সৌরেশ তেমনিধারা তৎক্ষণাৎ সস্নেহে হাসিয়া বলিল, "এই ত আমি চাই রে! 'দাদাবাবু' কেমন চলতে পারে—বেশ ক'রে দেখবি!—দাঁড়ালি কেন?"

এই আনাড়ীপনা যে 'দাদাবাবু' সহিয়া যাইবে, তাহা সুরেন মনে করে নাই। তথাপি এরূপ নির্ব্বিবাদ ক্ষমাপ্রাপ্তিটাও তাহার ভাল লাগিল না। বলিল, "দাঁড়ালাম সাধে—নদীপার হবেন কি ক'রে, বলুন দিকিনি?"

ইতিমধ্যে নদীটির আকার-পরিসর বোধ করি-বা সৌরেশ মনে-মনে মাপ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাচ্ছিল্যভাবে কহিল, "লাফিয়ে! লাফ মারবার সময় 'কালী-কালী' বলবি! এ ত শুক্‌নো নদী—"

সুরেন উদ্বেগে বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌ছেন দাদাবাবু! শুক্‌নো হ'লেও—কম?"

নদী বলিতে যাঁহারা ভাগীরথী-পদ্মা বুঝেন, তাঁহারা বোধ করি হাসিয়া উঠিবেন। এই নদীটি এক কালে হয়ত ভাগীরথী-পদ্মার অনুরূপই ছিল, কিন্তু উহা অধুনা পুত্রশোকাকুল মৃতদার জরাজীর্ণ চক্ষুহীন স্থবিরের ন্যায়

অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াই বহিয়া যাইতেছে—রাজা-জমিদার ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহার অধিকাংশ বাঁধিয়া লোকে চষিবার ক্ষেত করিয়াছে, কতকটা অশ্রুর মত 'পলি' পড়িয়া-পড়িয়া স্বতই বুজিয়া সরু হইয়া গিয়াছে। এক-এক স্থান আবার গভীর, প্রশস্তও মন্দ নহে—বোধ করি এমনিই থাকিবে. নতুবা পৃথিবীতে শোক থাকে না! এইরূপ হতশ্রী জল-প্রণালী বাংলায় শত-সহস্র বহিয়া যায়, এবং পল্লীবাসীরা এখনও ইহাদিগকে 'নদী' বলিয়াই অভিহিত করে।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। যে স্থানটির কথা হইতেছে, সেখানে জলও বেশ-একটু আছে, আর পরিসর মাপ করিয়া দেখিলে, সুরেনকে হয়ত বা ঠকিতে হইবে না।

সৌরেশ ছাতি বন্ধ করিয়া সুরেনের হাতে দিয়া বলিল, "তুই এক্ এক কায কর্—তোর একখানা ত গামছা রয়েছে, প'রে কাপড়টা মাথায় বাঁধ্, তারপর ছাতি দুটো এক হাতে ধ'রে সাঁত্‌রে পার হয়ে যা। ছাতি দুটো রেখে এসে ফের আবার ব্যাগটা নিয়ে যাবি—"

"আর আপনি?" বলিয়া সুরেন 'দাদাবাবু'র পানে চাহিল।

সৌরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ত লাফিয়ে পার হচ্ছি—" বলিয়াই পালোয়ানের মত কাপড়-জামা আঁটিয়া কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া পায়তাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া লাফ মারিল, এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই দেখা গেল যে, পটে-আঁকা ছবির মত ও-পারে সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সুরেন গালে হাত দিল। এতটা লাফাইতে সে নরদেহে এ-পরশটায় আর কাহাকেও দেখে নাই। এবার তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াই গেল যে, 'দাদাবাবু' বাস্তবিকই 'ধ্রুব' বা 'প্রহ্লাদ'। অতঃপর যন্ত্রচালিতের ন্যায় 'দাদাবাবু'র কথামত সাজ-সজ্জা করিয়া সাঁতরাইয়া পারাপার হইল, এবং, অবিলম্বেই দিক্-পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরপি যাত্রা সুরু করিল।

প্রখর-সূর্য্যের বিষ-রৌদ্র যখন যাত্রীদুটিকে ঝলসিয়া ফেলিয়াছে, তখন উভয়ে একটি গ্রামের এক প্রান্তে একটা গাছতলায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

সৌরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি গাঁ, সুরেন?"

সুরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাড়ী এলাম—চিনতে পারছেন না?" বলিয়াই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

নামটা শুনিয়া সৌরেশ যেন কেমন হইয়া গেল, একটু শক্ত হইয়া বলিল, "এমন হয়ে গেছে?" এ-সব গাছ কেমন ঝাঁপালো ছিল—হাড় বেরিয়ে গেছে! ও-জায়গাটায় কাদের বাড়ী ছিল, না?—আট-দশখানা বড়-বড় ঘর, একবাড়ী মরাই—ছেলেপিলে—লোকজন—"

সুরেন এক গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শ্মশান হয়ে গেছে, দাদাবাবু! সব দু'চার দিনের মধ্যেই শেষ—কলেরা হয়েছিল!"

সৌরেশ একটু চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে, অদূরে শেওড়া-বাবলা-খেজুর গাছের এক ঝোঁপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওখানটায় একটা পাড়ার মত ছিল, নয় রে?"

সুরেন তৎক্ষণাৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, "ছিল—গয়লাপাড়া। দেখেছেন তো, তাদের বাড়-বাড়ন্ত ছিল কত! এখন খালি ভাঙা দেওয়ালগুলোর খানিক-খানিক ঝোঁপে ঢাকা আছে!"

সৌরেশ উদ্বেগে বলিয়া উঠিল, "কোথায় গেল তারা?"

সুরেন জবাব দিল, "কতক মরে গেল—মরেই বেশী গেছে! বাকি যারা ছিল, তারা চালকেটে উঠে গেল।"

সৌরেশ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "জমি-জায়গা?"

নিস্তেজ হাসি হাসিয়া সুরেন জবাব দিল, "জমি-জায়গা? জমি-জায়গা থাকলে কেউ কি আর ভিটে ছেড়ে চলে যায়, দাদাবাবু!—জমিদারে সব বেচে-কিনে নিলে খাজনার দায়ে!"

সৌরেশ যেন-একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল, "খাজনা মিটুতো না কেন?"

সুরেনও পিছাইল না। মুহূর্তেই জবাব দিল, "মিটুবে কি ক'রে? বছর-বছর অজন্মা—আকাশেও জল নেই, বিলখালও শুক্‌নো। তার ওপর খাজনা ফি-বছর বেড়েই চলেছে।"

সৌরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, "আচ্ছা, গাঁয়ের অপর লোকে ত খাজনা দিচ্ছে, তাদেরও জমি-জায়গা রয়েছে—"

অর্থপূর্ণ এক হাসি হাসিয়া সুরেন কহিল, "তা বটে। গাঁয়ের ভেতরটা একবার দেখুন না! পনের-আনা লোকেরই জমি নীলেমে চড়েছে! এক পালিও ভূঁই কারুর নেই, দাদাবাবু! ও সব 'পাট' লোকের অনেক দিনই উঠে গেছে।"

"কেউ বিদ্রোহ করেনি? প্রতিবাদ?"

"করেছিলেন একজন। হাড়ু-মুখুয্যেকে মনে পড়ে?—করেছিলেন তিনি! কিন্তু, কি হলো, শুনবেন?—" হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সুরেন বলিয়া উঠিল, "সেই রাত্রেই মুখুয্যেমশায়ের একটি বিধবা মেয়েকে—চলুন, দাদাবাবু, চলুন তাড়াতাড়ি!"

সেই একঘেয়ে, পুরাতন, বিশ্বব্যাপী বজ্রাঘাত! সৌরেশের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল—এই প্রেতলীলা—ইহার জন্য সে-ই দায়ী, ইহার আবিষ্কার সে-ই বুঝি-বা প্রথম করিয়াছে! পৃথিবীতে এতদিন পাপ ছিল না, কলুষ ছিল না, কলঙ্ক ছিল না—সেই-ই যেন-বা এ সমস্ত আনিবার প্রথম শয়তান!

বিদ্রোহী অন্তরকে সুরেনের নিকট গোপন রাখিবার জন্য এদিক-ওদিক অনর্থক বার-কয়েক তাকাইয়া সৌরেশ বলিল, "চল্, আচ্ছা, আমিই আগে, চল্‌ছি—" কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দাঁড়াইল, বলিল "না রে! এ-গাঁয়ের দুঃখটা তুই-ই বেশী দেখেছিস্, অধিকারটা তোরই বেশী,

আগে-আগে তুই-ই চল্—" বলিয়া সুরেনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরেন দাদাবাবুর রকম দেখিয়া এক প্রকার অতি সরল হাসি হাসিয়া অগ্রগামী হইল।

একটু পড়া-জমি ও দুই-চারিটি গাছপালা পার হইয়াই তাহারা গ্রামে ঢুকিল। দুই দিকেই বাড়ী—কোন বাড়ীর দুয়ার বন্ধ, কোন বাড়ীর দ্বার খোলা থাকিলেও ভিতরে কলরব নাই; মাঝে-মাঝে ফাঁক—শুধু মৃত্তিকাস্তূপ ও জঙ্গল। কোন বাড়ীতে ঘর আছে, কিন্তু দুয়ার ভাঙা। কোনও বাড়ীতে ঘরের মাথায় খড় নাই—তালপাতা চাপানো। কিয়দ্দূর গিয়া একটা অর্দ্ধভগ্ন বাড়ীর দুয়ারে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। লোকটি শীর্ণ, পরনে একখানা ছেঁড়া-ময়লা কাপড়—ঝিমাইয়া-ঝিমাইয়া হুঁকা টানিতেছে। কাছাকাছি হইতেই, সুরেন মাথা নোয়াইয়া বলিল, "প্রণাম মুখুয্যে-মশাই—গাঁয়ের খবর ভালো ত সব?"—বলিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি হুঁকা নামাইয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিল, "কে, সুরেন? খবর, বাড়ী গেলেই শুনবি। তোর পেছুতে কে ও রে?"

"দাদাবাবু যে! ঠাওরাতে পার্‌ছেন না?" বলিয়া সুরেন হর্ষোদ্দীপ্ত মুখে লোকটির দিকে কটাক্ষ করিল।

নিমেষে লোকটির চোখদুটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর হইতে যেন কথা বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাদের বাবু?" অতঃপর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া আনন্দাতিশয্যে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল, "ওগো! দেখবে এসো—আমাদের বাবু এসেছেন—" পরক্ষণেই সৌরেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "এতদিন ভুলে থাকতে হয়, বাবু! আমাকে চিন্‌তে পারছেন ত—আমি আপনার হাড়ু মামা!"

সৌরেশ তাড়াতাড়ি ভক্তিনতকণ্ঠে বলিল, "আমাকে আপনি-আপনি

করবেন না—আমি যে আপনার সন্তান!” বলিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

সঙ্গে-সঙ্গেই দুয়ারের আড়াল হইতে চাপা নারীকণ্ঠের শব্দ হইল—“বেঁচে থাকো, বাবা, দীর্ঘজীবী হও!”

সৌরেশ মাথা তুলিতেই দেখিতে পাইল, ভিতর হইতে পাঁচ-ছয়টি নারীমুখ তাহার দিকে অধীর হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। অগ্রে—একটি শীর্ণকায়া মলিন-বসনা প্রৌঢ়া। সৌরেশ অনুমানে বুঝিল—ইনি এই দরিদ্র সংসারের গৃহলক্ষ্মী। আর, ইঁহারই এই সোনার সংসার ছারখার করিয়াছে—ইঁহাদের জমিদার, অর্থাৎ বড়লোক—যাহার কাছে আইন-আদালত নাই,—রাজার শাস্তি-দণ্ড নাই!

ভক্তরা ‘মা-মা’ বলিয়া চীৎকার করে, এবং সে-চীৎকার স্বর্গেও ‘মায়ের’ কানে পৌছায়, কেন না, সে-আর্ত্তনাদ প্রাণ-খোলা—বুকের সবটাই সে-উচ্ছ্বা[illegible] উপা[illegible] এই [illegible], [illegible] লুপ্ত হয় নাই, পুরাতনও হয় নাই। তেমনিই হাড়ু মুখুয্যে বাড়ীর ভিতর হইতে লোক টানিবার জন্য যে চীৎকারটা করিয়াছিল, তাহা বুকভরা বলিয়াই তাহার রেশ অনেক দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, রাস্তার দুধারকার বাড়ী হইতেই লোক বাহির হইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহারা এক অস্বাভাবিক, অপার্থিব, অলৌকিক দৃশ্য দেখিবে!

সৌরেশরা আর দাঁড়াইল না, অগ্রসর হইল। কিন্তু, যতই পা বাড়াইতে লাগিল, ততই তাহাদের চোখে লোক-লোকালয়ের এক বিভীষিকামূর্ত্তি পড়িতে লাগিল—প্রতি নরনারীর মুখে-চোখে উদ্বেগ, আতঙ্ক, মরমের ছায়া! অথচ তাহারা—স্তব্ধ, স্থির, নিথর। হঠাৎ একপাশ হইতে একটা স্বর আসিল—“ধরা প’ড়ে গেছে সব, নিতেও পারেনি কিছু!”

সুরেন চমকিয়া উঠিল, এধার-ওধার তাকাইল, কিন্তু কান্নার মুখ দিয়া যে সেই আওয়াজটি বাহির হইয়াছে, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না।

আর পা-কতক যাইবা-মাত্র আর-এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। একটা বাড়ী হইতে এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ দৌড়িয়া আসিয়া সৌরেশের সম্মুখে উপুর হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবু! আমার ছেলেকে বাঁচান! পেটের দায়ে গিয়েছিল। পাঁচ দিন খেতে পায়নি—"

সৌরেশ থতমত খাইয়া খানিকটা পিছাইয়া গেল। সুরেনের মনে কিন্তু একটা দুর্ভাবনা ঘুরিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে একটা লোকের কাছে গিয়া খবর লইল যে, তাহাদেরই বাড়ীতে গতরাত্রিতে 'ডাকাতি' হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই। পুলিস ছিল—সঙ্গে-সঙ্গে ধরাও সবাই পড়িয়া গিয়াছে। একজন আসামী—ঐ বৃদ্ধের পুত্র, গোব্‌রা চাটুয্যে! আরও শুনিল—কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পুলিস সাহেব আসিয়াছে, আসামীদের চালান হইবে।

কথাটা সৌরেশেরও কানে উঠিল। তদ্দণ্ডেই সে পাশ কাটাইয়া যেমন অগ্রসর হইবে, সম্মুখে আর-একটা মূর্ত্তিমান আতঙ্ক দেখিয়া স্থির হইয়া গেল। লোকে বলে, প্রেত-দেহে শুধু কঙ্কাল আছে, মাংস নাই। কথাটা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে ঐরূপই একটি নারীমূর্ত্তি গায়ের কাপড়-চোপড় টানিতে-টানিতে যেন অতিকষ্টে সৌরেশের পায়ের কাছটিতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে আবরণে দেহ আবৃত করিয়াছিল, তাহা যেমনি ছিন্ন ও জরাজীর্ণ, তেম্‌নি ময়লা, তালি-দেওয়া ও গাঁট-দেওয়া। তাহাকে গৃহস্থ-বধূ বলিয়াই প্রতীয়মান হইল, কেন না, গোটা পিঠ প্রায় খোলা থাকিলেও বস্ত্রের অপর প্রান্ত দিয়া মুখটি সাবধানে ঢাকা। যে কারণেই হউক, বউটি সদ্য-

রাস্তার মাঝে অম্নিধারা ভাঙিয়া পড়িবামাত্র, কোথা হইতে একটি বছর-চারেকের ছেলে কাঁদিতে-কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া বউটির সরু শুষ্ক গলাটা জড়াইয়া ধরিয়াই চুপ করিল। পরক্ষণেই ভয়ে-ভয়ে ডাকিল, "মা, অ-মা—মা—" ডাকিয়াই সৌরেশের প্রতি ভীতনেত্রে চাহিল; সে চাহনিতে কত নিবেদন, কত না প্রার্থনা—যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে, মায়ের কোনও অতি গুরু দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে, আর সম্মুখের ঐ নিষ্ঠুর দস্যুটা তাহার জননীর নিয়ন্তা!

এমন সময়ে একটা দুয়ার-গোড়া হইতে এক চাপা কর্কশ নারীকণ্ঠ আসিল—"আ মর্ ছুঁড়ি, ঢং ক'রে ব'সে রইলি—সোয়ামীর জন্যে ভিক্ষে চা—"

বউটির ঘাড়টা লুটাইয়া পড়িল, এবং শীর্ণ হাত দু'খানি বাড়াইয়া সৌরেশের পায়ে ঠেকাইয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটিও আত্‌কাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সৌরেশ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়াছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াই ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "না, না, কান্না কেন—" বলিয়াই তাহার মুখে চুমু খাইল। তখন সে পিছাইয়া আসিয়াছে।

ছেলেটি এইবার যেন-একটু আশ্বস্ত হইল, এবং ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া অচেনা ঐ লোকটির পানে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তাহার মাকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইল।

সৌরেশ হাসিয়া ছেলেটির মুখে আর-একবার মুখ দিয়া সস্নেহে বলিল, "হ্যাঁ, তোমারও মা, আমারও মা!" অতঃপর বউটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "সব বুঝেছি, মা! কিন্তু, দৈবকে রদ্ করেছিল একমাত্র সাবিত্রীই!" বলিয়াই ছেলেটিকে বউটির কাছে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আর বেশী দূর হাঁটিবার রাস্তা ছিল না, দুই একটা মোড় ঘুরিয়াই উঁহারা উহাদের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিল, এবং যে বিবরণ শুনিয়া আসিল, তাহা চাক্ষুষ করিল, দেখিল—বাহিরকার বৈঠকখানার প্রশস্ত দুয়ারটা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখের বিস্তৃত পতিত খোলা স্থা টা পর্য্যন্ত লোকে ভরিয়া গিয়াছে। প্রথমেই চোখে পড়িল—কতকগুলি রঙীন মাথা, অনুমানে বুঝিল—কনস্টেবল। তারপর—জন-সাধারণ; বুঝিল—ইহারা আসিয়াছে হয় আসামী সনাক্ত করিতে, নয় সাক্ষ্য দিতে, অথবা তামাসা দেখিতে! তারপর চোখে পড়িল—এক পাশে দাঁড়াইয়া উদ্বেগে ও আতঙ্কে অভিভূত আর কতকগুলি লোক; বুঝিল—ইহারা আসামীদের আত্মীয় বা স্বজন। অতঃপর দেখিতে পাইল—ব্যস্তচঞ্চল, কর্ম্মবীর গ্রাম্য-দফাদার, ও তাহার পাশেই ছায়ার ন্যায় সাতখানা গ্রামের চৌকিদার। দুই-এক পা অগ্রসর হইবামাত্র দেখিল—দুয়ারটার উপরে একখানা চেয়ারে বসিয়া স্বয়ং পুলিস-সাহেব ও পার্শ্বে একজন ইন্‌স্পেক্টর। সর্ব্বশেষে একধারে দাঁড়াইয়া প্রায় আট-দশজন জরাজীর্ণ মৃতপ্রায় লোক—হাতে দড়া বাঁধা। পাছে উহারা পলায়ন করে, এতদর্থেই চতুষ্পার্শ্বে জন-চারেক ভীমাকৃতি পশ্চিমা কনস্টেবল—প্রত্যেকের হাতে আন্দাজ আড়াই-সের ওজনের সুদৃশ্য মোটা-মোটা লাঠি।

হঠাৎ, এই মাহেন্দ্রক্ষণে সৌরেশের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সম্মুখের জনতাটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। অতঃপর যেমন করিয়া বড়লোক রাস্তা চলে, তেম্‌নি করিয়াই সৌরেশ পদক্ষেপ করিতে-করিতে অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি—ব্যাপার কি?"

কথায় কেহই কিছু কহিল না, সকলেই পুলিস-সাহেবকে আঙুল মুড়িয়া শুধু মুঠি নির্দ্দেশ করিল। সৌরেশও তথানির্দ্দিষ্ট হইয়া তেম্‌নিই

বিস্ময়ে উপরে উঠিয়া গিয়া যথারীতি সাহেবকে 'সেলাম' করিয়া ইংরাজীতে উক্ত প্রশ্নটি করিল।

সাহেব তখন একটি লোকের জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছিলেন, নীচে দণ্ডায়মান আর-সকলের মতই একজন সাধারণ লোকের অযথা বাধা পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কৌন্ হ্যায় তোম্?"

সৌরেশ তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে ইংরাজীতে জবাব দিল, "বিরক্ত করছি—ক্ষমা করবেন! যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে-স্থানটির মালিক আমি।"

তাহার মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল।

পুলিস-সাহেব অনেক পূর্ব্বেই এই মালিকটির নাম শুনিয়াছেন। শুনিয়াছেন এ পরগণাটার ভিতর উনি রাজা-বিশেষ। অতঃপর এখানে আসিয়াও বহির্দৃষ্টিতে ইহার রাজবাটীর ন্যায় অট্টালিকা ও একটা পাড়া জুড়িয়া ধানের 'গোলা-মরাই' ইত্যাদি নগ্ন ঐশ্বর্য্য চাক্ষুষও করিয়াছেন। একবার তাহার মুখের দিকে ও একটিবার তাহার খালি পায়ের দিকে চাহিয়া দারুণ বিস্ময়ে বলিলেন, "আপনিই মিঃ চ্যাটার্জ্জি—এখানকার লক্ষপতি?"

এবার ইংরাজীতেই কথা হইল।

সহাস্যে সৌরেশ জবাব দিল, "লক্ষপতি ভগবান্—আমি তাঁর অর্থের ট্রাষ্টি।"

সাহেবও হাসিলেন, বলিলেন, "হওয়া উচিতও তাই! তা হ'লে বড়লোক চিরটা-কাল বড়লোকই থেকে যায়—সিংহাসন তাঁদের টলে না!" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়েছে—" আসামীগুলার প্রতি আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন ডাকাত—"

সৌরেশ যেন এক প্রবল বিশ্বাসের উপর ভর দিয়া বলিল, "কিছু নিয়েছে, নিশ্চয়ই ?"

পুলিস-সাহেব সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "এক ফার্দ্দিংও নয় !"

সৌরেশ এইবার এমনিই ভাব দেখাইল, যেন সে দমিয়া গিয়াছে। বলিল, "এক ফার্দ্দিংও না ? তা হ'লে ওদের অভিপ্রায় জেনে আমাকে ওদের প্রাপ্য-গণ্ডা এখনই বুঝিয়ে দিতে হবে।"

সাহেব বিস্ময়ে বলিলেন, "কি বলছেন, মিঃ চ্যাটার্জ্জি ! ওরা ডাকাত—ওদের অভিপ্রায় ছিল আপনাকে ধ্বংস করাই—"

সৌরেশ অবিচলিত-কণ্ঠে বলিল, "ওরা ডাকাতও নয়, ধ্বংস করাও ওদের অভিপ্রায় ছিল না।"

হঠাৎ জনতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক চাপা অস্পষ্ট শব্দ উঠিয়াই স্থির হইয়া গেল। রজ্জুবদ্ধ ঐ কঙ্কালসার তথাকথিত আসামীগুলির বসা নিষ্প্রভ চোখগুলাও সহসা উজ্জ্বল হইয়াই আর্দ্র হইয়া উঠিল। একজন সৌরেশের পানে তাকাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিয়া নিস্তেজ কণ্ঠে বলিল, "বাবু ! আমি পাঁচ দিন খেতে পাইনি—"

সৌরেশ তাহাকে একটা তাড়া দিয়াই সাহেবকে আবার বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ী, আমার অর্থ, আমার সম্পত্তি—আমার সব-কিছুতেই ওদের অংশ আছে।" অতঃপর আসামীগুলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, কণ্ঠ দীপ্ত করিয়া বলিল, "চেয়ে দেখুন ওদের দশা ! যদি কোনও চার্জ্জ আসে, ওদের ওপর আসে না, আসে আমারই ওপর, কেন না, আইনসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত ওদের 'অংশ' থেকে আমি বঞ্চিত ক'রে রেখেছি !"

সাহেবের বিস্ময়ের মাত্রা প্রবল হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ ঘাড় নামাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া সৌরেশের দিকে একটিবার তাকাইয়াই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনার মন আমি প'ড়ে নিয়েছি! বুঝিয়ে আপনাকে বল্‌তে হবে না, কারণ, আমার চেয়ে ও-কথাটা আপনি বেশীই জানেন।" বলিয়াই হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "বসুন—"

সৌরেশ হাত নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না! আপনি বসুন! আমি আর-একখানা চেয়ার আনিয়ে নিচ্ছি—" অদূরে সুরেন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিতেই সে বৈঠকখানা খুলিয়া একখানা চেয়ার আনিয়া দিল।

সাহেব পুনশ্চ আসন গ্রহণ করিয়া প্রসঙ্গটার উপর হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যদি ওদের 'ডিফেণ্ড' করেন, তা হ'লে 'প্রসিকিউশন' 'ফেল' করবে! ফলে, দেশে ডাকাতি বেড়েই চল্‌বে!"

সৌরেশ ধীরকণ্ঠে জবাব দিল, "আপনার কথা অস্বীকার করছিনে, স্বীকারও ক'রে নিতে পারছিনে। দেখুন, অনর্থক 'প্রসিকিউশন' করলেই দেশে ডাকাতি কমে না। ডাকাতি কমে—কারণ নির্ণয় ক'রে 'ট্রিটমেণ্ট' করলেই!"

"অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ, কেন ডাকাতি হচ্ছে, ডিটেকটিভ লাগিয়ে সেই 'কেন'কেই গ্রেপ্তার করা উচিত। তারপর শাস্তি-দণ্ড দিতে হবে ওটাকেই। ডাকাতকে ফাঁসি দিলে, শুধু একটা লোকেরই মৃত্যু হবে, কিন্তু ডাকাতির মৃত্যু হবে না! সে জিনিসটা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে আশ্রয় গ্রহণ করবে!"

সাহেব হঠাৎ কোনও জবাব দিলেন না। ক্ষণপরে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ, আপনি ডাকাতের 'উদ্দেশ্য'কেই আসামী করতে চাইছেন!"

সৌরেশ অবিলম্বেই জবাব দিল, "না। ডাকাতের উদ্দেশ্যকে নয়। আসামী করতে চাইছি—ডাকাতির উদ্দেশ্যকেই! যদি রাজার ছেলে ডাকাতি করে; তা হ'লে সে উদ্দেশ্য তার নিজস্ব। অতএব আসামী সে নিজেই, আইনের সাজা সেই-ই পাবে। আর যদি—" পার্শ্বে দণ্ডায়মান 'আসামী'গুলাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ওদের মতন কেউ, কি, কোনও দল ডাকাতি করে, তা হ'লে আসামী হবে ওর কিংবা ওদের ডাকাতির উদ্দেশ্যই! তাকেই গ্রেপ্তার ক'রে দণ্ড দিতে হবে!"

সাহেব ঈষৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বুঝলুম না ভাল আপনার তর্কটা! কি সে উদ্দেশ্য?"

সৌরেশ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বলিল, "বোধ করি, আমাকে বিদ্রূপই করছেন। কেন না, এ হতেই পারে না যে, একজন শিক্ষিত ইংরেজ এখনও অবুঝ থাক্‌বেন। ক্ষুধার আর্ত্তনাদ থেকে রক্ষা পাওয়াই—ঐ উদ্দেশ্য, সাহেব! সন্ধান নিন্‌—ওদের স্ত্রী-পুত্র, বাপ-মা ক'দিন থেকে খালি পেটে ওদের মুখ চেয়ে রয়েছে!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "এ্যারেস্ট করা উচিত এদের এই দুঃসহ অভাবকেই। আপনি রাজপ্রতিনিধি—এই হাহাকারকেই গ্রেপ্তার ক'রে রাজাকে অনুরোধ করুন—এর মুখে মুঠো-মুঠো ভাত ফেলে দিতে! এর চেয়ে বড় 'প্রসিকিউশন' নেই, শাস্তিও এ অপেক্ষা বড় থাকতে পারে না!"

সাহেব নতনেত্রে চুপ করিয়া থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া হঠাৎ যেন ছুটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওরা মজুর খাটতে পারে ত?"

সৌরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "কারা খাটাবে—বড়লোকে?—অজন্মায়, দুর্ভিক্ষে, অর্থাৎ গরীবের মৃত্যুর দিনে, হয় বড়লোকের কাযকর্ম থাকে না, নয়, সে-সব বন্ধই থাকে।"

সাহেব পুনরপি তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আপনাদের দেশে ত অনেক বড়লোক—জমিদার! তাঁদের কাছে ভিক্ষেও করতে পারে ত!"

যেন বড়কষ্টে সৌরেশের মুখে একটু হাসি আসিল, বলিল, "পারে! কিন্তু, বড়লোক ভিক্ষে দেয় কি না—আমি ত সে-প্রমাণ স্পষ্ট ক'রেই দিয়েছি, সাহেব! ওদের নিজের সম্পত্তি, আমার ব'লে আমি কেড়ে রেখেছি। নাচার হয়ে যদিই বা দখল করতে এসেছিল, পরিণাম—ওরা আজ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে!"

"ধন্যবাদ আপনাকে!" মুখ দিয়া কথাটা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বাহির করিয়াই ঐ ভয়ঙ্কর-রূপী পুলিস-সাহেব যেন স্প্রিঙের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবলে সৌরেশের ডান-হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পুলিসের লোক হলেও, 'পাবলিকে'র সঙ্গে সৌহার্দ্দ পাতাবার অধিকার আমারও আছে!" বলিয়াই ইনস্‌পেক্টরবাবুকে 'আসামী'গুলাকে মুক্ত করিয়া দিবার হুকুম দিলেন। 'আসামী'রা অচিরাৎ মুক্ত হইয়া গেল।

অতঃপর সাহেব একখানা কাগজে কি কতকগুলা লিখিয়া সই করিবার জন্য সৌরেশের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। সৌরেশ আদ্যোপান্ত পড়িয়া সহাস্যে বলিল, "শুধু বাড়ীখানাতেই ওদের অংশ আছে, লিখলেন? সুহৃদ্ ব'লে ব্যথা লাগলো বুঝি—" বলিয়াই সই করিয়া দিল।

সাহেব সৌরেশের হাসিতে যোগ দিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া টুপী মাথায় দিলেন। সৌরেশ তাঁকে রাত্রিতে রাখিবার জন্য বিস্তর ধ্বস্তাধ্বস্তি করিল, কিন্তু সাহেব ঠিক যেন ওজন করিয়া ক্ষমা চাহিয়া মোটরে উঠিয়া পড়িলেন।

অতঃপর অনুরোধটা ইন্‌স্পেক্টরবাবুর উপর আসিল। তিনি তখন স্বীয় সেরেস্তা-পত্র গুছাইয়া একজন কনষ্টেবলের হাতে দিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিতে যাইতেছিলেন। গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্‌ রে বাপ্‌! আপনার সঙ্গে ভাব ক'রে চাকরীটে খোয়াবো!" পরক্ষণেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সাহেবী কায়দায় সৌরেশের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আসামী ছিনিয়ে নিয়েছেন—আপনার বাড়ী জলগ্রহণও করবো না!" বলিয়া ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িলেন, চাবুক মারিবার পূর্ব্বেই ঘোড়ার মুখটা ফিরাইয়া বলিলেন, "কেন জানেন—আমাদের শাস্ত্রের বারণ! কিন্তু আপনাকে বার-বার নমস্কার!" বলিয়াই মাথা নোয়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

পুলিসের লোকজন সবাই গেল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ভীক এক নরকায়, আর তাহারই মুখপানে চাহিয়া স্তব্ধ, মূক, বিহ্বল এক লোকারণ্য।

॰ঃ ষোলো ঃ॰

মুখ ফিরাইয়াই ইন্‌স্পেক্টরবাবুর মনে হইল—এক মূর্ত্তিমান বিস্ময় বুঝি-বা তিনি পিছন করিলেন। পুলিশের কার্যে সারাটা জীবন ঢালিয়া মাপিয়া দিয়া কতদিন না কত সত্য-মিথ্যার অভিনয় দেখিয়াছেন তিনি, কত না ভান চোখে বালি দিয়াছে তাঁর, কিন্তু—একি? এ কোন্ মহিমময় কৌতুক? সারাটা রাস্তা ধরিয়া এই রুক্ষ অথচ বাঞ্ছিত প্রশ্নটি তাঁর চল্‌তি মানব-ধর্ম্মকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

থানায় যখন ফিরিলেন, রাত হইয়াছে। বিশেষ-কিছু কার্য ছিল না, একটু পরেই 'কোয়ার্টারে' চলিয়া গেলেন। উহা থানার গায়েই—খাটি 'সাহেবী-বাংলো'। ভিতরে ঢুকিয়াই ডাকিলেন, "টিউলিপ্—"

পলকেই একটি কক্ষের পর্দা ঠেলিয়া একটি নারীমূর্ত্তি বাহির হইয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবুর হাত ধরিল—তাহার চোখে চশমা, পায়ে জুতা, হাতে রুমাল। বয়স—যৌবন উত্তীর্ণ হয়-হয়, তত্রাপি তাহার সুগোল সুপুষ্ট দেহ, শক্ত পরিচ্ছন্ন গঠন, সবচেয়ে দেহের তীব্র রঙীন-আভা বিগত কাঁচা-বয়সটার যেন এক দুর্দ্দম্য জের টানিয়া রাখিয়াছে, যেন দেবনারীর ন্যায় সে অনন্তযৌবনা—বাহিরে ও দেহের, ও-রূপের এক কোণও খসিবে না!

প্রথম অভ্যর্থনার পরই 'টিউলিপ্' মুখ উঠাইয়া যেমন হাসি দিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে বরণ করিতে যাইবে, মুখের হাসি আঘাত পাইল। বিস্ময়ে কহিল, "মুখ চোখ অমন?"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু 'টিউলিপে'র হাত ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও সর্ব্বাগ্রে সঙ্গিনীকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার সম্মুখে আর-একখানা

চেয়ারে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "আজ একটা গল্প বলবো! একালের নয়—সেই কালের, যে-কালে হরিশ্চন্দ্র গঙ্গার ধারে মড়া পোড়াতেন।"

'টিউলিপ' ইন্‌স্পেক্টরবাবুর মুখের দিকে তাকাইতেই, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আজ হেরে এসেছি!"

"অর্থাৎ—"

"বলি শোনো—"

বলিয়াই ইন্‌স্পেক্টরবাবু আদ্যন্ত ঘটনাটা সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিলেন, "নয় আমার হার?"

'টিউলিপে'র মুখ দেখিয়া প্রতীয়মান হইল, এ-প্রশ্ন যেন তার কানেই যায় নাই, যেন ইন্‌স্পেক্টরবাবুর কাহিনীর ভিড়ে কোথায় সে নিজেকে কখন হারাইয়া ফেলিয়াছে—আকাশ-পাতাল ছুটাছুটি করিয়াও তার খোঁজ মিলিতেছে না! যেন-বা, এই-একটু পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রলয় উঠিয়াছিল, যার ঘাত-প্রতিঘাতে রাশি-রাশি ঘরবাড়ী, গাছপালা, লোক-লোকালয় বিধ্বস্ত, চূর্ণ হইয়া স্তূপাকার হইয়াছে, তাহারই উপরে দাঁড়াইয়া সে একা, আর নীচেকার ধ্বংসস্তূপের উপর তার স্থির দৃষ্টি!

"টিউলিপ!"

এইবার 'টিউলিপে'র মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। কহিল, "শুনিছি!" মিনিটখানেক পরেই বলিয়া উঠিল, "তোমার হার—এ হতেই পারে না!"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু এক অপরিজ্ঞাত বিস্ময়ে 'টিউলিপে'র মুখের দিকে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "যে হার স্বীকার করে, সে হারে না! প্রয়োজন হ'লে তাঁকে তুমিও হারাতে পারো, সে-বুক তোমারও আছে!"

একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "কেমন ক'রে, জান্‌তে চাইছ?—বুকে বুক মিশিয়ে!"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"আমি পুলিশের লোক, তিনি সমাজের মুকুট! বুক যদি বাড়িয়ে না দেন?"

"এ হয় না। হ'লে, তুমি আমার কাছে মিথ্যে হয়ে পড়ো! যে চিত্র তাঁর এই মাত্র আমার চোখে ধরেছ, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে সে মানুষের কাছে 'তুমি-আমি'র কোন অর্থ-ই থাকে না!"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু সম্মোহিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ 'টিউলিপে'র দিকে চাহিয়া থাকিয়া কি বলিতে যাইবেন, কার পদশব্দে থামিয়া গেলেন। দেখিলেন—ভৃত্য আব্দুল চা লইয়া প্রবেশ করিতেছে।

এম্‌নি প্রত্যহই হয়। থানা হইতে ফিরিয়াই এঁরা উভয়ে গল্পগুজব করেন—আব্দুল চা আনিয়া দেয়।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু চায়ের কাপটি মুখে তুলিতেই, 'টিউলিপ' চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল—"ওকি?"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু জিব্‌ কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেগ্‌ ইওর পারডন্‌!" বলিয়াই নিজের কাপটি 'টিউলিপে'র মুখে ধরিলেন, ও বিনিময়ে অপর পক্ষও স্বীয় কাপটি তাঁর মুখে ধরিল।

পর্ব্বটা শেষ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবু একটা চুরুট ধরাইয়া সঙ্গিনীটির দিকে এক প্রকার কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার নির্দ্দেশ—"

হাতটা মাথার উপর তুলিতেই, 'টিউলিপ' খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া রোষ-কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওকি!"

দান

অবশনেত্রে ইন্‌স্পেক্টরবাবু 'টিউলিপে'র দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "স্ত্রীর হুকুম—"

"আবার!—"

"টিউলিপ—"

"নাম ধরেই ডেকো—পুষ্প।"

বলিয়াই মেয়েটি এক ঝলক বিদ্যুতের ন্যায় ঘর হইতে ঠিক্‌রিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঃ সতের ঃ

জনতার ভাঙন ধরিবার আগেই সৌরেশ সর্ব্বাগ্রে 'আসামী'গুলাকে বলিল, "পুলিসের মতন তোমরাও যে চ'লে যাবে, তা হচ্ছে না তোমাদেরই ঘরবাড়ী, এখানে রাত্রিতে আজ খেতে বসতে হবে।" মুখটা জনতার দিকে ফিরাইয়া বলিল, "আর, রেঁধে-বেড়ে খাওয়ানোর ভার আপনাদেরই।"

সকলেই অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়ী থেকে এখ্‌খুনি আমরা আস্‌ছি, বাবু!" বলিয়াই উল্লাসে যেন আত্মহারা হইয়া জনতা ভাঙিতে সুরু করিল, যেন তাহারা মহাপ্রাণ এখানে ফেলিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তেই আবার কুড়াইবার জন্য ফিরিবে!

এইবার বাড়ী ঢুকিতে হইবে। সুরেন চাবি খুলিল, সৌরেশ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া।

সেই সব, সব সেই! তেম্‌নিই সুন্দর, তেম্‌নিই ভয়ঙ্কর!

সুরেনকে পশ্চাতে ফেলিয়া, সেই বারোটা বছরের পূর্ব্বেকার লীলা-নিকেতনের বুক মাড়াইয়া, সৌরেশ অগ্রসর হইল—সেই সব, সব সেই! অধিকক্ষণ নীচে দাঁড়াইল না, উপরে উঠিয়া গেল, চারিদিকে তাকাইল—তেমনিই সুন্দর, তেমনিই ভয়ঙ্কর!

সৌরেশ ভ্রূক্ষেপ করিল না। নিজেই একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিয়াই বলিল, "সুরেন, নেমন্তন্ন ত করলাম—ঘরে চাল-ডাল আছে ত?"

সুরেন হাসিয়া সোৎসাহে বলিল, "দাদাবাবুর ঘরে চাল-ডালের অভাব?"

সৌরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কথা হচ্ছে না। বলি. খুব পুরোনো সরু চাল আছে?—সকলকার পেট সমান ত নয়, অসুখ হ'তে পারে!"

দাদাবাবু কোন্ পথে হাঁটিয়াছে, সুরেন চট্ করিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সত্যি দাদাবাবু! কেউ-কেউ আট-দশ দিন খেতে পায়নি—নতুন চালের ভাত পেটে পড়লে কি আর রক্ষে আছে!" একটু থামিয়াই আবার বলিল, "আছে দাদাবাবু! আপনার জন্যে সরু ধানের চাল ফি-বছরই ক'রে রাখতাম—সেগুলো পুরোনোই হচ্ছে! ডাল?—সব রকমেরই আছে।" বলিয়াই সেখানে আর না দাঁড়াইয়া নীচে হইতে এক ঘটি জল ও গামছা আনিয়া বলিল, "মুখ-হাত ধোন্—বেলাও নেই, পিত্তিও নেই!"

হাত-পা ধোওয়া হইবামাত্র সুরেন একখানা কাপড় আনিয়া বলিল, "কাপড় ছাড়ুন, দাদাবাবু—"

সৌরেশ সুরেনের হাতের কাপড়খানার প্রতি একদৃষ্টে একটিবার তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "মানুষ যত বুড়ো হয়, তত আটপৌরে হয়—কাপড়-চোপড়ও তত আটপৌরে পরতে হয়, জানিস্ রে?"

"আপনি ত দিশি কাপড়ই পরতেন!" বলিয়া সুরেন দাদাবাবুর দিকে তাকাইল।

সৌরেশ আবার হাসিল, বলিল, "খাদা বাতাস পরতাম! কিন্তু, ওরে, ও-সবে সুখ নেই—দেহটা একঘরে হয় বড়! তোর একখানা কাপড় দিতে পারিস্—অমনি মোটা-সোটা?"

সুরেন কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দাদাবাবুর রাস্তাচলার ইতিহাসটা মনে পড়িতেই নিরস্ত হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একখানা মোটা কড়কড়ে কাপড় আনিয়া মনিবের কাছে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

সৌরেশ কাপড়খানাকে হাতে করিয়াই বলিল, "এইবার কিছু খেতে দে—সারাদিন কি খেয়েছি, বল্ ত ?"

সুরেনের মুখখানা শুকাইয়া গেল! মাটির দিকে মুখ করিয়া বলিল, "রসগোল্লা কি সন্দেশ, কিছুই আর গাঁয়ে তৈরী হয় না, দাদাবাবু! ও-গাঁয়ের হাটতলায় যেতে হবে—এখ্খুনিই নিয়ে আস্ছি!"

সৌরেশ তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলিল, "মুড়ি নেই রে, মুড়ি ?"

স্বর্ণের সামগ্রীও অনাদরে হাহাকার করিত এই লোকটির কাছে, আর সেই-ই আজ দুঃখীর খাবার, মুড়ি খাইবে! কথাটা আলোচনা করিতে গিয়াই সুরেনের মন হইতে বিস্ময়ের খিলটা ছুটিয়া গেল। এবং প্রতিবাদমাত্র না করিয়া সে এক বাটি মুড়ি ও একটু গুড় আনিয়া দাদাবাবুর সম্মুখে ধরিয়া দিল।

পাত্রটি দেখিয়াই সৌরেশ যেন আব্দার ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ ক'টি—"

সুরেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আর নেই, দাদাবাবু! ঐ ক'টিই ছিল!"

সৌরেশ হাসিয়া সুরেনকে সপ্রতিভ করিয়া বলিল, "তবে, আচ্ছা গিন্নি তুই ত! হাঁড়ি খালি করলি, তুই মুখে দিবি কি ? আর একটা বাটি নিয়ে আয়—"

ইত্যবসরে সিঁড়ির মুখে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। উভয়েই তাকাইয়া দেখিল—'গোবরা চাটুয্যে'র স্ত্রী সেই ছেলেটিকে কোলে করিয়া উঠিয়া আসিতেছে, তাহার হাতে একখানা মাটির সরা।

সৌরেশ উঠিয়া দ্রুতপদে বউটির কাছে গিয়া বলিল, "বোসো, বোসো। সিঁড়ি ভাঙা তোমার কি সয় মা, ঐ দেহে ?"

বউটি ঘোমটার ভিতর একটু ঘাড় নাড়িয়া ছেলেটিকে নামাইয়া দিল।

সৌরেশ ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা তোমার বস্‌বে না, হ্যাঁ ভাই?"

ছেলেটির নিষ্কলঙ্ক মুখে সে সস্নেহে চুম্বন করিল।

ছেলেটি নির্নিমেষ-নেত্রে ঐ অর্দ্ধেক-নূতন লোকটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বাবা—" বলিয়াই যেন একটু লজ্জায় মায়ের দিকে তাকাইল।

বউটি ঘাড়-নাড়িয়া কি বলিতে ইঙ্গিত করিল।

সৌরেশ ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। ছেলেটি যেন সেই স্পর্শ হইতে নিজেকে তফাতে রাখিবার চেষ্টা করিয়া অন্য-মুখ হইয়া আধ-আধ কথায় বলিল, "বাবা মুয়ি—" বলিয়া মায়ের হাতের সরাটার দিকে আঙুল বাড়াইল।

শিশুর অন্তর কিছুই অস্পষ্ট রাখিল না। সৌরেশ বুঝিল—শিশু মাতৃস্তন মুখে করিয়াই অনাহারী পিতার জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে! তড়িৎ-স্পর্শের ন্যায় সৌরেশের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—এই বাংলার শিশু! ইহার জীবন এম্‌নি ভাবেই আরম্ভ, আর অবসানও ঐ ভাবেই যেমনভাবে তাহার জনক অবসান করিতে বসিয়াছে! সৌরেশের চোখ দু'টা যেন ফাটিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে আর-একবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া নামাইয়া দিয়া মুড়ির বাটিটি আনিয়া ছেলেটির হাতে দিল। ছেলেটি বাটিটা দুই হাতে করিয়া ধরিয়া মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—তাহার মহা আনন্দ!

বোধ করি, বাটিটা শক্ত করিয়াই ছেলেটি ধরিয়াছিল। বাটিটি মা ছেলেটির মুঠি খুলিয়া যেমন লইল, অম্‌নিই সে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেই গোটাকতক মুড়ি, বুঝি-বা তাহা আর কম করিবার নহে!

তন্ত্রাপ্তি, তাহা হইতে গোটা পাঁচেক তুলিয়া লইয়া ছেলেটির মুখে' বউটি গুঁজিয়া দিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ছেলেটির কান্না থামিয়া গেল। অতঃপর ধূলিধূসরিত, ক্ষুধার্ত্ত, শীর্ণ ছেলেকে অতিকষ্টে তুলিয়া বুকে ফেলিয়া সরায় মুড়ি কয়টি ঢালিয়া লইয়া বউটি নামিয়া গেল—তাহার পিঠের কাপড়টা তেম্‌নিই ছেঁড়া, উড়ো-আঁচলের সর্ব্বাংশ তেম্‌নিই গাঢ় মলিন!

সৌরেশ চাহিয়া ছিল, তেম্‌নিই রহিল—স্থির হইয়া। কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ দুটো রগড়াইয়া সুরেনের দিকে তাকাইয়া যেন এক দারুণ খেয়ালের মাথায় বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ রে, সুরেন, ঐ রকম বউ-ঝির দেহ আর দশা বাংলার ঘরে-ঘরে হয় না? আর অম্‌নিধারা দুঃখীর ছেলে? তা হ'লে সত্যযুগ ফিরে আসে!" পরমুহূর্ত্তেই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "ব'সে রইছিস কি রে? কোমর বাঁধ্‌—ওঠ্‌! কত লোককে নেমন্তন্ন করেছিস্‌, হুঁশ নেই?" বলিয়া চাবি চাহিয়া লইয়া নিজেই ভাঁড়ার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল, যেন তাহার পিঠে চাবুক পড়িয়াছে!

তখনও বোধ করি গৃহস্থ-বধূরা তুলসী-মূলে প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল ফেলে নাই, এম্‌নিই সময়ে আহূত, অনাহূত, অনেক লোকই আসিয়া জড় হইল। সকলেই অনাহারী, অর্দ্ধাহারী! 'আসামী'গুলোকে বাদ দিয়া মুখের কথায় আর সবাইকে যে সৌরেশ রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাটিয়া খাওয়াইবার ভারটা দিয়াছিল, তাহা উপকথারই মত হইয়া দাঁড়াইল—যখন লোকগুলি অবাক্‌ হইয়া দেখিতে লাগিল যে, গৃহস্বামী যেন সহস্র হাত বাহির করিয়া প্রায় সারা আয়োজন নিজেই করিয়া তুলিতেছে।

শত মুখ আজ 'বাবু'র বাড়ীর ভাত-তরকারির দিকে তাকাইয়া! 'বাবু' কি আর স্থির থাকিতে পারে? যতক্ষণ না রাঁধা-বাড়া শেষ হইল,

উঠানে পর্য্যন্ত সৌরেশ যেন ছট্ফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার পর একসঙ্গে সকলকে বসাইয়া দিয়া সে নিজেই পরিবেশন করিতে সুরু করিল। ভাত, ডাল আর একটা তরকারি প্রচুর পরিমাণে পাতে দেখিয়া লোকগুলি যেন বিহ্বল হইয়া গেল। এত ভাত, এত ডাল, অমন অত তরকারি যেন চোখে তাহারা দেখে নাই, যেন এক বিস্ময় আসিয়া তাহাদের পাতে পড়িয়াছে!

খেয়ালের উপাদানে যাহার জীবন গঠিত, সে চিরটা কাল খেয়ালীই থাকে, তা তাহার জীবনের ধারা যে দিকে যেমন ভাবেই বহিয়া যাক্ না কেন! সৌরেশের জীবনের ভিত্তি পড়িয়াছিল এক অপ্রতিহত খেয়ালের উপর, এতদিনকার নিত্য-নূতন আব-হাওয়ার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া গেলেও, জীবনটা খেয়ালের মর্য্যাদা-হারা হয় নাই। পরদিন সকাল হইতেই তাহার মাথায় আর এক খেয়াল চাপিল। সুরেনকে বলিল, "ওরে, একজন মুচিকে সঙ্গে ক'রে গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে ব'লে আয়, আজ থেকে এখানে ধান বিলুনো হবে। কথা কানে যাচ্ছে?"

সুরেন দাদাবাবুর মুখপানে একটিবার চাহিয়াই হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে এক পালিও ধান মরায়ে থাকবে না, তা বল্‌ছি!"

সৌরেশ সহজকণ্ঠে বলিল, "দরকার? খেতে পাবো না, ভাবছিস্? ভিক্ষে করবো আমি!" পরক্ষণেই আবার কহিল, "সুরেন, গাঁয়ের এক-একটা লোকের এক-এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে বাড়ীতে মরাই বেঁধেছি—তুই বল্‌ছিস, এক পালিও থাকবে না? ওরে, ওদের কাঁটাসার দেহে রক্ত ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি—কিছু দান করতে যাচ্ছিনে!"

সুরেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া যে কথাগুলি প্রয়োগ করা হইল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সে লজ্জিত হইল না। সগর্ব্বে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "এই জন্যেই চাবি ফেলতে গিয়েছিলাম আমি!

দাদাবাবু, ভিক্ষে আপনাকে করতে হবে না। যদি তাই-ই হয়, গাঁয়ের লোকে মেয়েপুরুষে আপনাকে ভিক্ষে ক'রে এনে খাওয়াবে!" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল, যেন আনন্দে সে আত্মহারা।

ঘোষণাটা বিদ্যুতের ন্যায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেখিতে-দেখিতে, দলে-দলে লোক আসিয়া জড় হইতে লাগিল—কাহারও হাতে ঝুড়ি, কাহারও হাতে ধামা, কাহারও হাতে থলি। অতঃপর, কতদিনকার সঞ্চিত, ইয়ত্তা নাই—সমস্ত ধানই নিঃশেষ করিয়া সকল প্রার্থীকেই বিতরণ করা হইল। বাস্তবিকই এক পালিও ধান অবশিষ্ট রহিল না। সৌরেশও কিছু ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইল না, যেন তাহার অধিকার নাই।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই সৌরেশ গোবরা চাটুয্যে প্রভৃতি কয়েক জন তথাকথিত 'আসামী'কে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "পুলিশ সাহেবের কাছে সেদিন কি ঘোষণা করেছি, তা হয়ত তোমাদের স্মরণ আছে! আমার মতো—তোমরাও এই বাড়ীর অংশীদার—"

তাহারা কি বলিতে-যাইতেছিল, সৌরেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "থামো! আমাকে আগে শেষ করতে দাও—" বলিয়াই ঘরের ভিতর হইতে কিসের একখানা দলিল বাহির করিয়া আনিয়া আবার সুরু করিল, "এখানা 'ট্রাস্টডীড'। তোমাদের ক'জনকে আমার সমস্ত 'স্টেটের ট্রাস্টি' করেছি, অর্থাৎ আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার তোমাদের ওপর অর্পণ করেছি। এক জনের নাম বেশী আছে—সুরেনের। বিষয় তছরূপ করবার অধিকার বা ক্ষমতা তোমাদের কারুর নেই। যা উপস্বত্ব হবে, তা যারা বাস্তবিক অভাবী, তাদের ভাগ ক'রে দেবে—গ্রামেরই হোক্, ভিন্ গ্রামেরই হোক্। পৃথক ক'রে একশো বিঘে জমি রেখেছি, শুধু তারই উপস্বত্ব তোমাদের পারিশ্রমিক।"

একটু থামিয়াই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এক কথায়—আমার জমি-জায়গা, বিষয়-সম্পত্তির আয়ের যতক্ষণ একটা পয়সা, এক পালিও ধান অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ কেউ যেন দেশে নিরস্ত্র, নিরন্ন না থাকে!" বলিয়াই দলিলখানা সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

সকলেই চুপ, নিঃশব্দ! দাদাবাবু এমনিধারা যে একটা কাণ্ড বাধাইবে, তাহা এই ক'দিন ধরিয়া তাহার মুখ দেখিয়া স্থরেন বুঝিতে পারিয়াছিল। এ-কয় দিনের ভিতরই যখনই দাদাবাবুর চেহারা তাহার চোখে পড়িয়াছে তখনই সে লক্ষ্য করিয়াছে, কি এক মারাত্মক চিন্তা দাদাবাবুকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, যেন সে এমন একটা তৃপ্তি চাহে—যাহা দুনিয়ায় মিলে না!

দলিলখানা স্থরেনই কুড়াইয়া লইল, এবং বিশ্রী স্তব্ধতা সেই-ই সর্ব্বাগ্রে ভাঙিয়া বলিল, "আর, আপনি?"

সৌরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "আমি রাস্তার লোক, পথের পথিক!"

স্থরেনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। কিন্তু, সে ভাবটা চাপিয়া ঈষৎ রাগিয়া বলিয়া উঠিল, "অত শত বুঝিনে। আপনার ঘরবাড়ী—"

সৌরেশ তেমনিই হাসিয়া বলিল, "তিলার্দ্ধ স্থান এখানে আমার আর নেই, স্থরেন! ঘরবাড়ী সমস্ত এখন তোদের। আজকের মতই একটু আশ্রয়—তোদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি।" পরক্ষণেই কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, আমার আত্মা—আমার প্রাণের অণু-পরমাণু তোদের সঙ্গেই মিশে থাকবে। তবে এইটুকু জেনে রাখিস্ স্থরেন, প্রথম ভগবানকে স্মরণ না ক'রে যা কিছু করবি সবই মিথ্যা হয়ে দাঁড়াবে! মানুষের নিজের কিছুই করবার থাকে না—যতক্ষণ না ঈশ্বরের ইচ্ছা লাঠি ধ'রে দাঁড়ায়!"

সুরেনের বোধ করি কিছু বলিবার ছিল, তাই সে অধীর হইয়া ডাকিয়া উঠিল, "দাদাবাবু—"

সৌরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, "ওরে, এর চেয়ে বেশী সুখী হ'তে পারতাম না আমি!" বলিয়া উঠিয়া গেল।

তড়িৎগতিতে কথাটা গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল। সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। আলোচনা করিবার সময় কেহ বলিল—লোকটা ক্ষিপ্ত, কেহ বলিল—সন্ন্যাসী, কেহবা শুধুই বিহ্বল হইয়া রহিল। মেয়েমহলে স্থির হইল, রাজা হরিশ্চন্দ্র দেহান্তর গ্রহণ করিয়াছেন!

দিনটা কাটিয়া গেল, আর একটি মাত্র রাত!

কোথায় যাইবে—এ-প্রশ্ন সুরেন তিন-চারিবার করিয়াছিল, কিন্তু সঠিক জবাব সে পায় নাই। এই সামান্য কয় দিনেই সৌরেশ গ্রামের নর-নারীর যেন প্রেমের বস্তু, আরাধ্য সামগ্রী, দেহের প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই মানুষটিই হঠাৎ যে আবার চলিয়া যাইবে, তাহা শুনিয়া সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আর কিছুদিন থাকিবার জন্য সকলে বিস্তর অনুরোধ করিল, কিন্তু সৌরেশ এক-কথায় হাসিয়া জবাব দিল, "দেনা-পাওনার মিটমাট হ'লে খাতক মহাজনের বাড়ী আর থাকতে চায় না। বাইরে এসে হাঁপ ফেলবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে!" কথাটা হাসিমুখ দিয়া নির্গত হইলেও উহা এতই ভারী বলিয়া ঠেকিল যে, গ্রামবাসী উহাকে উঠাইয়া আর নাড়ানাড়ি করিতে সাহস করিল না।

"চমৎকার!" নিশ্বাসের পর নিশ্বাস—কত নিশ্বাস পড়িয়া রজনীর কত পরমায়ু হ্রাস হইয়াছে, তাহার ঠিক নাই, সৌরেশ হঠাৎ মনে-মনে বলিয়া উঠিল—"চমৎকার!" বলিয়াই শয্যায় উঠিয়া বসিল। একটিবার সুরেনের দিকে তাকাইল, দেখিল—সে অচেতন হইয়া ঘুমাইতেছে। শুধু তাহারই চোখে ঘুম নাই, থাকিবার কথাও নহে। এই একটি নিশা

—এই একটি নিশার কয়েক ঘণ্টা পরেই বুঝিবা এখানকার দেনাপাওনা জীবনের মতই মিটাইয়া সে চলিয়া যাইবে। কিন্তু কোথায়? ভাবিল, এই যে এত বড় পৃথিবী, আর এই যে এর কোটি-কোটি নর-নারী—এদের প্রত্যেকেরই আশ্রয় আছে। কিন্তু তাহার?—তিল-মাত্রও ঠাঁই নাই। তাহার সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্দ্ধে, নিম্নে—সমস্ত স্থানই কবে, কোন্ দিন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে! কেন?—পাপে! কেহই যাহা করে নাই, করিবার সন্ধান জানে না, করিবারও নয়—তাহাই, সেই পাপ সে করিয়াছে! আগুন লাগিয়াছে, ছাই হইয়াছে, তত্রাচ সে কোথাও-না-কোথাও পা বাড়াইবার প্রয়াস পাইবে, এই রাত্রিটার অবসানেই! তাহার মৃত্যু হইয়াছে. তত্রাপি সে এই পৃথিবীর বুকে এখনও অবিশ্রান্ত নিশ্বাস ফেলিতে চায়!—চমৎকার! আরও অতিবড় চমৎকার—জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বসেরা, পরিপাটী পাপটিকে সে অর্থ দিয়া, সম্পত্তি দিয়া লোকসেবার ভানে বুঝিবা ঢাকিয়া ফেলিতে চায়! সে না চাহিলেও, তাহার আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসীর চোখে এমনিভাবেই ধূলা পড়িয়া যাইবে! চমৎকার, আশ্চর্য্য, ভয়ঙ্কর! একটা অতি পচা দেহেরও দুর্গন্ধ এক ফোঁটা কুসুম-নির্য্যাসে এমনই ঢাকা পড়ে! পৃথিবী এতই সরল, এমনই নিষ্পাপ, আর তাহারই অন্তঃপুরে সে পাপ করিয়াছে! হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল—এই বাড়ীতে, ঠিক এই জায়গায় আর একজনকে সে 'পাপী' বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল! সে একটি নারী, তাহার নাম 'পুষ্প'! সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, আতঙ্ক হইল—ঐ বুঝি সহস্র মুখ বাহির করিয়া সহস্র-সহস্র 'পুষ্প' তাহাকে আজ ধিক্কার দিতে আসিতেছে! অচিরাৎ আবার তাহার মনে হইল—সে ক্ষমা করিয়াছে, কেন না, সে—নারী! ক্ষমা করিতেই নারীর জন্ম! নতুবা, তাহার মত একটা প্রতারক কবে কোন্ দিন

লয় হইয়া যাইত। কিন্তু—হঠাৎ থামিল। মুহূর্ত্তেই মনে-মনে বলিয়া উঠিল—মিথ্যা কথা! লয় সে বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছে। সত্যের প্রতিমা নারীর মুখ দিয়াই সে শুনিয়াছে—তাহার মৃত্যু হইয়াছে! এই যে এই প্রাণ—এ তাহার জীবনের ভান মাত্র!

উষার আবির্ভাব তখনও হয় নাই, এমন সময় দূরে যুক্ত-কণ্ঠের এক আর্ত্তনাদ উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের শিখা সৌরেশের চোখে পড়িল। সে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া এতক্ষণ বসিয়া ছিল। তাড়াতাড়ি স্থরেনকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, "কেঁদে উঠলো কারা রে? আর ঐ আগুনের হল্‌কা—"

স্থরেন জানালায় মুখ রাখিয়া বলিল, "গোবরা-চাটুয্যের বাড়ী! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সেই বউটিরও গলা পাচ্ছি—"

"সে কি রে—" বলিয়াই সৌরেশ "চল্‌, চল্‌—" বলিতে-বলিতে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় নীচে নামিয়া গেল, যেন তাহার জ্ঞান নাই। স্থরেনও অনুসরণ করিল।

গোবরাদের বাড়ীর সদর-দরজার কপাট-জোড়াটা কিয়দ্দিন পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, বাড়ী ঢুকিবার পথ আবদ্ধ ছিল না। সৌরেশ গোটাকতক লাফ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—একখানা ঘরের দুয়ার জুড়িয়া আগুন ধরিয়াছে, আর গোবরার বউ সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ মারিবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে—তাহাকে ধরিয়া দুইজন লোক। গ্রামের আরও অনেক লোক জমা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই বিহ্বল, নিশ্চেষ্ট—কচিৎ কেহ দু'এক কলসী জল আনিয়া ঐ দাবানলে ছিটা দিতেছে!

সৌরেশকে দেখিয়াই গোবরার বউ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু! ঘরে আমার খোকা—খোকাকে এনে দিন—" বলিয়া সৌরেশের কাছের গোড়ায় ঝটকাইয়া আছড়িয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

সৌরেশ চট্ করিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়া লইল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে গোবরা বিশেষ কোনও স্থানের উদ্দেশে গমন করে। রাত্রিতে একাকী বাহির হইলে তাহার গা-ছম্‌ছম্ করে বলিয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে দাঁড়াইতে যায়—দুয়ারে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়া রাখিয়া। কাছেই কুটি-খড়ের স্তূপ ছিল—ল্যাম্পটা বোধ হয় হঠাৎ উল্টাইয়া গিয়া এই সর্ব্বনেশে কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে!

"বাবু, আমার খোকা—"

সৌরেশ চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই শক্ত হইয়া গোবরাকে বলিল, "চট্ ক'রে একখানা লেপ কি কাঁথা এনে দাও—শীগ্‌গির—'

গরীব-লোকের বাড়ী লেপ থাকে না। একখানা ছেঁড়া কাঁথা কে আনিয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন লোক দুই হাতে দুই কলসী জল আনিয়া আগুনে ঢালিতে যাইতেছিল, তাহার হাত হইতে কলসী দু'টা টানিয়া লইয়া সৌরেশ কাঁথাখানা ভিজাইয়া লইল। অতঃপর কাঁথাখানা গায়ে চাপাইয়া যেমনিই সম্মুখের আগুনের দিকে অগ্রসর হইবে, সুরেন পথ আট্‌কাইয়া ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া কহিল, "কি করছেন, দাদাবাবু—"

দাদাবাবুর সে সময় বোধ করি-বা হাসিয়াই কথা কহিবার কথা। তাই সে স্মিতমুখে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "যা সকলেই করে—" বলিয়াই চকিতে পাশ কাটাইয়া সেই অগ্নি-তরঙ্গের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং

দেখিতে-দেখিতে বুকের ভিতর করিয়া শয্যায় মুড়িয়া খোকাকে আনিয়া বউটির কাছে নামাইয়া দিয়াই আস্তে-আস্তে শুইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর তখনও আগুন যায় নাই, এবং দুয়ারের অনলরাশির বুক চিরিয়া আসিলেও মোড়ক ফুঁড়িয়া তেমন মারাত্মক আঁচ ছেলেটির গায়ে লাগে নাই। ছেলেটিকে নামাইয়া দিতেই সে মাকে চট্ করিয়া চিনিয়াই কোলে গেল। কিন্তু শত সর্ব্বনাশ তখন সৌরেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে! দেখা গেল, তাহার পাঁজরটা পুড়িয়া ঝলসিয়া গিয়াছে, দু'টা পায়েরও চামড়া খানিক-খানিক খুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে! পৃথিবীর সারা বিভীষিকাই স্পষ্ট প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া ঐ শান্ত-শয়ান অভিশপ্ত নরদেহটির উপর নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে, যেনবা উহার আর বিরাম হইবে না!

: আঠারো :

বাস্তবিকই পুষ্পর প্রার্থী ছিল অনেকেই। 'দাদু'র বাড়ী হইতে মনান্তর লইয়া ফিরিবার পরই পুষ্পর স্তাবকেরা তাহাদের বাড়ীতে ভিড় করিতে সুরু করিল। কিন্তু, এবার আর পুষ্পর মা নিজে পাত্র নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিলেন না—ভারার্পণ করিলেন কন্যাকেই। যে কারণেই হোক, পুষ্পর অনুগ্রহ ছিল এই ইন্‌স্পেক্টরবাবুরই উপর বেশী। সুতরাং, আর-সবাইকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া সে ইহাকেই বাছিয়া বরণ করিয়া ফেলিল। অতঃপর এই দীর্ঘকাল স্বামীর সঙ্গে এদেশ-ওদেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি এই অঞ্চলে বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছে।

বেলা বারোটা। ইন্‌স্পেক্টরবাবু থানার কাজকর্ম্ম সারিয়া সবে এইমাত্র 'কোয়াটারে' আসিয়াছেন। ভৃত্য আব্দুল পোষাক খুলিয়া দিতেছে ও পুষ্প নিকটে দাঁড়াইয়া হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে, এমন সময়ে থানা হইতে একজন 'সেপাই' আসিয়া উল্টা হাতে 'সেলাম' করিয়া একখানা 'পিওন-বুক' তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া ধরিল। সঙ্গে নীল-পোষাক-ধারী একজন কুলি। ইন্‌স্পেক্টরবাবু থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, মুখ ফুটিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবার তাঁর উপায় নাই—গম্ভীর মুখে বইখানি টানিয়া লইয়া একটা দুর্ব্বোধ্য অক্ষরে সই দিয়া বিনিময়ে একখানা লম্বা খাম লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ছত্রকতক পড়িতেই তাঁহার মুখখানা হঠাৎ আড়ষ্ট, বিবর্ণ হইয়া গেল।

সে-দৃশ্য পুষ্পর চোখ এড়াইল না, তার মুখেও এক অহেতুক আতঙ্কের ছায়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল,—'কি ?'

"বল্‌ছি—" বলিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবু পত্রখানির আগাগোড়া আর একটিবার পড়িয়া 'সেপায়ে'র হাতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ছোটাবাবু আনেসে দে দেও—রিপোর্ট লিখ্ লেগা—"

"যো হুকুম—" বলিয়া 'সেপাই' কুলিটিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু এইবার পুষ্পর দিকে ফিরিয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "সে-দিন যাঁর কথা বলেছিলাম—মিস্টার চ্যাটার্জ্জি, সৌরেশ চ্যাটার্জ্জি—মনে পড়ে ?"

শীতের রাত্রে আহারের পর হঠাৎ কম্প আসিলে যেমন হয়, তন্মুহূর্ত্তে পুষ্পর নারী-দেহটা তেমনিই ধারা যেন কাঁপিয়া উঠিল। তদ্দণ্ডেই নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "হয়ত পড়ে। কিন্তু, কেন ?"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ফিরে আর দেখা করতে পারিনি। মাপ করতে পার না ?"

যে-সূত্র ধরিয়া কথাটা পড়িল, তাহার সহিত পুষ্প সম্পূর্ণই অপরিচিত এম্‌নিই ভাবটা দেখাইয়া বিস্ময়ে বলিল, "তুমি লোক-জনের সঙ্গে দেখা করনি, তা' আমার কি যে, মাপ চাইছ আমার কাছে ?"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তা নয়! তবে তুমি বলেছিলে না, তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে—"

পুষ্প গলা চাপিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মাই গড্!" রুমালে মুখ মুছিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "এই ব্যাপার! তা হয়ত ব'লে থাকবো, কিন্তু মাথার দিব্যি দিইনি ত যে, তোমাকে 'বেগ্ ইওর পারডন' করতে হবে!" বলিয়াই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটু পরেই আড়চোখে একবার চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল, "সে বলেছিলুম—তোমারই এঁটো সুখ্যাতি মুখে ক'রে! তুমিই ত বলেছিলে—লোকটা খুব নির্ভীক, খুব স্বার্থহীন, খুব সন্ন্যাসী! তুমিই ত বলেছিলে—লোকটা খুব মহৎ, খুব উঁচু, খুব চমৎকার! তাই বলেছিলুম—আলাপ কোরো, বুকে বুক ফেলে—তোমার বুকের রূপটি একবার দেখো!" মুখ

ফুঁপিয়া একটু হাসিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "বলনি তুমি—হেরে এসেছি?"

"ক্ষমা চাইছি—তাই ত! তোমার হুকুম পালন করতে পারিনি, পারবার হয়ত বা সুযোগও পাবো না, আর!" বলিয়াই ইন্‌স্পেক্টরবাবু মাথা নীচু করিলেন। পরক্ষণেই মাথা তুলিয়া কহিলেন, "রিপোর্ট এলো, তিনি সাংঘাতিক পুড়ে গেছেন—হাসপাতালে আনা হয়েছে।"

একটিবার পুষ্পর চোখদুটা বড় হইয়া উঠিল—যেন এক দুর্দ্দান্ত অন্তঃশক্তি তাহার চোখ দিয়া বাহির হইয়া সহরের ঐ হাসপাতালের পোড়া-রোগীটার উপর রশ্মি ফেলিয়াছে এবং ঐ রশ্মির সূত্র দিয়া রোগীর যন্ত্রণা রাশি-রাশি তাহার বুকের ভিতর আসিয়া স্তূপাকার হইয়া গিয়াছে!

একটা কথা পড়িয়াছে, জবাব দিতে হইবে! কাযেই সে বলিল, "পুড়ে ত অনেকেই যায়, তিনিও গেছেন—তবে তিনি সাধু মানুষ এই যা। কিন্তু, অত মন খারাপ কেন?"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু সলজ্জ দৃষ্টিতে পুষ্পর দিকে একটিবার তাকাইয়াই আধ-খোলা পোষাক আবার আঁটিয়া পরিয়া আব্দুলকে বলিলেন, "ঘোড়ায় সাজ দিতে বল্—"

পুষ্প বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন?"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, "দেখে আসি। 'পারমিশন' নিচ্ছি—"

"এখন—এখ্‌খুনিই?"—পুষ্প স্বামীর হাত ধরিল। স্পষ্টই টের পাওয়া গেল, কথাটা উচ্চারণ করিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বর সহসা অশ্রু-বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যে মহা-সংযমের বাস্তভাণ্ড সে নিজেই এইমাত্র তুলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণই নিষ্ফল, ব্যর্থ হইয়া গেল!

ইন্‌স্পেক্টরবাবুও তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একদৃষ্টে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া এক-একটি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "না, না! আমাকে ঘুলিয়ে দিয়ো না! আমি তোমার অর্দ্ধেকটুকু বলে যে তোমার-আমার অন্তর-বৃত্তিও কাঁটায়-কাঁটায় সমান হবে, এ বিশ্বাস আমায় আজ করতে দিয়ো না! আমি যে পুলিসের লোক—মূর্তিমান বজ্র। বিশ্বাস করতে দাও, তোমার নির্দ্দেশকে, যে, ঐ লোকটির মহিমার আজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাসত্ব ক'রে অন্তত তোমাকেও যেন ঠকাতে পারি!" বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

পুষ্প খানিকক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, অতঃপর আস্তে-আস্তে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, যেন তাহার বুকের ভিতর আজ এক বিরাট অভিনয় হইয়া গিয়াছে—অনেক লোকজন আসিয়াছিল, তাহারা সবাই চলিয়া গিয়াছে—অনেক বাজনা বাজিয়াছিল, সমস্তই নীরব হইয়াছে—অনেক নাচ, অনেক গান, অনেক রাগিণী উঠিয়াছিল, সবই এইমাত্র স্থির হইয়া গিয়াছে! নারীমূর্ত্তিটির এই সর্ব্বশূন্য রক্তমাংসের কাঠামোখানা যেন এক টাট্‌কা অতীতের চাপা-রহস্যের উপর ভর দিয়া শুদ্ধ হইয়াই রহিল!

অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, সে হঠাৎ নিজেকে যেন ঝাড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং চঞ্চল পদক্ষেপে একখানা দাঁড়-করানো বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া নিজের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজ-সজ্জা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বিবিধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া মনে-মনে বলিয়া উঠিল, "কেন, কিসের জন্য? আমি 'কাল্‌চার্ড ওম্যান'—'কোর্টশিপ' করেছি!" বলিয়াই আব্দুলকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিল, "চা, টোস্ট, আর ডিম—"

অচিরাৎ আদেশ পালিত হইল। উক্ত আহার্য্যের যথারীতি সদ্গতি করিয়া পুষ্প আবার নিজেকে আয়নাটির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মনে-মনে

বলিয়া উঠিল, "ইয়েস্! এটিকেট—এটিকেট! সমস্ত-এ 'গ্রাণ্ড এটিকেট'!" বলিয়া কক্ষটির বুক মাড়াইয়া পায়চারী করিতে লাগিল। মিনিট কয়েক পরেই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং অকস্মাৎ অকারণে চোখমুখ আড়ষ্ট করিয়া পরিত্যক্ত চায়ের কাপ ও টোস্ট-ডিমের প্লেট-গুলা একে-একে জানালা দিয়া টান মারিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াই পুনশ্চ চেয়ারে বসিয়া পড়িল, অবসন্ন হইয়া।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে-তিনটা, ইন্স্পেক্টরবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ছাড়িয়া যাওয়া কক্ষটির পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই যেন ভিতরে ভূত নাচিয়া গেল। 'পুষ্প' তখনও তেম্‌নিই ভাবে বসিয়া আছে, স্বামীকে দেখিয়াই যেন সঠিক করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি দেখে এলে বল্‌বো আমি—হ্যা দেখতে পাওনি, নয়, আর দু' একদিন! কেমন ত?"

পুষ্প উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্স্পেক্টরবাবু একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মুখখানা শুষ্ক করিয়া বলিলেন, "কতকটা তাই-ই। কেস্ খুবই খারাপ।" একটু চুপ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, মুখটি তেম্‌নি প্রশান্ত, তেম্‌নি স্থির, অবিকল তেম্‌নি ধারাই মিষ্টি! আশ্চর্য্য, ঝাড়া এক ঘণ্টা আমার সঙ্গে কথা কইলেন—কি সুস্থির হয়ে!"

পুষ্প যেন প্রসঙ্গটাকে লঘু করিবার চেষ্টা করিয়া মুখ টিপিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, 'জীজস্-ক্রাইস্ট'—'ক্রুসিফাই' করছে, তবুও দৃক্‌পাত নেই!"

প্রবলবেগে ঘাড় দোলাইয়া ইন্স্পেক্টরবাবু বলিয়া উঠিলেন, "তাই, তাই! আমি বল্‌ছি—ঠিক তাই-ই!"

পুষ্প স্বামীর দিকে একটিবারমাত্র তাকাইয়াই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

ইন্স্পেক্টরবাবুও আর কোন কথা পাড়িলেন না, আব্দুলকে ডাকিয়া গানায় ধড়া-চূড়া ছাড়াইতে লাগিলেন। কোট-প্যাণ্ট খুলিয়া আব্দুল যথারীতি যেমন কক্ষের আল্‌নায় রাখিতে যাইবে, পুষ্প হাত নাড়িয়া বারণ করিল।

ইন্স্পেক্টরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

পুষ্প গম্ভীরভাবে বলিল, "না, মেঝের একপাশে রেখে দিক্—কেচে দিতে হবে।"

ইন্স্পেক্টরবাবুর মনে একটু কৌতূহলের উদ্রেক হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেচে দিতে হবে—কেন?"

তেম্‌নি ভাবেই পুষ্প প্রত্যুত্তর করিল, "আল্‌নায় আমার সাড়ী-সেমিজ রয়েছে, দেখছ না? পোড়া-রোগীকে ছুঁয়ে এসেছ—তোমার কোট-প্যাণ্ট আমার কাপড়-চোপড়ে ঠেকাবো না।"

জবাব দিবার আর বিন্দুমাত্র শক্তি অতবড় পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখে আসিল না। শুধু তিনি বিস্ময়ে এই রহস্যটাই নিজের চোখের উপর বড় করিয়া ধরিয়া রহিলেন যে, এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটার উপর পুষ্প আজ ফুল-চন্দন ফেলিতে চায় কেন? কোন্ হিসাবে তাঁহার নাস্তিক পরিবারের গৃহকর্ত্রী এমন বিষম কুসংস্কারকে আরতি করিয়া যাইবে? মেথর ঘর ঝাঁট দেয়, আব্দুল 'খানা' রাঁধে, এরা সকলেই সংসারের প্রতি দ্রব্যে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অথচ এ-সমস্ত অনাচার তাহার ছোঁয়াছুঁয়ির আইনে কোনও দিনই পড়ে নাই, তবে এক পোড়া-রোগীর 'স্পর্শ'কে অশুচি বলিয়া সে এরূপ নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়া বসিল কেন? যাহাই হউক, মীমাংসাটাকে আপাতত স্থগিত রাখিয়া ইন্স্পেক্টরবাবু 'বাথরুমে' গেলেন, পুষ্পও উঠিয়া অন্যত্র গেল।

স্নানাদি সারিয়া, ইন্স্পেক্টরবাবু শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন ও

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেমন চিরুণী-ব্রুশে হাত দিবেন, পশ্চাতে কাহার ভারী গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন—"একটু পরে!"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—পুষ্প! কিন্তু, এ কি তাহার মূর্ত্তি, এ কোন্ বেশ! তাহার নগ্নপদ, নগ্নচক্ষু, গায়ে সেমিজ-ব্লাউসের বালাই নাই, পরিধানে—চওড়া লালপেড়ে তসর-সাড়ী,—কপালে—বড় একটি সিঁদুরের টিপ! বোধ করি সদ্যঃস্নাতা, তাই রাশীকৃত এলোচুল গড়াইয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতেছে! হাতে একখণ্ড কিসের বস্ত্র ও একটি তাম্রপাত্র করিয়া খানিকটা মৃত্তিকা!

পুষ্প ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া জল-হাতে একটু স্থান মুছিয়া উক্ত বস্ত্রখণ্ডটি পাতিয়া, ও একধারে মৃত্তিকা-পাত্রটি রাখিয়া বলিল, "আগে জপ করো। একমনে 'হরিনাম' তিনবার, কি ন'বার, কি একশ-আটবার—যা পার বলো! তারপর মাথায় চিরুণী দিয়ো—আমি টেরী কেটে দেব!"

আগেকার রহস্যের মীমাংসা তখনও হয় নাই, তদুপরি এই আর-একটা সম্পূর্ণ বিদ্রোহী অনুষ্ঠানের ঘটা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টরবাবু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তন্ময় হইয়া স্ত্রীর ঐ পরিচয়বিহীন অদ্ভুত মূর্ত্তির দিকে মিনিট কয়েক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমার খেয়ালের কৈফিয়ৎ কোনও দিন চাইনি, আজও চাইব না।" একটু জোর করিয়া হাসিয়া বিস্তৃত বস্ত্রখণ্ডের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন, "কিন্তু ওটা কি—আসন?"

স্বাভাবিক কণ্ঠে পুষ্প জবাব দিল, "হ্যাঁ! আমার শালখানা ছিঁড়ে তৈরী করলুম—ঘরে কি অন্য কিছু আছে।"

ইন্‌স্পেক্টরবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়াই আবার নীরব হইয়া গেলেন। একটু পরে আবার মৃৎপাত্রটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আর ও মাটীগুলো—"

পুষ্প জিব্ কাটিয়া মুখ নামাইল। তৎক্ষণাৎ আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "মাটী নয়—মৃত্তিকা! ঘরে ত গঙ্গাজল নেই, বাইরে একটি তুলসী-গাছ আছে—তারই গোড়ার 'মৃত্তিকা' উঠিয়ে এনেছি। স্পর্শ ক'রে জপে বসো।"

ইনস্পেক্টরবাবু আর কথান্তর করিলেন না, আসন গ্রহণ করিলেন। কেন করিলেন, করিলে কি হইবে, করিবার প্রয়োজনই বা কি—এ সমস্ত বিচার করিবার বালাই গ্রহণ করিলেন না। স্ত্রীর ইচ্ছা, স্ত্রীর খেয়াল—তাই করিলেন।

জপে বসিয়াই তিনি মুস্কিলে পড়িলেন। কেন না, অক্ষরগুলা এম্‌নিই উচ্চারণ করিলে হইবে না, একমন হইয়া করিতে হইবে—স্ত্রী বলিয়াছে, তাহার ইচ্ছা, তাহার খেয়াল—ভান করিলে, অনুষ্ঠানটিকে মিথ্যা করিলে চলিবে না ত! কিন্তু, যতবারই একমন হইতে যান, ততবারই তাঁহার বুকের ভিতর হইতে মন যেন পিছলাইয়া ধাইয়া যায় কোনও আসামী গ্রেপ্তারের দিকে, নয় কোনও ডাকাতির তদন্তে! তত্রাপি তিনি প্রাণপণ শক্তিতে লাগিয়াছেন। একবার, দু'বার, পাঁচবার—কতবার তাহার ইয়ত্তা নাই, মরীয়া হইয়া চেষ্টা করিবার পর হঠাৎ যেন অদ্ভুত উল্লাসে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ব্যস্! তিনবার একসঙ্গে একমনে 'হরিনাম' ব'লে ফেলেছি! পারা যায় কি ধরতে মনটাকে—ফেরারী আসামীর মত অনেক কাণ্ড ক'রে গ্রেপ্তার করেছি! এইবার উঠি—উঠবো?"

পুষ্প তেমনিই ভুবন-বিজয়ী মূর্ত্তি ধরিয়া একদৃষ্টে স্বামীর দিকে এতক্ষণ চাহিয়া ছিল, হাসিয়া বলিল, "থাকো না আর একটু! আচ্ছা, এইবার ন' বার—"

ইনস্পেক্টরবাবুর মুখখানা শুকাইয়া গেল। পরক্ষণেই প্রবল উদ্যমে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা! মনে করবো—বেটার-হেল ফেরারীটা

থানা থেকে ফের পালিয়েছে—আবার ধরতে হবে—" বলিয়াই আবার চোখ বুজিলেন।

দু'মিনিট, পাঁচ মিনিট—প্রায় অর্দ্ধ-ঘটিকার পর পুষ্প দেখিল—সাধকের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া অবিরল ঘাম বাহির হইতেছে, মুখটি মাঝে-মাঝে আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মিনিটের পর মিনট অতিবাহিত হইয়াছে, পুষ্প স্বামীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল, দেখিল—দেহে আর ঘাম নাই, চোখ-মুখ—সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইয়াছে! যেন এক তীব্র আলস্যে দেহটি ছাইয়া গিয়াছে! পুষ্প আস্তে-আস্তে স্বামীকে স্পর্শ করিল, করিতেই তিনি চম্‌কিয়া চোখ খুলিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিলেন, "কেন, হয়নি ন' বার?"

পুষ্প বলিল, "মজা ত! আমি কি ক'রে জান্‌বো—গোনোনি তুমি?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "না! পাঁচ-ছয় পর্য্যন্ত গুনে আর পারিনি! আচ্ছা, ফের আবার বসছি—এবার ঠিক গুনে রাখ্‌বো!"

পুষ্প মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর থাক্—আবার সন্ধ্যায়! তারপর কাল সকালে, ফের সন্ধ্যায়—দিনে দু'বার, ঠিক এই রকম—এমনি ধারাই, এক মনে! পারবে ত?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু নির্নিমেষ-নেত্রে কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর বিজয়ী চেহারাটির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমার লাভ?"

পুষ্প অবিলম্বেই জবাব দিল, "মনে করবো, দু'খানা গহনা পেয়েছি!" বলিয়াই তুলসী-মৃত্তিকার পাত্রটি উঠাইয়া লইয়া স্বামীকে আসন ছাড়িয়া দিতে বলিল।

ইনস্‌পেক্টরবাবু উঠিতে-উঠিতে বলিলেন, "আচ্ছা, এতদিন ত বলনি?"

পুষ্প মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া হঠাৎ মুখখানা ভারী করিয়া জবাব দিল, "হাসপাতালে তীর্থ ক'রে এসেছ কিনা, তাই আজ থেকেই বলছি—দেহ শুদ্ধ হয়েছে!"

কথাটা বলিয়া পুষ্প চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই ইনস্‌পেক্টরবাবু বলিলেন, "আমার বুঝি আর ক্ষিদে-টিদে পায়নি—"

"যাও না আর-একবার হাসপাতালে, পেট ভরবে খুব!" ঠোকা মারিয়া কথাটা বলিয়াই পুষ্প ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক থালা ফলমূল আনিয়া বলিল, "ডিনারের মৃত্যু হয়েছে—এবেলাটুকু শুকিয়েই থাকতে হবে।" বলিয়া হাসি চাপিতে-চাপিতে থালাটি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

ইনস্‌পেক্টরবাবু কথাটি কহিলেন না। ফলমূলগুলাকে উদরস্থ করিয়া স্বতন্ত্র একটা 'স্যুট' পরিয়া প্রতিদিনকার মত আবার 'থানা'য় বাহির হইয়া গেলেন।

বেশী বেলা ছিল না। তত্রাপি সেটুকু আজ বড়ই শক্ত হইয়া পুষ্পর বুকে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল, যেন এক ছন্দহারা শোকগীতি কোন্ শ্মশান হইতে হঠাৎ উঠিয়া তাহার বুকে আসিয়া নীরব হইয়াছে—তাহার ভাষায় অনন্ত ভিক্ষা, অথচ সবই খাপছাড়া, সবই অর্থহীন!

সহরের অনেক বাড়ীতে প্রদীপ জ্বলিয়াছে, অনেক বাড়ীতে জ্বলে নাই—এম্‌নিই সময়ে, পুষ্প আব্দুলকে ডাকিয়া বলিল—"আজ রেঁধো না তুমি, দরকার নেই।" মেথরকে ডাকিয়া বলিল—"কিছু মনে কোরো না। আর আমাদের ঘর-দুয়ারে ঢুকো না, কোনও জিনিষপত্রও ছুঁয়ো না!" অতঃপর, উভয়কেই অপরিসীম স্নেহে বলিল, "আর একটা কথা বলতে যাচ্ছি—তোমাদের কাছে শক্তই ঠেকবে! সেজন্যে আমাকে 'মা' ব'লে তোমরা ক্ষমা করো!" হঠাৎ চোখে একটু জল আসিল, তাহাদের সম্মুখেই

বুছিয়া বলিল, "তোমরা গুণের সন্তান—চাকর‍্যা চের জুটবে। কাল থেকে অন্য জায়গায় কায খুঁজে নিয়ো—" বলিয়াই উভয়ের হাতে কতকগুলা নোট ফেলিয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

হঠাৎ এইরূপ জবাবের কারণ বুঝিতে না পারিয়া উভয়েই যেন মূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর অতগুলা নোট একসঙ্গে হাতে পাইয়া তাহাদের চমক ভাঙিল। নোটগুলা গনিয়া দেখিল—তাহাদের ছয় মাসের করিয়া বেতন!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়-হয়। পুষ্প একখানা মাটীর সরায় ধুনা দিয়া শয়নকক্ষটি ধোঁয়ায় ভরিয়া দিয়াছে—আজ এই প্রথম! তারপর, একটি পাশে দাঁড়াইয়া গলায় আঁচল ফেলিয়া হাত দুটি জড় করিয়া কাহার উদ্দেশে মাথায় একবার ঠেকাইয়া পৃথিবীর বহির্দৃশ্য পানে চাহিতেই দেখিল—চৌকাঠের বাহিরে ইনস্‌পেক্টরবাবু দাঁড়াইয়া।

পুষ্প বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালে?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু ব্যস্ত হইয়া জবাব দিলেন, "জপ করতে হবে না? তুমি যে বলেছ—সন্ধ্যায়!"

পুষ্প একমুখ হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আমিও তাই ভাবছিলুম, মনে করছিলুম—একটু আফিঙ্‌ ধরাবো!"

ইনস্‌পেক্টরবাবুও হাসিয়া ঘরে পা বাড়াইতেই, পুষ্প তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও নয়, ও নয়! দয়া ক'রে জুতোটা বাইরেই রেখে এসো!" বলিয়াই একখানা গরদের কাপড় আনিয়া চৌকাঠের উপর রাখিয়া বলিল, "এই কাপড় রইলো। অম্‌নি বাইরেই খোলোস ছেড়ে ঘরে ঢুকো, আমি জায়গা করি—"

ইনস্‌পেক্টরবাবু তাড়া খাইয়া তিন হাত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু

হাসিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! পাকা হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে দাঁড়ালে দেখছি— আর আমারও হাড়ির হাল!" বলিয়াই তিনি জুতা খুলিয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিলেন ও এদিকে পুষ্প জপের জায়গা করিতে লাগিল।

অতঃপর পূর্ব্ব-প্রণালী অনুযায়ী ইনস্পেক্টরবাবু জপে বসিতেই পুষ্পর আর-এক খেয়াল চাপিল, বলিয়া উঠিল, "ও কি করছ? জপ করতে কে তোমাকে সাধাসাধি করছে? এক মজা করো—শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ভাবো! এম্‌নিই একমনে ভাববে যে, তাঁর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত এক চাউনিতে দেখতে পাও!"

"তাকিয়ে ত?" ইনস্পেক্টরবাবু জিজ্ঞাসু হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

কক্ষের তীব্র আলোকে পুষ্পর মুখটি চক্-চক্ করিতেছিল, মাথার কাপড়টা একটু উপর দিকে উঠাইয়া বলিল, "তা হ'লে আমারই মুখ তোমার চোখে পড়বে!"

"তবে, পেছুন ফিরে?"

"সে দিকে তোমার স্বার্থ—দেওয়াল! ঘরের প্রতি ইঁটখানাই তোমার চোখে ঠেকবে।"

"ভারি মুস্কিল ত! আচ্ছা, তুমি বলছ—চোখই বুজলাম।" বলিয়া ঐ নাস্তিক লোকটি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, বুঝিবা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ধ্যান রাখিতেই।

মিনিট পনেরো কাটিবার পর তিনি চোখ খুলিয়া হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হচ্ছে না যে! হয় পা, নয় হাত, নয় মুখ—একটা-না-একটা বাদ প'ড়ে যাচ্ছে!"

"হবে। সকলেরই হয়—তোমারও হবে।" পুষ্প আর সেখানে দাঁড়াইল না।

স্বামী

ভিজা-কাপড়ে আগুনের আঁচ লাগার মত, ইনস্‌পেক্টরবাবুর মনের নৈরাশ্য সহসা যেন উড়িয়া গেল। পুনশ্চ বিপুল উদ্যমে ধ্যানস্থ হইলেন।

প্রায় আধঘণ্টাকাল কাটিয়া গিয়াছে, পুষ্প ঘরে ঢুকিল। দেখিল স্বামী তখনও মুদ্রিতনেত্র। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া ঐ ধ্যানস্থ মূর্ত্তিটির দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিয়া হেঁট হইয়া আস্তে-আস্তে তাঁহার চোখ দুইটা খুলিয়া দিয়াই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ মুখ দিয়া ইনস্‌পেক্টরবাবুর কোন কথাই বাহির হইল না। শূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "কি করলে তুমি? একটুখানি বাকী ছিল—একটুখানি—শুধু হাত দু'টি! এখ্‌খুনি তোমায় বল্‌তাম —হয়েছে!"

পুষ্প সহাস্যে বলিল, "না বল্‌লেও আমি জানি—হতোই। আবার কাল হবে।" অতঃপর হঠাৎ মনে পড়িয়াছে, এম্‌নিই ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "এ বেলা হাসপাতালে গেলে না—খবর পেয়েছ বুঝি?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু তীব্র সংশয়ে স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "ও-বেলা মুখ ভারী করলে না তুমি?"

"ওঃ, বটেই ত!" যেন এক পরিত্যক্ত সঠিক কথা স্মরণ করিয়াই পুষ্প বাহির হইয়া গেল।

প্রতিদিনই আহারের সময় পুষ্প স্বামীকে ডাকিয়া লইয়া 'ডাইনিংরুমে' যায় ও উভয়ে একত্র আহারে বসে। আজও যথাসময়ে সে স্বামীকে ডাকিতে আসিল। ইনস্‌পেক্টরবাবু সারাটা দিন প্রায় অভুক্তই ছিলেন, তাড়াতাড়ি 'ডাইনিংরুমে'র দিকে অগ্রসর হইতেই পুষ্প বাধা দিয়া বলিল, "ওখানে নয়। রান্নাঘরের একপাশে

'ঠাঁই' করেছি—" বলিয়াই ত্বরিতপদে রন্ধনশালায় গিয়া উঠিল।
ইনস্‌পেক্টরবাবুও বিনা বাক্যব্যয়ে তদনুসরণ করিলেন।

মূল্যবান অতিথি আসিলে যেমন গৃহস্থ তাহাকে আদর করে, তেমনই পুষ্প স্বামীকে আদর করিয়া একখানা পাতা-আসনে বসাইয়া কোলের গোড়ায় একথালা লুচি-তরকারী ধরিয়া দিল।

ইনস্‌পেক্টরবাবু মুখ দিয়া একটি বাক্যও নির্গত করিলেন না। স্বচ্ছন্দে খাবারগুলা গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। শেষের লুচিখানায় হাত দিতেই পুষ্প থালাটা খপ্ করিয়া উঠাইয়া লইয়া বলিল, "এখানা থাক্।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি অবাক্ হচ্ছ না?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে পলকবিহীন নেত্রে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "কিচ্ছু না। আমি খুবই সহজ, নইলে আমার পরিচয় তোমার কাছে মিথ্যা হয়ে পড়তো! এ কথা তোমারই শপথ ক'রে বল্‌ছি।"

কথাটায় যেন কান না দিয়াই পুষ্প আবার বলিল, "আব্দুল আর মেথরকে জবাব দিয়েছি। আমি নিজেই রাঁধবো, নিজেই তোমার কোলে ভাত বেড়ে দেব—ওদের ছোঁয়াছুঁয়ি আর চল্‌বে না। মজা লাগছে, নয়?"

অতি সহজকণ্ঠেই ইনস্‌পেক্টরবাবু জবাব দিলেন, "না, লাগেনি। তুমি বাজীকর নও যে, মিথ্যার চমকে আমাকে মজা দেখাবে। তুমি যে স্ত্রী!"

পুষ্প একটু ঠোকা মারিয়া বলিল, "আমিই বা কোন্ বল্‌ছি—শালী-শালাজ! কিন্তু, এমন ওলট-পালট এক কথায় সয়ে যাবে তুমি?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু তেমনি করিয়াই জবাব দিলেন, "বলেছি ত, না হ'লে, আমার আমিত্ব তোমার কাছে মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়।" বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

: উনিশ :

দিন কুড়িক অতিবাহিত হইয়াছে।

ইনস্‌পেক্টরবাবু এখন প্রত্যহই জপ-আহ্নিক করেন, পুষ্পকে আর গুরুগিরি করিতে হয় না। এ দিকে গৃহস্থের রান্নাবান্নাও পুষ্প স্বহস্তে করে, হিন্দু পাচক-পাচিকাও রাখে নাই। রাখিবার কথাটা ইনস্‌পেক্টর-বাবুও কোনদিন বলেন নাই—যেন বলিবার তাঁহার অধিকার নাই।

একদিন রাত্রিকালে রান্নাঘরে বসিয়া আহার সারিয়া ইনস্‌পেক্টর-বাবু যেমন শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়াইবেন, এমন সময়ে একজন 'সেপাই' গলার সাড়া দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

শয়নকক্ষে উঠিবার মুখে একটি আলো জ্বলিতেছিল, ত্বরিতপদে আলোটার কাছে গিয়া চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে-পড়িতে ইনস্‌পেক্টর-বাবুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। আলোর কাছেই তাঁহার মুখখানা নামানো ছিল, পুষ্প রান্নাঘর হইতে স্বামীর মুখের আকৃতির অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখিয়াই তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

পাণ্ডুর মুখখানা স্ত্রীর দিকে উঠাইয়া ইনস্‌পেক্টরবাবু কহিলেন, "আমি ত আর হাসপাতালে যাইনে—লোক পাঠাই—"

পুষ্পর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল—যেন এক নিবিড় বনে পড়ন্ত বেলার রোদ পড়িয়াছে! বলিল, "আমি ত আর রামায়ণ গাইতে বলিনি! জিজ্ঞেস্ করেছি—মুখ অমন শুকোলো কেন?"

খানিক ইতস্তত করিয়া ইনস্‌পেক্টরবাবু যেন নিতান্ত অশ্রদ্ধায় বলিলেন, "সেই পোড়া-রুগীটের কথা ডাক্তারবাবু লিখেছেন—তাঁর

কাছে লোক পাঠাই কিনা!" একটা ঢোঁক গিলিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "আবার যাই—ছোঁয়াছুঁয়ি করতে!"

পুষ্প আড়চোখে স্বামীর দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে আর রক্ষে আছে—কার শাসন!" একটু থামিয়াই আবার বলিল, "কিন্তু, লোকটা হয় নেই, নয় আজকাল—এই ত খবর?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু বলিলেন, "তা নয়! বাঁচবে—ঘাও বুজতে সুরু হয়েছে। তবে—"

"তবে কি —" পুষ্প স্বামীর দিকে তাকাইল, যেন তাহার চোখে এক কৌতূহল হঠাৎ মাতাল হইয়া উঠিয়াছে!

ইনস্‌পেক্টরবাবু বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন, "তবে, তাঁর দেহটি কুঁচ্‌কে-কুঁক্‌ড়ে বড় কুশ্রী, বেমানান হয়ে যাবে—অমন নিখুঁত চেহারা!"

পুষ্প খোলা রান্নাঘরের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়াই শ্লেষ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইস্‌! ও-টুকুও সইবে না প্রাণে?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু ঈষৎ হাসিলেন। অতঃপর মুখখানা তেম্‌নিই শুষ্ক করিয়া বলিলেন, "অনেকটা শোধ্‌রায়, ক্ষতস্থানে বসাবার চামড়া যদি কেউ দেয়—স্কিন্‌ গ্র্যাফ্‌ট করলে!"

পুষ্প যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, পট্‌ করিয়া বলিল, "সে-ভাবনায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ যার করবার, সেই করবেন্‌ কেন, ওঁর বউ নেই?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু চিঠিখানার উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া কহিলেন, "শুনছি—আছেন। কিন্তু, অনেক দূরে—প্রায় দু'দিনের মাথায়! এখানে আছে শুধু ওঁর একজন চাকর—সুরেন!"

"বেশ ত; স্ত্রী আসুক!"

ইনস্‌পেক্টরবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সৌরেশবাবু যে স্ত্রীকে খবর দিতেই অনিচ্ছুক! নইলে এতদিন ত তাঁকে আনানো হতো। এ কথা ত কেবল আজই ওঠেনি!"

পুষ্প খামখা হাসিয়া উঠিয়া ঠোকা দিয়া বলিল, "ওঃ, এই রকম বুঝি তোমরা রোগীর যত্ন নিচ্ছ! বলি, চিকিৎসা-শাস্ত্র কি রোগীর ইচ্ছামত তৈরী হয়েছে?"

ইনস্‌পেক্টরবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা বটে। কিন্তু, যাই হোক্—আজ বুঝি উনি রাজি হয়েছেন। কিন্তু, এমন সময় হলেন যে, আর সময় নেই। ছত্রিশ ঘণ্টার ভেতর স্থির চাই!"

নির্বিকার কণ্ঠে পুষ্প জবাব দিল, "বেশ ত, টেলিগ্রাম ক'রে দিক্‌না কেউ।"

"ফল নেই। সেখানে টেলিগ্রাফ আপিস নেই। টেলিগ্রাম পৌছুতে আরও এক বেলা—তারপর ট্রেন কখন্ তার ঠিক নেই!"

"ভেতরে-ভেতরে তা হ'লে সব খবরই রাখো!"—পুষ্প ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর প্রতি এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল।

ইনস্‌পেক্টরবাবুও সে-হাসিতে যোগ দিয়া সমস্যাটার এক মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এক হয়, যদি কেউ যায়—কাল সকালেই! কিন্তু—" হঠাৎ তাঁহার মুখখানা আবার নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, বলিলেন, "কিন্তু, সময় চ'লে যায়!"

পুষ্প একটু চমকিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল; দেখিল—তাঁহার সারা মুখ ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণেই ফিরিয়া খোলা বারান্দা দিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া চাহিয়া রহিল—তাহার দৃষ্টির মাথায় স্তব্ধ-মৌন ধরিত্রীর এক-প্রান্ত, আর তাহারই উপর প্রকৃতির গোপন সৌন্দর্য্য—বিরাট কালোরূপ! সেই দিকে নেত্রপাত করিবা

একমনে কি ভাবিতে লাগিল, সে-ই জানে। অনতিকাল পরেই কি-এক খামখেয়ালী সিদ্ধান্তে ভর দিয়া স্বামীকে নিবেদন করিল, "থাক্ না সময়! তবুও ওঁর স্ত্রীকে আনতে হবে—হবেই হবে! তুমিই যাও!"

"আমি?"

ইনস্পেক্টরবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন এক দুষ্প্রাপ্য হর্ষ ও বিস্ময়ে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রশ্নটার বাঞ্ছিত জবাব আপাতত না দিয়াই যেন সঠিক করিয়া জানিতে চাহিলেন, "যাবো আমি?"

"তুমি আর সুরেন। তুমি একা নয়, কেননা—তুমি অপরিচিত।"

"বেশ। ছুটি আমি পাবোই—এখখুনি গিয়ে সাহেবকে 'তার' দিয়ে আস্‌ছি। সুরেনকেও খবর পাঠিয়ে দিই। ঠিক ভোরেই ট্রেন—বেরিয়ে পড়ি।—তবে, সবই হবে, অথচ—"

"অথচ কি?"

"কিছুই হবে না!"

পুষ্প স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল—এক নিষ্ফল রোদন তাঁহার মুখময় মাখামাখি হইয়াছে। একটু নীরব থাকিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "হবে। সে ভার আমি নিচ্ছি!"

ইনস্পেক্টরবাবু চমকিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন।

পুষ্পর যেন আজ হাসিবার দিন, তাই সে হাসিল একটু! বলিল, "সময় না থাকে—আমি ত রইলুম!"

"তুমি—"

"হ্যাঁ! তোমার—অনুমতি নিয়ে!"

এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে ইনস্পেক্টরবাবুর চোখ দুটি চক্‌চক করিয়া উঠিল। মিনিটখানেক পুষ্পর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া গাঢ় কণ্ঠে

দান

বলিয়া উঠিলেন, "জানি, তুমি কি! দেবতার পায়ে 'তোমাদের' ঠাঁই কেন!" একটা ঢোঁক গিলিয়াই কথাটা সমাপ্ত করিলেন, "কিন্তু, তার প্রয়োজন হবে না! 'স্কিন' না-হয় আমিই দেব। কিছুদিন ছুটি নেওয়া—এই ত!"

পুষ্প এক খামখেয়ালী হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তা হয় না, ঠাকুর! তুমি দিতে পারো, কিন্তু যাঁকে দেবে, তিনি নিচ্ছেন না! কেন, তা' তুমি জানো!"

সত্যই ত! যে-লোক এই দান যারপর নাই নিজের স্ত্রীর নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে রাজী হয় না, সে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে?—না ত! ইনস্‌পেক্টরবাবু বিপদে পড়িলেন। বলিলেন, "তবে, তুমি দিলেও—"

"তাঁর কাছে আমি গোপন থাক্‌বো। সুরেন যাবে, তুমি যাবে—তিনি জেনে থাক্‌বেন, এসে যার দেবার কথা, দিয়েছে সেই-ই!"

পুষ্পার চোখের জ্যোতি ইনস্‌পেক্টরবাবুর মুখে যেন এক অলৌকিক আলো ফেলিল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলিলেন, "তাই হোক্!"

এইবার পুষ্প যেন সহসা একটু বিমনা হইয়া পড়িল। কি খানিক ভাবিয়া কহিল, "হাসপাতালের সাহেবের ওপর একখানা চিঠি লিখে রেখে যেয়ো—অনুমতি দিয়ে, কেননা, আমি—এয়োস্ত্রী!"

"সাহেবকে বলেই আসি না?"

"না। যদিই বা সময় থাকে—ফিরতে পার!" বলিয়াই পুষ্প তেম্‌নিই অন্যমনস্কভাবে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঃ কুড়িঃ

বোঝাপড়া সবিতা করিলেও, সৌরেশ করে নাই। হোক্ না এক নির্মম প্রতিমা, তত্রাপি সে—মলিনা! বরণের আয়োজনে ফাঁক ছিল না—স্বতন্ত্র ঝি, স্বতন্ত্র 'ঠাকুর', স্বতন্ত্র 'কোয়াটার'। এ-যেন করিতেই হইত, তাই সে করিয়া গিয়াছে, যেন বা দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ এক গর্হিত কাণ্ডের মূল্য দিতে গিয়া এক দৈত্যস্ত্রীকে অঙ্গে রাখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আয়োজনে কোলাহল ছিল না, কলরব ছিল না! না থাকিলেও, ও-অঞ্চলের সবাই জানিয়া রহিল—ও মেয়েটি এক 'বিস্ময়'।

একান্ত অচেনা লোকালয়ে হঠাৎ আসিয়া পড়িলেও, সবিতাকে সঙ্গিহীন হইয়া থাকিতে হয় নাই। নাস্ 'কোয়াটারের' একটি মেয়ের সহিত তাহার আলাপ হইয়া গিয়াছিল—যে সেই প্রথম নির্বাচিতা বিধবাটি—কল্পনা। মেয়েটি প্রতিদিনই সবিতার নিকট আসিত, গল্প করিত, সুখ-দুঃখের কথায় ভোর হইয়া থাকিত—উভয়ের যেন এক-প্রাণ!

একদিন বিকালে উভয়ে বসিয়া কথা কহিতেছে, ঝি আসিয়া হাত পাতিয়া বলিল, "মা, বাবুর ঘরের চাবি—"

সবিতা আঁচল নামাইয়া এক গোছা চাবি খুলিয়া ঝিয়ের হাতে ফেলিয়া দিল।

ব্যাপারটা কিছুই না হইলেও, কল্পনার চোখে উহা কেমন-কেমন ঠেকিল। প্রথম হইতেই একটা খটকা, একটা কৌতূহল, এক অস্থির-কৌতুক যেন মূর্তি ধরিয়া তাহার মনের ভিতর মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া পালাইতেছে। সবিতা তাহাদেরই ন্যায় একজন

সাধারণ রোগি-সেবিকা, অথচ তাহার জন্য এরূপ অ-সাধারণ পৃথক্ সম্মান ও স্বতন্ত্র বিধি-ব্যবস্থার ঘটা কেন? তদুপরি এই মুহূর্তের এই রহস্য! সে ত পরিচয়হীনা এক নিছক অনাত্মীয়া—তাহার কাছে পর-পুরুষের চাবির গোছা রহিবেই বা কেন, কোন্ হিসাবে? ঝি চলিয়া যাইতেই কল্পনা জিজ্ঞাসা করিল, "সবিতা, ওঁর চাবি—তোমার কাছে?"

সবিতার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। অপরাধ তাহার একটু ছিল বৈকি! সৌরেশ যাইবার সময় চাবির গোছা ঝিয়ের হাতেই দিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, সবিতা উহা চাহিয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে, কেন যে, তাহার সম্যক্ বিশ্লেষণ তখনও সে করিতে পারে নাই, এখনও পারিল না। বলিল, "এম্‌নিই! দরকার হ'লে ঝি চেয়ে নেয়।"

সবিতার মুখের ভাব কল্পনার লক্ষ্য এড়ায় নাই। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু, একেবারে আঁ—চলে?"

সবিতার মনে হইল, ঐ দুষ্টু মেয়েটাকে একটা কিল মারে। কিন্তু, আপাতত তাহা না করিয়া আসক্তিহীন কণ্ঠে জবাব দিল, "যদি হারিয়ে যায়!"

"তাই?"

সবিতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হুঁ।"

কল্পনা ক্ষণকাল সবিতার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "ভেতরে আর কিছুই নেই?"

সবিতা এইবার মুখ নামাইল।

কল্পনার মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যাই-ই থাক্—বল্‌তে পারো না! তা জানি। কিন্তু, একটা কথা মেনে চলো, সবিতা, সত্যের সুমুখে মাথা উঁচু করতে গিয়ে কোন দিনই পেছিয়ে

এসো না। মনে রেখো, তুমি স্বামীর বউ, তোমার অস্ত্র রয়েছে—খোঁপায় ! সিঁদুর, হাতে নোয়া!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "আমিও মেয়েমানুষ! আচম্কাই আমার কি মনে হয়, শুনবে?—ও-রূপ তোমার আসল রূপ নয়—ছদ্মবেশ! কিন্তু, ঢাকা তুমি একটুও লুকোনি—একটুও না! তুমি যে এয়োস্ত্রী! সবিতা, জগতে এখনও প্রমাণ হয় নি, কি মানায় বেশী—নারায়ণের পায়ে ফুল-তুলসী, না, স্বামীর বুকে স্ত্রী!"

সবিতা চমকিয়া উঠিল, যেন এক অতীত-বসন্তের মত্ত-শিহরণ অকস্মাৎ কবে কোন্‌দিন দিশেহারা হইয়াছিল, তাহাই আজ আবার সুনিশ্চিত পথ পাইয়া তাহার বুকে আসিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু, সে ত জানে—এম্‌নিই এক শোভা, এম্‌নিই এক চন্দ্রালোক ক্ষণকাল পূর্ব্বেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলক দিয়াছিল, যাহা সে নিজেই জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে! ইহাও সে জানে—এক গোপন-লোকের দেবদূত বন কাটিয়া পথ করিয়া তাহাকে মুহুর্মুহু ইসারা করিয়াছিল, কিন্তু সে সদর্পে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিয়াছে! মনে ইহাও ত আঁকা রহিয়াছে—কাহার এক সঙ্কেত-বাঁশী বাজিয়া-বাজিয়া ক্লান্ত হইয়া নীরব হইয়াছে, তত্রাপি—তবুও সে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া গিয়া নিজেকে ধরিয়া দেয় নাই! চোখ নামাইয়া অবলোকন করিল—নীচে মাটির উপর সারি-সারি কাহার পায়ের ছাপ,—কে যেন আসিয়াছিল—হাত কাঁপিয়া কাহার মালাগাছি পড়িয়া ছিঁড়িয়া রহিয়াছে!

মুখ খুলিয়া বলিবার তাহার আর কিছুই ছিল না, তেম্‌নি করিয়াই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

কল্পনা এতক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে সবিতার দিকে চাহিয়া ছিল, যেন তাহার জয় আর তৃপ্তির সীমা-পরিসীমা নাই। মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"সবিতা!"

সবিতা এইবার মুখ তুলিল, সাড়া দিল—"কেন?"

"চুপ ক'রে যে?"

সবিতা একটু হাসিল। হাসিয়া বলিল, "চেঁচাবো?" পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া এক-একটি করিয়া বলিতে লাগিল, "তা নয়, কল্পনা! প্রমাণ এই-ই হয়নি, মানায় কি বেশী—নারায়ণের পায়ে ফুল-তুলসী, না স্ত্রীর বুকে স্বামী! স্বামী-বস্তু না থাকলে, মেয়েমানুষের পরিচয় কোনও দিন—'স্ত্রী' হ'তো না!"

এমনিই সময়ে ঝি প্রদীপ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "মা, সন্ধ্যে হয়েছে—বাবুর ঘর খোলা।"

সবিতা ও কল্পনা উভয়েই চকিত হইয়া উঠিল। উভয়েই চাহিয়া দেখিল—দিবালোক কখন্ নিবিয়া গিয়াছে।

সবিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। কল্পনাও উঠিল। তাহার মনে হইল—দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ এক নব-নিকেতনের দ্বার অর্গলমুক্ত হইয়াছে। উহার বাহিরে দাঁড়াইয়া সে, ভিতরে বসিয়া—সবিতা। একটিবার নিজের দিকে, আর একটিবার সবিতার দিকে সে তাকাইল, তারপর কি মনে করিয়া সবিতাকে নির্দ্দেশ করিয়া ঝিকে প্রশ্ন করিল, "তা ইনি কি করবেন—ইনি?"

"সন্ধ্যে দেবেন।"

"কেন, তুমি?"

"মা নিজেই দেন।"

কল্পনা মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, যেনবা সেই সন্ধ্যায় তাহার চোখের উপর সহসা পৃথিবীর কোটি-কোটি দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রথম আলোকে সে কি হারাইয়াছে! তারপর এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া নীচে নামিয়া গেল। তখন সবিতা চলিয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কল্পনা আসিয়া দেখিল, সবিতা নাই—তখন অপরাহ্ণ। ঝি মেঝেয় একখানা কম্বল পাতিয়া চাদর হাতে করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কল্পনাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "বলুন দিকিনি, দিদিবাবু—কি করি আমি!"

কল্পনা হাসিয়া কহিল, "হ'লো কি?—মা তোমার কোথায়?"

শেষের প্রশ্নটা বুঝিবা ঝিয়ের কানে গেল না। মুখখানা হাঁড়ি করিয়া প্রথমটারই জবাব দিল—"হ'লো আমার পিণ্ডি!"

"ভাল কথা! কাজ এগিয়ে রইল! তারপর?"

"রঙ্গ ক'রো-না, বাছা! আমার কান্না পাচ্ছে—"

"আরে মাগী, বল্ না কি হয়েছে!"

"হয়েছে কি—আজ সকালে এসে দেখি, মা মেঝেয় শুয়ে। আমি ত' অবাক্! জিজ্ঞেস্ করলাম—কেন মা, মেঝেয় শুয়েছ? বললেন কি সমাচার—খাটে শুইনে! বলো, দিদিবাবু, বলো,—এর মানেটা কি? ব'লে আমাকে সাত ঝাঁটা মারো! বাবু এসে শুন্তে পেলে, আমাকে কোন্ বসুমতী বুক চিরে দেবে, বলো ত?"

কল্পনা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ঝি আবার বলিয়া উঠিল, "তারপর, শুনে যাও—" বলিয়াই তাড়াতাড়ি কপালের একপ্রান্ত দেখাইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, "পায়ে মাথা কুটলাম, দিদিবাবু—ফের যদি মেঝেয় শোন্! কিন্তু, পাথরের সরস্বতী নরম হয় গো, আর উনি কি! রাজী নয়! শেষকালে অনেক কান্নাকাটি দেখে বল্লেন—"একখানা কম্বল পেতে দিয়ো।" কিন্তু, আমার মরণ হ'তে—চাদর না পাত্লে ওই কুটকুটে কম্বলে শোয়া যায়? বলো ত, দিদিবাবু, তুমিই বলো!"

কল্পনা বলিবে কি? এ রামায়ণের রচনা বুঝিবা তাহার পূর্ব্বাহ্ণেই হইয়া গিয়াছে! ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "পেতো নী চাদর। এতটুকু আরাম ওঁর সইবে না—যতদিন না 'বাবু' ফিরে আসেন!" একটু সরিয়া আসিয়া গলার স্বর নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু ওঁর কে—শুনেছ কিছু?"

ঝি অতি বুদ্ধিমতী। বিশেষ বিবেচনা করিয়া জবাব দিল, "হবে বা—শিষ্য-সেবক! মা ত মাছ খান না! হাতে নোয়া থাকলে কি হবে!"

কল্পনা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "সত্যি?"

ঝি চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কি মিথ্যে বলছি, দিদিবাবু? তুমিই একদিন দেখো না এসে খাওয়া।" একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সুরু করিল, "ঠাকুর আছে—ও মিথ্যে! খান ত এক সন্ধ্যে, একপাকে—আলোচাল আর কাঁচকলা! ঠাকুর দেয় চড়িয়ে, উনি নেন নামিয়ে!"

কল্পনা দাঁড়াইয়া ছিল, আস্তে-আস্তে বসিয়া পড়িল—যেন এক পরিপাটী বিস্ময় তাহার সর্ব্ব অবয়ব অবশ করিয়া এইমাত্র ছুটি দিয়াছে!

ঝিয়ের অভিযোগ তখনও শেষ হয় নাই, হাতের চাদরখানা খাটের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বলিল, "আজ তাও না—উপোস। জলের ছিটেও মুখে ওঠে নি।"

"কেন?"

ঝি হাত দুইটি জড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "সত্যনারায়ণ পূজো—আজ সংক্রান্তি কিনা! উপোস করতেন বাবু।"

"বটে! এমন নইলে আর গুরুজী!"—কল্পনা হাসিয়া উঠিল। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু উপোস করতেন—তোমার মাকে বললে কে?"

"আমি। মরতে বলে ফেলেছি আমিই! তা হোক্—দেবপুণ্যি!"
ঝি এই দেবপুণ্যির আগ্রহে আর-একবার কপালে হাতটা ঠেকাইয়া কহিল, "যাও—মা বাবুর ঘরে।"

"বাবুর ঘরে?"

"হ্যাঁ, নৈবিদ্যি করছেন।"

কল্পনারও বুঝিবা আর কাজ মিটিয়াছে, উঠিয়া-পড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। তারপর 'বাবু'র ঘরের পথ ধরিয়া দ্রুতপদে খানিক গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল—অতঃপর পা টিপিয়া-টিপিয়া আর-একটু সরিয়া গিয়া দুয়ারের পাশে আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইল।

সবিতার হাতে তখন অনেক কায। পূজার আয়োজনে সে তন্ময়! ঘরময় বিস্তৃত এটি-ওটি নৈবেদ্যের থালা, সাজিভরা ফুল—তাহার মাঝে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া সে।

কল্পনা এইবার সম্মুখে আসিয়া পড়িল—চোখের উপর সবিতা। কিন্তু, সবিতা মুখও তুলিল না, যেন সে টের পায় নাই—যেনবা তাহার এক ফোঁটা অনুভূতি, এক টুক্‌রা চেতনাও কক্ষের বাহিরে আসিবার নহে! এক-একখানি নৈবেদ্য সাজায়, অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকে, আবার পরক্ষণেই উহা ভাঙিয়া ফেলে—যেন মনোমত আর হয় না! সাজির কোন্ ফুল কোন্ দিকে, কার গায়ে, কার পর রাখিলে ঠিক হয়—তাহাই বিচার করিতে বসিয়া সে ঘামিয়া উঠিয়াছে। যেন সে দেবতার রুচির সঠিক খবর রাখে, তাই তাহারই রুচিতে ঠাকুরের রুচি আজ রচিত হইবে!

কল্পনার যেন প্রাণ চাহিল না, তাহাকে ডাকে, তাহার সমাধি ভাঙিয়া দেয়! কিন্তু, নিজেকে সংযত রাখিতে আর পারিল না। অবশকণ্ঠে ডাকিল—"সবিতা!"

সবিতা একটিবার তাকাইল। তৃপ্তিপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এসেছ? এই ভাবছি, এলে না বুঝি আর!" বলিয়াই আবার চোখ নামাইয়া লইল। অতঃপর একখানি অসমাপ্ত নৈবেদ্য শেষ করিয়া পুনশ্চ মুখ তুলিয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে? বোসো।"

কল্পনার দিকে এখন আর চাওয়া যায় না, যেন এক গোপন পুলক তাহার অন্তরের অন্তরতম কোণ হইতে উঠিয়া বুক ভাসাইয়া চোখ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ভাবছি, পুজোটা কার—সত্যনারায়ণ ঠাকুরের, না, আর কারুর! মনে হয়—তাঁকে ডিঙিয়ে কোনও আকাশের ঠাকুর আজ পুজো নিতে আস্‌বে না! সত্যি, সত্যি—সত্যি!"

সবিতা জিব্ কাটিল। বলিল, "ফাজিল কোথাকার!"

"একশোবার!" কল্পনার এখনও কায শেষ হয় নাই, সবিতার পরনের কাপড়খানাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কাপড়টি কার—সরু লালপেড়ে তসর?"

সবিতা ঈষৎ লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া জবাব দিল—"ওঁর।"

"অর্থাৎ—"

"তোমার মুণ্ডু!" সবিতা যেন একমুখ রাগিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "তোমাকে ব'সে থাক্‌তেই বল্‌লাম? কাপড়টা ছেড়ে এসো—এগুলো বইতে-ছইতে হবে না? আমি একলা—পারি? বেশ ক'রে মুখ ধুয়ো—মুখে পানের কুচি না থাকে!"

"তথাস্তু" বলিয়া কল্পনা উঠিয়া গেল।

বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সত্যনারায়ণের 'কথা' সুরু হইয়াছে—লোকে-লোকারণ্য। হাসপাতালের সকলেই উপস্থিত—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে

আরম্ভ করিয়া কুলি পর্য্যন্ত। মাঝখানে পুরোহিত—তাঁহার সম্মুখে নারায়ণ-শিলা। যথাসময়ে 'কথা' শেষ হইল, যুক্তকণ্ঠের হরিধ্বনি উঠিল, পুরোহিত জপে বসিলেন। তারপর পুরোহিত হাঁকিয়া বলিলেন:
—"বাবু ত নেই—'আশীর্ব্বাদ' নেবেন কে?"

উপবিষ্ট জনতার সমতল ফুঁড়িয়া কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত নামাইয়া পার্শ্বেই উপবিষ্টা সবিতাকে সজোরে এক টান দিয়া উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—"ইনি নেবেন!"

"উনি?"—অচল বিস্ময়ের এক সচল আলোড়ন প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গড়াইয়া গেল। কেন না, সবাই জানে—ও মেয়েটি সদ্য-নিযুক্তা রোগি-সেবিকা, আর এ-হেন কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ গৃহস্থের নিকটতম আত্মীয় ছাড়া আর কাহারও প্রাপ্য নয়।

পুরোহিত-ঠাকুরেরও বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সম্মুখে দণ্ডায়মানা একটি পাতলা নারীমূর্ত্তি—ঐ মেয়েটির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সম্মোহিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "ইনি—ইনি কে?"

"বাবুর স্ত্রী—" তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া একটি নরমূর্ত্তি প্রবেশ করিল—সে সুরেন, পশ্চাতে ইনস্‌পেক্টরবাবু।

সবিতার দেহটা টলিতেছিল, অপটুনেত্রে একটিবার সুরেনের দিকে আর একটিবার পশ্চাতের লোকটিকে সুরু করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়—, দিগন্তের পানে তাকাইয়া ভীতিবিহ্বল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেন, তুমি?"

"বল্‌ছি—আগে 'আশীর্ব্বাদ' ধরো—"

পুরোহিত-ঠাকুর তাড়াতাড়ি 'পুষ্প' লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সবিতা একটিবার কল্পনার দিকে তাকাইয়া মাথা নীচু করিল, তার-পর—তারপর একটু-একটু করিয়া হাত বাড়াইল, যেন কি করিতেছে

জানে না, অথচ তাহা করিতেই হইবে! অতঃপর এক সময়ে যেন সে হঠাৎ টের পাইল, হাতে কিসের স্পর্শ পড়িয়াছে—শিহরিয়া উঠিল। তারপর হাত গুটাইয়া, মাথায় ঠেকাইয়া সুরেনের দিকে ফিরিল।

সুরেনও সঙ্গে-সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া সবিতার পায়ের উপর মাথা ঠেকাইল। তারপর কথা কহিবার কথা, পারিল না—যেন রাশি-রাশি অশ্রু অকস্মাৎ বুক ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছে। বার-কয়েক ছিন্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "বউদিদি! তুমি কি—" হঠাৎ ফোঁপাইয়া উঠিয়া মুখে হাত চাপা দিল।

ইনস্‌পেক্টরবাবু তাড়া দিয়া উঠিলেন—"সময় নেই, সুরেন!"

সুরেন ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চাদরে চোখ দু'টি মুছিয়াই সবিতাকে বলিল, "শীগ্‌গির গুছিয়ে নাও—এখ্‌খুনি ট্রেন!"

সবিতা মূঢ়ার ন্যায় তাকাইতেই সুরেন শুনাইয়া দিল—"দাদাবাবু হাসপাতালে!"

"সে কি!—"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মুখখানা শাদা করিয়া সরিয়া আসিলেন।

সবিতাও ঝরা-পাতার ন্যায় থর-থর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

ইনস্‌পেক্টরবাবু হাত উল্‌টাইয়া হাত-ঘড়িটা একবার দেখিয়াই ঘটনাটির আনুপূর্ব্বিক এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাঁহাদের উপস্থিতির হেতুটা বিবৃত করিলেন। উপসংহারে কহিলেন, "মানুষ নন্ তিনি—দেবতা!"

তখন কাহারও দিকে চাওয়া যায় না! সকলেই ঘন-ঘন চোখ মুছিতেছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে আমিও যাচ্ছি—"

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন এক মৃন্ময়ী-প্রতিমা, যাহার বেদমূলে কত মন্ত্রই না পঠিত হইয়াছে, তবুও সে সচল হয় নাই—কত কাল ধরিয়া কত বলিদানই না হইয়া গিয়াছে, তত্রাপি সেখানে নিষেধ পড়ে নাই। স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না। আপনি থাকুন। এখানে যারা শুয়ে—তারা আমাদের সন্তান।" বলিয়াই কল্পনার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ভেবো না,—আমার বুক তাজা আছে!"

কল্পনা ফোঁপাইয়া উঠিয়া সবিতার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফেলিল।

এইবার সবিতার চোখ দুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আঁচল উঠাইয়া চোখ মুছিয়া দুই হাতে কল্পনার মুখটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদিস্ নে বোন! সাম্‌নে ঐ নারায়ণ—ওঁর সুমুখেই ব'লে যাচ্ছি—হাস্‌তে-হাস্‌তে আমি ফিরবো!" একটা ঢোঁক গিলিয়াই আবার বলিল, "উনি গেছেন, আমি এসেছি ব'লে! আমি যাচ্ছি—তোকেই রেখে গেলাম।"

পা বাড়াইতেই কল্পনা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "দাঁড়াও! একটু জল মুখে দেবে—"

সবিতা এইবার একটু হাসিল। কল্পনার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "মুখে উঠলে ত!"

ঝি এতক্ষণ ছেঁড়া-কাপড়ের পুঁটুলির মত একপাশে বসিয়া ছিল। এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কল্পনাকে দু'কথা শুনাইয়া দিল—"তুমি ত বেশ, দিদিবাবু! যে মনিষ্যি এম্‌নিতে মেঝেয় শোয়, তিনি আবার আজকের দিনে 'ছিরি-বিষ্টি' করবেন!—মিথ্যে বলা।" অতঃপর ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সবিতার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও মা"—বলিয়াই গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পায়ে মাথা ঠেকাইল।

ইনস্পেক্টরবাবু ছট্‌ফট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর এক মিনিটও না—"

সবিতা ঝিকে [illegible] সুরেনকে বলিল, "চল—" বলিয়াই যাত্রাপথে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল, যেন অনন্তপ্রসারী নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া পথ করিয়া আলো ধরিয়াছে।

॰ঃ একুশ ঃ॰

আজ প্রভাত পুষ্পর চোখে পৃথিবীর এক অপরূপ রূপ মেলিয়া ধরিয়াছে।

গতরাত্রে দুর্য্যোগ গিয়াছে, এখনো বিরাম হয় নাই—আকাশে তেম্‌নি মেঘ, গাছে তেম্‌নি ঝড়, মাটিতে তেম্‌নি বাদল! পুষ্প কক্ষের এক প্রান্তে একটি জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে; যেন সে তন্ময়, যেন তার চোখের জ্যোতি গাছের পর গাছ, বাড়ীর পর বাড়ী, রাস্তার পর রাস্তা ঠেলিয়া, টপ্‌কিয়া, পার হইয়া, ছুট দিয়া কোনো-এক নিভৃত-প্রদেশের স্থায়ী কুয়াশায় আলো ফেলিবে!

বেলা সাড়ে দশটা বাজিতেই, পুষ্প একটু-যেন অস্থির হইয়া উঠিল, এবং বার-কয়েক ঘরবার করিয়াই ঘড়ির দিকে তাকাইল—যেন আজিকার মুহূর্ত্তগুলিকে সে বাঁধিয়া রাখিতে চায়! এম্‌নিই সময়ে থানার একজন 'সেপাই' আসিয়া খবর দিল, "মাইজি, বাবু ত আয়া নেহি, গাড়ি চলা গিয়া—"

"ইষ্টিশান্‌মে গিয়া থা?"

"জরুর মাইজি!"

"আচ্ছা—"

'সেপাই' চলিয়া গেল।

পুষ্প পুনশ্চ আর-একবার ঘড়ির দিকে তাকাইল, তারপর কি মনে করিয়া পাশেই দাঁড়-করানো আয়নার সুমুখে আসিয়া নিজের মুখ ফেলিল, দেখিল—মুখটির যেন হঠাৎ রূপপরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেন

রাঙা রঙ ছিল—উঠিয়া গিয়াছে, প্রখর রশ্মি ছিল—নিবিয়া গিয়াছে, অবিকল আয়নার মতই মসৃণ ছিল,—ম্লান হইয়াছে! মাথার চুল রুক্ষ, বিপর্য্যস্ত—কতক বা মুখে আসিয়া পড়িয়াছে! মনে-মনে একটু হাসিল, কেন তাহা জানে না—হাসি পাইয়াছে, তাই হাসিয়াছে! তারপর বাক্স খুলিয়া এক নিভৃত কোণ হইতে খদ্দরের একখানি শাড়ী, 'ব্লাউস' ও চাদর বাহির করিয়া কাপড় ছাড়িয়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল—রাস্তায়। তখন প্রকৃতির মুখ ফুটিয়া চরাচরে হাসি ধরিয়াছে!

গাছের-পাতা আর ডালপালা, ডালপালা আর গাছের-পাতা!—পা আর চলে না। তত্রাপি উহাই পুষ্পর চলিবার পথ—চলিতেই হইবে! পায়ে জুতা নাই—কাদা মাখামাখি হইল, আনাড়ি আবর্জ্জনা—পায়ে-পায়ে বাধিয়া গতিরোধ করিতে লাগিল। তাহা হউক—তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কাঁটাখোঁচা ঠেলিয়া সরাইয়া, সরাইয়া ঠেলিয়া চলিবার পথে চলিতেই লাগিল—চলিবেও! যেন সে ভাবিয়া চলিয়াছে, তাহার এক অনধিকার ব্রতের ইহাই শাস্ত্রীয় উদ্‌যাপন!

পথ ফুরাইয়া আসিল—হাসপাতালের মুখে।

রোগীর ভিড় কমিয়া আসিয়াছে, কচিৎ দুই-একজন 'টিকিট' হাতে করিয়া ডাক্তারবাবুর টেবিলের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতেছে। পুষ্প কাল-বিলম্ব না করিয়াই উপরে উঠিয়া গেল, এবং সটান ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া একখানি চিঠি দিল।

চিঠিখানা সাহেবের নামে, সুতরাং ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করিতেই পুষ্প বলিল, "আপনিই পড়ুন, খোলাই আছে।"

ডাক্তারবাবু পত্রখানি খুলিয়া দুই-এক ছত্র পড়িয়াই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, আপনি—!" বলিতে-বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,

"আসুন—" বলিয়া পুষ্পকে সঙ্গে করিয়া একটি স্বতন্ত্র কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অতঃপর হাত-ঘড়িটার পানে একবার তাকাইয়াই বলিলেন, "পাঁচমিনিট বসুন—আমি আস্‌ছি!" বলিয়াই দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আবার রোগী দেখিবার চেম্বারে গিয়া বসিলেন।

পাঁচ মিনিট! ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই ডাক্তারবাবু বলিতে-বলিতে ফিরিলেন—"এই সকালেই সাহেব বল্‌ছিলেন—আর দেরী করা চলে না।" একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে ওঁরা সময়ে ফিরতে পারলেন না!"

পুষ্প নম্রকণ্ঠে কহিল, "পারেন না ফিরতে—'হোপিং এগেন্‌স্ট হোপ'!"

ডাক্তারবাবু পুষ্পর দিকে একটিবার তাকাইয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন, "কোয়াইট্ ট্রু! মিস্টার চ্যাটার্জ্জিও তাই বল্‌লেন।" একটু ইতস্তত করিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "ইন্‌স্পেক্টরবাবু মিস্টার চ্যাটার্জ্জির কোনও রিলেশন?"

পুষ্প মাথা নীচু করিয়া সলজ্জভাবে জবাব দিল, "আপনাদের পেশেন্টের আমি বোন।"

"বোন?"

পুষ্প ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—"হুঁ।"

"স্‌প্লেন্‌ডিড্! সেম্ ব্লাড্! ভালোই হবে—এক রক্ত!"

পুষ্প মুখ ফিরাইয়া একটু গোপন হাসি হাসিল।

ডাক্তারবাবু আপন খেয়ালেই ছিলেন। পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, কি কঠিন লোক—আপনার ভাই, আর ইন্‌স্পেক্টরবাবু! এ পরিচয় কেউ একদিনও দেন নি!"

"বোধ করি, প্রয়োজন হয়নি!"

"কোয়াইট্ ট্রু!—বসুন, সাহেবের 'পারমিশান' করিয়ে আনি—"

"একটা কথা! আমি যে 'স্কিন' দিচ্ছি, এ-খবর, এ দেবার আগে আপনাদের পেশেণ্ট যেন টেরটি না পান! তা হ'লে উনি রাজি হবেন না।"

ডাক্তারবাবু মিনিট খানেক বিশেষ কি চিন্তা করিয়া সমস্তাটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ, উনি জেনে থাকবেন, যা জেনে আছেন—এই ত?"

পুষ্প মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মুখটি নীচু করিল।

ওই নির্ব্বাক মুখটি হইতে সঠিক অনুমোদন আসিয়াছে, এই মনে করিয়া ডাক্তারবাবু আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "কোয়াইট্ ট্রু! উনি যে 'সেণ্টিমেণ্টাল'—নিশ্চয়ই বেঁকে দাঁড়াবেন!" বলিয়াই উঠিয়া অদূরে আর একটি সজ্জিত কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "সাহেবের হুকুম হয়েছে। আপনি বিকেলে আস্‌বেন—আজই ভর্ত্তি হ'তে হবে!"

"আচ্ছা।"

পুষ্প উঠিয়া পড়িল ও ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

রাজি হইলেও, যখন সত্য-সত্যই ইন্‌স্পেক্টরবাবু স্থরেনকে লইয়া নিজেই যাইবেন বলিয়া ঠিক করিলেন, তখন সৌরেশ পুনশ্চ নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু, যে-আদেশ আর-এক শক্ত মানুষের নিকট হইতে আসিয়াছিল, তাহার অসম্মান করিয়া রোগীর খাতির পুলিসের ওই লোকটি রাখেন নাই।

সৌরেশ মুখে বলিয়াছিল যে, অপরের ত্বক্ লইয়া স্বীয় দেহের শোভার সংস্থান করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই, কিন্তু, আসলে মনের ভিতর এক

পরিষ্কার বাধার পাহাড় উঠিয়াছিল। যে সম্পর্ক ঐ দূর প্রবাসী নারীটির উপর সে আরোপ করিয়াছে, উহা তাহার নিকট সহস্র সত্য হইলেও, সবিতার নিকট যদি উপহাস হয়, সে যদি অস্বীকার করে? সত্য কথা, সুনাম বলিয়া কোনও খ্যাতির উপর দাবী করিবার স্পর্দ্ধা তাহার নাই, প্রবৃত্তিও নাই, তত্রাপি এক অকারণ দুর্নামের তিলক কাটিয়া লোক-সমাজে মুখ তুলিবে সে কেমন করিয়া? সেই নির্বিকার, অনাসক্ত, খাঁটি মেয়েটির কঠোর চেহারাটা তাহার যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাহার সমগ্র মন বিশ্রী সরমে, ঘৃণায়, আতঙ্কে ভরিয়া উঠিতে লাগিল—দুইটা দিন পরেই লোকদৃষ্টিতে সে যে এক মূর্ত্ত পরিহাস হইয়া পড়িবে! ইন্‌স্পেক্টরবাবু, সুরেন, হাসপাতালের সাহেব, ডাক্তারবাবু, কুলি, মেথর—সবাই তাহার উপর অবজ্ঞার থুৎকার নিক্ষেপ করিবে! ছি, ছি!

এদিকে পুষ্প নির্দ্দিষ্টক্ষণেই ভর্ত্তি হইয়া গেল এবং পরদিবস তাহার দেহের সজীব ত্বক-রক্ত আর এক দেহে যোজনা করা হইল।

সংশয়ের বাষ্প সৌরেশের মন হইতে উবিয়া গেল, এবং ঐ মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার অন্তরের চল্‌তি কারবার ব্যর্থ করিয়া এক অভিনব বিলোড়ন উত্থিত হইল—সে অবাক্ হইয়া গেল! যে-নারী সবে সেদিন অজস্র কাতর নিবেদন ব্যর্থ করিয়া উপেক্ষায় অট্ট হাসিয়া নিজেকে পৃথক করিয়াছে, সে-ই আবার নিজেকে এরূপভাবে বিলাইয়া মিশাইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ফেলিল? তবে 'নারী' বলিয়া যে-নাম ইহলোকে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মূর্ত্তির সৃষ্টি কি পুরুষকে মূর্খ করিবার জন্যই? অন্তরের চাপ উঠাইয়া ভিতরটায় মুখ বাড়াইবার শক্তি কি পুরুষের নাই? অথবা, অদৃশ্যমান মহাব্রতের সমষ্টি লইয়াই পরলোকে নারীর সৃষ্টি, তাই রূপ-মূর্ত্তি থাকিলেও তাহার বাস্তব সত্তা পুরুষের স্থূল নয়নে

ছিমারী নহে, সুতরাং সৌরেশের অতটুকু ঐ ছোট চোখে সবিতার আসল দিকটা পড়ে নাই!

এমনিইধারা সবিতার 'নারী-মূর্তির বাহিরকার ছাউনির নীচে চাপা বস্তুটির আলোচনা করিতে গিয়া হঠাৎ 'ব্যাণ্ডেজে'র নীচে এক নরম-পদার্থের স্পর্শ পাইয়া সৌরেশ আবেগে শিহরিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল—"এই আমাদের বিয়ে!"

পরদিন সকালে হাসপাতালের রোগী-পত্র পরিদর্শন করিবার পর সৌরেশ প্রাগুক্ত ডাক্তারবাবুটিকে ডাকাইয়া পাঠাইল—তাঁহার সঙ্গে এই কয় দিনে বেশ-একটু প্রীতি জন্মিয়াছিল। তিনি আসিবামাত্র সৌরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনার সেই 'পেশেণ্ট'টি কেমন আছেন—ভালো ত?"

"কোন্ পেশেণ্ট?"

"সেই যে সেই—!"

"'সেই' বল্লে কি হয়?—'পয়েণ্ট-আউট্' করুন! কোন্টা—সেই সাঁওতাল মাগী, যার 'এবডোমেন' 'অপারেশন' করা হয়েছে?" ডাক্তার-বাবু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সৌরেশ বিপদে পড়িল, যেন তাহার নির্দ্দেশ করিবার ভাষা নাই! একটু ইতস্তত করিয়াই বলিল, "না, আমার স্ত্রী—"

একমুখ হাসিয়া ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "তাই বলুন!—হ্যাঁ ভালোই আছেন।"

"কষ্ট হয় নি কিছু ত?"

"হিয়ার ইউ আর দি বেস্ট ডক্‌টার, মিস্টার চ্যাটার্জ্জি—আপনি আমাদের চেয়ে সে-সব বেশিই বুঝবেন! আমি এই ক্রমেই তাঁর 'বেড' ক'রে দিচ্ছি—" ডাক্তারবাবু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতে-হাসিতে কথাটা

একজন 'কুলি'কে হাঁক দিয়া ডাকিয়া সেই ঘরে সৌরেশের
চট্ করিয়া আর-একটি শয্যা রচনা করাইয়া বলিলেন, "চোখে-
রাখতে চান—এই ত ?" বলিয়াই এক অতি নির্ম্মল হাসি হাসিয়া
হইয়া গেলেন।

মিনিট-দুয়েক অতীত হইয়াছে, সৌরেশ লুকাইয়া-লুকাইয়া দুয়ারের
দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে—ঘন-ঘন ! কে আসিবে—তাহাকে যেন সে
না, অথচ না দেখিলেও থাকিতে পারিবে না ! কে আসিয়া
শয়ন করিবে—তাহার নিশ্বাস যেন সে চাহে না, অথচ না চাহিলেও
শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বুঝিবা এখনই কে কথা কহিবে,
বে, হাসিবে—তাহার পরিচয় যেন সে লইবে না, অথচ নিজেকে
াইয়া, মিশাইয়া, খোয়াইয়া না দিলেও তাহার চলিবে না !

ঠিক এমনিই সময়ে দুয়ার-গোড়ায় যুক্ত পদশব্দে সৌরেশ চমকিয়া
ল, এবং চোখের পলক না পড়িতেই যে-দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল,
া তাহাকে একেবারেই ভ্রান্ত, মূঢ়, জড় করিয়া দিল। দেখিল—
স্পেক্টর বাবু ও সুরেন ফিরিয়া আসিয়াছে, তৎপশ্চাতে দাঁড়াইয়া
না !

সৌরেশ কোনওরূপে শিথিল নিস্তেজ হাত দুটায় ভর দিয়া নিজেকে
ং ঠারো করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি ! 'স্কিন্' দিলে কে তবে ?"

ইত্যবসরে বাহিরে কাহাদের রুক্ষ কণ্ঠস্বরে দণ্ডায়মান লোক তিনটি
হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল ও দেখিতে-দেখিতে দুই জন 'কুলি' খাটিয়া
রিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী-মূর্ত্তিকে পূর্ব্ব-রচিত শয্যায় শায়িত
দিল।

মৎকার !"—ইন্‌স্পেক্টরবাবু যেন-এক অস্থির পুলকে অকস্মাৎ
হইয়া উঠিলেন। খাটিয়ার দিকে কয়েক পদ সরিয়া আসি

মিত্র-অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "জানতামই—আমার পরাজয় তোমার হইবে না!" মুহূর্তেই সৌরেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "চমকে উঠবেন না। এ ছাড়া উপায় ছিল না। ইনি আমার স্ত্রী—"

শক্তি ছিল না, তত্রাপি সৌরেশ 'বেড' হইতে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া নামিবার চেষ্টা করিতেই, মলিনা খপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "উপেক্ষায় নারীর প্রেম খাটো হয় না! যে-প্রেমে যত উপেক্ষা সে-প্রেম সেবায় তত বড়! কষ্ট তোমার না হোক্‌ আর-এক জনের হবে!—ও কি, ওদিকে চাও, কথা কও—"

আবিষ্টের ন্যায় সৌরেশ শায়িত ঐ নারীটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে ডাকিল, "পুষ্প—"

যাহাকে ডাকিল, সে এক তীব্র কটাক্ষ করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল—যেন তাহার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত